ভারতের জেলে আমার বন্দীজীবন

মুহাম্মদ আলমগীর

HATE THE SIN
BUT NOT THE SINNERS

ভারতের জেলে আমার বন্দীজীবন

[১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের ভগ্নাংশ স্মৃতি-চিত্র]

মুহাম্মদ আলমগীর

শব্দরূপ ◆ ঢাকা

www.pathagar.com

ভারতের জেলে আমার বন্দীজীবন
[১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের ভগ্নাংশ স্মৃতি-চিত্র]

মুহাম্মদ আলমগীর

প্রকাশনায় ◆ শব্দরূপ
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৪৫৮১৫০

একমাত্র পরিবেশক
ঝিঙেফুল
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১৬৪৯৮৪
প্রথম প্রকাশ ◆ বইমেলা ২০০৬
দ্বিতীয় প্রকাশ ◆ অমর ২১শে বইমেলা ২০০৮
গ্রন্থস্বত্ব ◆ লেখক
প্রচ্ছদ ◆ খসরু
কম্পোজ ◆ ঝিঙেফুল
মুদ্রণ ◆ সিদ্দিকিয়া প্রেস, ঢাকা
মূল্য ◆ ৳ ১২০.০০ মাত্র

BHAROTER JALE AMAR BONDYJIBON
Written by Mohammad Alamgheer
Published by SHABDARUP
34 North Brook Hall Road, Dhaka-1100
Phone : 01552458150
Price : Tk. 120.00 Only. US $ 4.00

ISBN 984-8373-23-3

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার আব্বা-আম্মা, বেহাই, বেহাইন, ছেলে মেয়ে ও মেয়ে-জামাতাদের উদ্দেশ্যে যাদের সাহচর্য ও প্রেরণা আমার এই গ্রন্থের আদর্শিক পূঁজি ও পাথেয় সরবরাহ করেছে। এবং যারা আদর্শ জীবন ও সমাজ গঠনে উৎসর্গীকৃত প্রাণ।—মুহাম্মদ আলমগীর

www.pathagar.com

"যাঁরা আল্লাহ্‌র পথে কতল হয়েছেন তাঁদেরকে মৃত বলোনা
বরং তাঁরাই জীবিত যা তোমরা উপলব্ধি করতে পারছনা"

—"আল কোরআন"

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীরের গ্রন্থটি সেময়কার চেতনা বিধৃত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি সত্য-নিষ্ঠ চিত্র। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সেময়কার দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মকান্ড বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সাহায্যে কী প্রকৃতি ও মানসিকতার ছিল এর কিছুটা এতে রযেছে, যা আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব মর্যাদা সংরক্ষনে যথেষ্ট পথ নির্দেশক।

বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে লেখকের মেয়ে-জামাতা জনাব এনামুল হকের দৃষ্টিভংগীর সাথে আমি ঐকমত্য প্রকাশ করে বলতে চাই গণতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যেকেরই স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার আছে, তবে তা অবশ্যই নৈতিক ও আদর্শির্ক দৃষ্টিভংগীতে জনকল্যানকর হতে হবে বৈকি। দ্বিতীয়ত, যে কোন পেশার সাথে রাজনীতির সম্পর্ক নাই বা থাকতে পারে না; এ ধরনের বিভাজন বা বৈরাগ্যনীতি চর্চা অবাস্তব ও অকল্যাণকর, জনাব অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীরের এই গ্রন্থটি এর সত্য-স্বাক্ষর। সবশেষে যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অনুপমভাবে অনুস্মরণীয় তা হচ্ছে এই যে সব সমাজেই কিছু ব্যক্তিত্ব থাকেন যাঁরা আপন জীবন ও সম্পদকে তৃচ্ছজ্ঞানে সমাজ ও জাতিকে গৃহশত্রু ও বিদেশী ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধার করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন নৈতিক চেতনা ও প্রেরণায়। এঁদের ত্যাগ তীতিক্ষায়-ই সমাজ ও সভ্যতায় মানবিক ও নৈতিক উন্নয়ন সাধন হচ্ছে প্রতিনিয়িত, এবং এর অধঃপতনে রচনা করছে ব্যূহ। অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীরের জেলজীবন এই নৈতিক চেতনা ও প্রেরণার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে আশা করি পাঠক সমাজের নিকট এই দৃষ্টিতে বইটি সমাদৃত হবে অকুণ্ঠ চিত্তে।

www.pathagar.com

সুহৃদ পাঠকদের প্রতি বিনীত বচন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

আমি আপনাদেরই একজন। অনেকের মত আমি জেল খেটেছি। জেল খেটে অনেকে দেশ বরণ্য হয়েছেন; অনেকে আবার ধিকৃত হয়েছেন নানা অপবাদ অপকর্মের জন্যে। বন্দীজীবনের অভিজ্ঞতা একটি অতিরিক্ত মাত্রা যা সাধারণ জীবন যাপনে অনুপস্থিত্। এ দৃষ্টিতে এটি একটি দুর্লভ প্লাস পয়েন্ট মানব জীবনের ডেবিট বা ক্রেডিট খাতে। সে হিসাবে আমিও এই পয়েন্ট অর্জনে সফল হয়েছি বৈকি!

আমার জেল জীবন আর দশজনের চেয়ে ভিন্নতর। ভিন্দেশ ভারতের আগরতলা রাজ্যের সেন্ট্রাল জেলে একশত একাত্তর দিন বন্দী ছিলাম।

১. পাকিস্তানের দালাল ২. জয় বাংলার দুশমন এবং ৩. পাক বাহিনীর চর হিসাবে আখ্যায়িত করে আমার দেশের লোকই আমাকে ঐ জেলে বন্দী করান। ফলে রাজবন্দি হয়েও থার্ড ক্লাস প্রিজনার্স হিসেবে জেল কর্তৃপক্ষের আচরণ আমাকে হজম করতে হয়েছে। ভালমন্দ, উচ্ছৃংখল ও সংযত নানা ধরনের স্বদেশী-প্রবাসী হাজতী-কয়েদী বন্দিদের সাথে দিন কাটাতে হয়েছে। চিড়িয়াখানার মত মনুষ্যরূপী কত রকমের জানোয়ার স্বভাবের লোকের যে বসবাস আল্লাহর দুনিয়াতে রয়েছে এর Specimen সংগ্রহসালা জেলখানা। এই ধরনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা কাহিনী হচ্ছে **'ভারতের জেলে আমার বন্দিজীবন'**।

১৯৭১ এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের দলিল না হলেও এই রচনায় অপাংতেয় সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার মূল্যায়ন-বোধের প্রয়োজনীয়তা সুধী মনে অবশ্যই জাগ্রত হবে; এ ব্যাপারে আমি প্রত্যয়ী। কবি রবি ঠাকুরের কথায় : যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই; পাইলেও পাইতে পার মাণিক রতন : আমার এই কাহিনী নিকৃষ্টদেরকে নিয়ে রচিত হলেও এতে 'মাণিক' এর ছটা রয়েছে সন্দেহ নেই।

সুধী পাঠক, নিকৃষ্ট প্রবাসী বন্দী হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় কাগজ কলম আমাকে দেয়া হয়নি। ফলে মগজে যেটুকু ধরে রাখতে পেরেছি সেটুকুই অকপট চিত্তে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি সযত্নে, সচেতন ও পক্ষপাতহীনভাবে। তবুও যদি কোন ভুলত্রুটি হয়ে যায়, কারো মনে আঘাত লাগে তবে এতে আমার ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

আপনারা জেনে অবাক হবেন এইটি আমার দ্বিতীয় দফা রচনা। মুক্তিপাওয়ার পরপরই প্রথম দফায় প্রায় ১৮০ পাতার ডিমাই সাইজ কাগজে গরম গরম এ কাহিনী লিখেছিলাম '৭১ এর অক্টোবর মাসে। এ বছরেরই ডিসেম্বর মাসে গোটা পাণ্ডুলিপিটি খোয়া যায়। পরে আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও শুভানুধ্যায়ীদের পীড়াপীড়িতে আবার এ কাহিনী দ্বিতীয়বার লিখতে শুরু করি ১৯৭৪ এর এপ্রিলে; শেষ কবি ১৯৭৫ এর নভেম্বর এর মাঝামাঝিতে। এতে আমার প্রথম দফায় লেখার অনেক তথ্য বিস্মৃত হয়; এবং দ্বিতীয় দফায় লিখতে বহু মানসিক যাতনা ও কসরতের শিকার হতে হয়। যাহোক তবু

www.pathagar.com

এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি, দ্বিতীয় বার এই কাহিনী লিখতে গিয়ে মনমগজের যথেষ্ট পাহারাদারী করেছি যাতে বাস্তবতায় রূপ—রং—রসে সমৃদ্ধ হয়ে যেন গ্রন্থের চরিত্র, সংলাপ বর্ণনা বিবৃতি অনতিরঞ্জিত ও অকৃত্রিমভাবে পরিস্ফুটিত হয়। এরপরেও একটা দুর্বলতা থাকছেই। তা হচ্ছে পরিবেশিত তথ্য কাহিনীর সত্যতা প্রসংগটি। বাহিরের জগতের সাথে সম্পর্কচ্যুত থাকায় জেলজগতের নানাজনের নানা কথা, নানা মন্তব্যই হচ্ছে এ গ্রন্থের অবয়ব-উপকরণ। হাজারো কথার ফুলঝুড়ি হলেও এর মাঝে কিছু সত্য অবশ্যই বিরাজমান; সে হিসেবে গ্রন্থটি একেবারে ফেল্‌না নয়।

আর একটা কথা। গালি হিসাবে 'দালাল' কথাটির ব্যবহারটি এদেশের পাংতেয় অপাংতেয় প্রায় সবারই রপ্ত হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় : হিংসুটে ও বদলোক ব্যতীত ভাল কথারও কদার্থ করার স্বভাব অন্য কারো মাঝে দৃষ্টিগোচর হয় না। দালাল কথাটির অপব্যবহার আমাদের দেশে এত বল্গাহীন হয়ে পড়েছে যে আমরা সবাই কম বেশি দালাল হয়ে পড়েছি ভিন দেশের, ভিন জাতির। যেমন : ভারতের দালাল, পাকিস্তানের দালাল, সি.আই.এ এর দালাল, কেজিবি এর দালাল, ইত্যাদি। বাংলাদেশের দালাল তথা এদেশের দেশ প্রেমিক যে কে তা এখন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বদেশে প্রেমের দৃষ্টিতে কে 'মোমেন' আর কে 'মুনাফেক' এই বিভ্রান্তির জাল অপসারণ অপেক্ষা বুননের প্রতিযোগিতায় আমরা এখনও সোৎসাহী রয়েছি। ফলে 'আমি দালাল' এর মত অনেকের অনাহুত জেলজীবন লাভ এখনও অপ্রত্যাশিত নয়। সে হিসেবে আচরণ ও জবানীতে সংযত ও সৎ হওয়ার আর্জি রইল সংশ্লিষ্ট সবার কাছে।

প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী এবার উপসংহারে আসা যাক।

লাখ লাখ শোকরিয়া আল্লাহর দরবারে যার ইচ্ছায় দুনিয়ার ভাল মন্দ ঘটছে, যার করুণায় ইতর-ভদ্র মনুষ্য ও অন্যান্য সৃষ্টি জগত দস্তর খানার মত বিছানো পৃথিবীতে পানাহার করে জীবন ধারণ করছে, যার হাতে জীব জড়ের জীবন মৃত্যু, যার নিকট সবাইকে জবাবদিহি হতে হবে এ দুনিয়ার ভাল মন্দ কৃত কর্মের রোজ কিয়ামতের দিনে।

শুরুতেই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই আখাউড়ার কেন্দুয়াই গ্রামের নিবাসী মরহুম জনাব নিদাগাজী সর্দারের নির্ভীক ও সহৃদয়বান সন্তান জনাব আব্দুস সামাদ ও তাঁর পরিবারবর্গকে, যাঁরা মুক্তি সংগ্রামের ভয়াল দিনগুলোতে আমার অসহায় পরিবারকে নিশ্চিত নিরাপত্তা ও প্রশান্তির আশ্রয় দিয়েছেন, সংগে সংগে মরণঝুঁকি পদক্ষেপ নিয়ে আমাকে আগরতলার জেল থেকে মুক্ত করেছেন। তাঁদের এ ঋণ ইহজনমে ভুলবার নয়, এর প্রতিদান—এ দুনয়ায় সম্ভব নয়। আল্লাহ এর প্রতিদান দেবেন নিশ্চয়ই।

জানাই মোবারকবাদ আগরতলার জেলকর্তৃপক্ষ ও বন্দি কয়েদী অধিবাসীদেরকে যারা তদানীন্তন পরিস্থিতির বলযে অন্যায় আচরণে আমার বন্দি কারাজীবনকে অনন্য অর্থবহ করে তুলেছেন। অর্থাৎ জেলার মধুবাবু ও ১নং ওয়ার্ডের সর্দার মহেন্দ্রদা হতে শুরু করে ২০ নং ওয়ার্ডের নক্সালী অজিত পর্যন্ত সবাইকে। আরো মোবারকবাদ জানাই শ্রদ্ধেয় মুহুরী আশুবাবু ও তদীয় পরিবারবর্গকে যাদের স্নেহমাখা পরশের অনুভূতি কোনদিনই ভুলবার নয়।

www.pathagar.com

আট

দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য সম্পাদক জনাব সাজ্জাদ হোসেনকেও আন্তরিক মোবারকবাদ। আমার জেল জীবনের কিয়দংশ ছাপিয়ে তিনি আমার এই গ্রন্থ প্রকাশনার দৃঢ় মানসিক ভিত্ রচনা করেছেন।

"ভারতের জেলে আমার বন্দিজীবন" এর সাহিত্য—শ্রী ও শিল্প—সৌন্দর্য সৃষ্টিতে যিনি সময়োচিত পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমার সহোদর প্রতিম বন্ধুবর; বহু গ্রন্থের বিশেষ করে গ্রন্থ-বিজ্ঞানের যশস্বী লেখক জনাব মোঃ সা'দাত আলী যাঁকে মোবারকবাদ জানানোটা কিয়ৎপরিমাণ কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হলেও নিজেকে ধন্য মনে করব। বন্ধুপ্রতিম ইতিহাসবেত্তা জনাব মোঃ আসাদকেও আমার আন্তরিক মোবারকবাদ যিনি আমার পাণ্ডুলিপি টাইপ করিয়ে এটা ছাপানোর জন্য উৎসাহ দান করেছেন।

মোবারকবাদ তাদের সবাইকে যাদের উষ্ণ অনুপ্রেরণায় আমার এ গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে আমার জেল জীবনাবসানের সুদীর্ঘ ২৩ বছর পর। সর্বশেষে স্মরণ করছি ঢাকা জেলার সভার থানাস্থ বাসাইদ গ্রামের অধিবাসী পুত্রতুল্য জনাব মোহাম্মদ হাসমত উল্লাহকে, যিনি আমার চরম আর্থিক দৈন্য জেনেশুনেও নিজের মানসিক শ্রম ও অর্থসঙ্কটের বিরাট অথচ অনিশ্চিত ঝুঁকি নিয়ে আমার এ গ্রন্থটি প্রকাশে কাঠোর কায়ক্লেশ স্বীকার করেছেন প্রায় একটানা একমাস অবধি।

সবশেষে : হে সুহৃদ পাঠক আপনাদেরকেও মোবারকবাদ জানাই এ গ্রন্থটি পড়ার মনস্থ করায়।

হে রাব্বুল আলামীন,

আমার এ নগণ্য সৃষ্টিকে আপনি পুণ্যশ্রম হিসেবে কবুল করে এর বরকতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইহ ও পারলৌকিক সুখ সমৃদ্ধি দান করুন; পুরস্কৃত করুন তাঁদেরকেও যারা শাহাদাত বরণ করে এই দেশ ও এর জনগণকে আজাদী দান করেছেন। পাকপুণ্য ভূমি হিসাবে এদেশকে হেফাজত করার তৌফিক এবং সাফল্যও দান করুন আপনি আমাদের নিঃস্বার্থ সংগ্রামী ব্যক্তিত্ববর্গকে—আমিন!

হে সুধী পাঠক আপনারাও বলুন : "আমিন! আমিন!"

ঢাকা,
১৪ই শাবান, ১৪১৫ হিজরী
১৬ই জানুয়ারী, ১৯৯৫ ইং

মুহাম্মদ আলমগীর

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ
কিডন্যাপ যেভাবে হলাম / ১১
সীংগার বিল সীমান্তে / ১৩
সাংবাদিকদের কব্জায় / ১৫
আখাউড়ার পরিবেশ / ১৬
নবজীবন লাভ / ১৮
সিধাই থানা / ১৯
সাথী রবি ভাই / ২০
রোমান্টিক সকল / ২১
বটতলী : এত ভগবানের কৃপা! / ২২
নির্যাতনে নব্যানন লাভ / ২৪
পানি নাই জল আছে / ২৫
হেট্ দি সিন্ বাট নট্ দ্যা সিনারস্ / ২৮
বোনাফাইড বন্দী হলাম / ২৯
স্বাগতমে মহেন্দ্র দা / ৩০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হাসপাতাল দর্শন / ৩২
চান্ এর দৃশ্য / ৩৩
লাঞ্চ / ৩৪
বিড়ির মহিমা / ৩৬
কেন্টিনের কাহিনী / ৩৬
ভাল আছ ত? / ৩৮
অনিল-অজিতের কাণ্ড / ৪০
ইন্টাররোগেশন / ৪১
সিরাজ ভাই : মানুষটি / ৪৫
মুসলিম লীগারদেরকে স্বাগতম / ৪৭
নবাগতদের জোয়ার / ৪৮
জামাতে নামাজ কায়েম / ৪৯
পীর ছাহেবের জিন্দেগী / ৫৩
কাফিলদ্দিনের ক্যারেকটর / ৫৭
লক্ষ্মী পুজায় আগরতলা / ৫৮
শাহাদাত হোসেন : মিস্টিরীয়াস ফিগার / ৬০
ইয়ে গাদ্দার হ্যায় / ৬১
প্রদীপ বাবুর প্রণয় কাব্য / ৬২
সারমন / ৬৪

www.pathagar.com

জুম্মা নামাজ কায়েম / ৬৭
রবীন্দ্র জয়ন্তী / ৭০
শিখারনীর বলয়ে / ৭২
মিথাংদের কথা / ৭৪
টি ম্যানেজারের করুণ কাহিনী / ৭৬
আব্দুর রহমানের খালাস / ৭৮
পুরস্কার : এই বেহেস্ত / ৮০
সেই ঐতিহ্যের নবোদ্দাম / ৮৩
মুক্তিদের অপারেশন টেকনিক / ৮৪
কল্পনায় অবগাহন / ৮৭
রিপোর্টের ক্রিয়া / ৮৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
নক্সালী মগজ / ৯১
আসসালাতু খাইরুম মিনান্ নাউম / ৯১
অজিতের দর্শন / ৯২
দুই বিদ্রূহী নেতা / ৯৩
ই.পি.আর. জলিল সাহেব : রাজনীতি- শূন্য মগজ / ৯৫
নকুলদাকে আর দেখিনি / ৯৫
জেলখানার পাথেয় / ৯৭
কানুদা পেটুক তবে কপট নন / ৯৯
রবি ভাই এর মুক্তিসন্দেশ / ১০১
জেলখানায় শিক্ষকতা লাভ / ১০১
ডাল-গাল-ফ'াল / ১০২
আশুবাবুর খবর এল / ১০৪
শবনম, আর স্বপ্ন হয়োনা / ১০৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
এজলাস / ১০৮
বিচারকের মেজাজ আশুবাবুর জবানীতে / ১০৮
আল্লাহ্ জানেন কি রায় দেন / ১১০
আশু বাবুর গৃহ-চিত্র / ১১২
শামসুর আব্বার হৃদয়-চিত্র / ১১৫
আনন্দপুর গ্রামে / ১১৭
স্বীয় গ্রাম ঃ দেবগ্রামে / ১১৮
ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সভা / ১১৯
আমার হাতকড়ার দাগগুলো এখনও ত মুছেনী / ১২০
কিংবদন্তীর আগরতলা / ১২১
সুধী পাঠকদের মন্তব্য / ১২৬

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিডন্যাপ যেভাবে হলাম

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যরাত। বাংলাদেশে শুরু হয় গণহত্যা অভিযান। পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ-নিরস্ত্র অসহায় মানুষের উপর। ফলশ্রুতিতে আবির্ভাব ঘটে বহু প্রতিক্ষীত সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের। এ দেশের জনগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে : (১) স্বাধীনতা পন্থী ও (২) পাকিস্তান পন্থী। স্বাধীনতা পন্থীদের ধারণা : বাংলাদেশ স্বাধীন হলে দেশের মানুষের ভাগ্যের সুপরিবর্তন ঘটবে। অপর দিকে পাকিস্তান পন্থীদের প্রত্যয় : বাংলাদেশ স্বাধীন হলে দেশটি আবদ্ধ হবে দিল্লীর গোলামীর শৃঙ্খলে। এভাবে একপক্ষ আরেক পক্ষকে শত্রু ভাবতে থাকে, ফলে সৃষ্টি হয় গৃহযুদ্ধ পরিবেশ। এর চরম বীভৎষ রূপের প্রকাশ ঘটে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চে।

১০ দিনি পর অর্থাৎ ৫ই এপ্রিল। আমি তখন আছরের নামাজ পড়ার প্রস্তুতি নিয়েছি। অজু করে বিকেলের চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। ফুফাত ভাই মজিবুর রহমান সাহেব তেলওয়াত করছিলেন পবিত্র কোরআন। ছেলে-মেয়েরা তখন পাশের বাড়িতে পুতুলের খেলায় রত। স্ত্রী রান্না ঘরে। এ সময়টিতে গ্রামের একটি লোক এসে বল্ল :

— স্যার বাড়িতে আছেন? অদ্ভুত স্বর-ভংগি তার।

— কে?

আমি স্যার। দু'জন লোক আপনাকে ডাকে। ঐ স্কুলের কাছে।

— আচ্ছা, আমি আসছি।

লোকটি চলে গেল। ভাই সাহেব কোরান-শরীফ বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন :

— কে এসেছিল রে?

— পাশের বাড়ির দুদু মিয়া। সে বলল দু'জন লোক নাকি আমাকে খোঁজছে। যাই না গিয়ে দেখা করে আসি, কি বলেন? চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে ভাই সাহেব কম্পিত স্বরে বললেন : যাও। তবে কথাবার্তা হুঁসিয়ার হয়ে বলবে। আবহাওয়া খুবই খারাপ।

— ঠিক আছে দোয়া করবেন যেন কোন অঘটন না ঘটে।

আমাদের আলাপ-আলোচনাতে এক অজানা আশংকার রেশ ফুটে উঠে। দু'জনের মুখই শুকনো। যাওয়ার পথে রান্না ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে বল্লাম :

— হাসনু, আমি একটু আসছি। দু'জন লোক নাকি আমাকে ডাকছে। হাই স্কুলের কাছে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই এসে পড়লাম বলে।

— না, না, তুমি যেওনা। সে দরজা আগলিয়ে দাঁড়াল। 'আমার মন যে তোমাকে যেতে দিতে সায় দিচ্ছে না'। হাসনুর হাত দুটো জোর করে সড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, "কি পাগল, আমি কি কোন অপরাধ করেছি যে আমার তাদের কাছে যেতে ভয় হবে?" চলে গেলাম স্কুলের কাছে। ঠিক চলে গেলাম না, বরং কোন এক অজ্ঞাত

www.pathagar.com

শক্তি যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলল ঐ লোকগুলোর কাছে। টের পাচ্ছি, এই চলার পেছনে আমার নিজস্ব কোন শক্তি কাজ করছে না। এটিই বোধ হয় অদৃষ্ট শক্তি তথা Divine Power যা রাজা-বাদশাহ, সবল-দুর্বল সবাইকে নত রাখে। এই শক্তিই বিজ্ঞান ও যুক্তি বহির্ভূত বিস্ময়ের জন্ম দেয় আমাদের এই মর জগতে।

স্কুলটি আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় পাঁচশ গজ দূরে। উত্তর দিকে। ওখানে একটি জীপ থেমে। জীপের পেছনটা আমার সম্মুখ পানে। দু'জন লোক তাকিয়ে রয়েছেন আমার চলার পথের দিকে। ওরা সিভিল পোষাক পরিহিত।

কলের পুতুলের মত এসে দাঁড়ালাম তাদের সামনে। একজন বলে উঠলেন :

— আপনিই কি আলমগীর? দেবগ্রাম হাই স্কুলের এ্যাসিস্টেন্ট হেড মাস্টার?

— জী হ্যাঁ। কাঁপা স্বরে জবাব দিলাম।

— আমরা আপনার খোঁজেই এসেছি। আপনি দয়া করে জীপে উঠুন।

— কেন, কোথায় যেতে হবে?

— এইত আখাউড়ায়। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পরই আপনাকে আবার আমরা বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেব।

ওদের অনুরোধে জীপে চড়লাম। বসলাম পেছনের সীটে। মুখোমুখি আরও দুজন বসে আছেন। ওরা সশস্ত্র সৈনিক। ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টের "স্বাধীন বাংলা" প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ, ইস্পাত কঠিন পাকিস্তান বিরোধী। কলিজাটা ধড়াস্ করে উঠল।

অজানা আশংকায় ছেয়ে গেল দেহ-মন। জীপের সিভিল পোষাকধারী ঐ দু'জন লোকের একজন স্টীয়ারিং চেপে ধরল। অপরজন তার পাশের শূন্য আসনিট পূরণ করল। জীপ ছাড়ল সোঁ-সোঁ শব্দে। গম্ভীর হয়ে উঠল আকাশ বাতাস। সবাই চুপচাপ। কংকর পিষে চাকা ঘূর্ণনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই যেন এ বিশ্বে নেই!

দশ পনেরো মিনিট পর জীপ থামল স্বাধীনতার অমৃতপিয়াসী ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টের পাক-সরকার বিদ্রোহী সৈনিকদের ক্যাম্পের আংগিনায়। সম্মুখের সীটের ওরা দুজন নামলেন এবং ঢুকে পড়লেন ক্যাম্পের অভ্যন্তরে। মিনিট চরেক পর ওরা ফিরলেন আর এক হতভাগাকে নিয়ে। হাত বাঁধা তার। মিশ কালো গায়ের রং। চেহারা বাংগালী বলে মনে হয় না। তাকে বসান হল আমার পাশে।

জীপ আবার ছুটল। খানিক পরেই পৌঁছল দ্বিতীয় ক্যাম্পের সদরে। চার কাপ চা আনা হল। আমাকেসহ সবাই চা পান করে নিলেন। সিভিল পোশাকধারী দুজনের একজন আদেশ দিলেন ঃ ওনার হাত বাঁধ।

বুঝলাম আমি বন্দি। ওদের ভদ্র ব্যবহারটা কসমেটিকের প্রলেপ মাত্র। অমনি দুজন সিপাহীর একজন গরু বাঁধা দড়ি দিয়ে আমার হাত বেঁধে দিল।

বল্লাম : যদি কিছু মনে না করেন তবে আমার হাত ঘড়িটা খুলে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে চাই। প্রয়োজনে ওরা এটা বিক্রি করে ক'দিন ত চলতে পারবে।

সিপাহীর দয়া হল। ঘড়িটি খুলে জীপের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত উদ্বেগাকুল জনতার একজনকে ডেকে বল্লাম : নাসির, আমার ঘড়িটা বাড়িতে দিয়ে দিস্।

আমার ভাগীনা ১৬/১৭ বছরের নাসির কম্পিত হৃদয়ে ঘড়িটি নিয়ে নেয় আমার হাত থেকে। যার আদেশে বন্দি হলাম, তিনি জীপের মাথার উপর দাঁড়িয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন আবেগাপ্লুত কণ্ঠে :

www.pathagar.com

ভাইয়েরা আমার,

আমি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার আসামী শামসুদ্দিন। আমি আপনাদের ব্রহ্মনবাড়ীয়া মহকুমার সিকিউরিটি অফিসার। আগরতলা মামলা সত্য। আইউবখান ঠিকই ধরেছিলেন আমাদেরকে। কিন্তু আমরা মরণপণ করেছি বাংলাকে স্বাধীন করবোই। ইনশাআল্লাহ্ "সোনার বাংলা" কয়েম হবেই। তবে এই আন্দোলনের শত্রুদেরকে আপনারা ধরিয়ে দিন। বিশেষ করে যারা গৃহ শত্রু, তারা পাঞ্জাবী অপেক্ষাও ভয়ংকর। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে এদের দেহ ক্ষত করে তাতে লবণ, লেবু আর মরিচ লাগিয়ে ওদেরকে হত্যা করা হবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার গোটা মহকুমা আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। সোনার বাংলা স্বাধীন বাংলার একাংশ হিসাবে আজ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মুক্ত এলাকা। দুশমনদের সাথে কোন আপোষ নেই।। আপনারা দোয়া করুন। জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!!

জয় বঙ্গবন্ধু!!

শেখ সাদীর (রহ.) কথাটা মনে পড়ল। মানুষ জিহ্বার ভাজে লুক্কায়িত থাকে। শামসুদ্দিন সাহেব জিহ্বার ভাঁজ থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

শ'পাঁচেক জনতা জমেছিল শামসুদ্দিন সাহেবের বক্তৃতা শোনার জন্যে। শ্রোতাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠল। কেহ কেহ "মারহাবা" চীৎকারের সাথে মুহুর্মুহু করতালিতে আকাশ-বাতাস উত্তেজিত করে তুলল। নাজির আহাম্মেদ সাহেবকে ও দেখতে পেলাম। কেহ কেহ এরূপ কিছুই করলনা। বিস্ময় আর উদ্বিগ্নের স্বচ্ছ ছাপ ছিল ওদের চোখে মুখে। নাজির আহাম্মেদ সাহেব পত্রিকার ব্যবসায়ী। আখাউড়ার অধিবাসী। কট্টর আওয়ামী লীগার। আমার বন্দি দশায় তাঁকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

জীপ আবার ছুটলো ভংকর দানবের দ্রুত গতিতে, বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে যেন। কত চেনা মুখ, কত পরিচিত পথ-ঘাট-মাঠ-প্রান্তর রূপালি পর্দার আলোকে চিত্রের মত সর্ সর্ করে বিলীন হতে লাগল দৃষ্টিপথ থেকে। ঐ দূরে দুটো গরু চড়ছে। ছাগলগুলো মুখ উঁচিয়ে দেখছে সবুজ কচি তৃণের খোঁজে সন্ধানী নয়নে, ডাল-পালাগুলো মৃদু দুলছে বাতাসের কোমল পরশে।

ডুবন্ত সূর্যের লালিমা এঁকে দিয়েছে গোটা বিশ্বের কর্মপ্রবাহে শ্রান্তির ছাপ। একটু বিশ্রাম পেতে চায় সৃষ্টিকুল। শান্তি আর নীরবতার পিয়াসী যেন গোটা ধরণী। আমি মুষড়ে পড়ছিলাম। আমি আজ বন্দী। বেয়নেটআঁটা বন্দুক দিয়ে ওরা আমাকে কুঁচি-কুঁচি করবে। সাধের পৃথিবীর সাথে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ। আমি 'ঘরোয়া' দুষমন। পাঞ্জাবীর চেয়েও খারাপ। নইলে কেন আজ আমার এই দশা? আশংকায় হাবুডুবু খাচ্ছিলাম নিরাশার সাগরে।

সীংগার বিল সীমান্তে

সাবেক পাকিস্তানের এম.পি. রোকনউদ্দিন সাহেবের মেরাসানী একাডেমীর শিক্ষক পরিমল বাবুকে দেখা গেল। তার নেতৃত্বে কতিপয় ছাত্র রেল সড়কের লাইন উপড়ে ফেলার কাজে ব্যস্ত। পাক বাহিনীর চলাচল ব্যাহত করার পূর্ব প্রস্তুতি এটি।

সামসুদ্দিন সাহেব জীপ থামাতে বললেন ড্রাইভারকে। জীপ থামল। শামসুদ্দিন সাহেব জীপ থেকে নামলেন। পরিমল বাবু 'আদাব' জানিয়ে বললেন :

www.pathagar.com

কি আর করি স্যার! এই কটি ছেলেকে দিয়ে আপাতত লাইন উপড়ে দিচ্ছি। এতে সিলেটের সাথে আখাউড়ার ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পাকিস্তানীরা আসতে অপারগ হবে।

—সাবাস! আপনাদের মত শত শত কর্মী এভাবে কাজে লেগে গেলে সোনার বাংলা হতে বেশী দিন লাগবে না।

শামসুদ্দিন সাহেব এরপর সিপাহীদেরকে বল্লেন : ওদের চোখ বেঁধে দিন।

চোখ বেঁধে দিল আমার আর আমার সাথীর। আচমকা অন্ধকার রাজ্যে নিক্ষিপ্ত হলাম। নিমেষের মধ্যে বিধাতার সোনালি রোদ মাখা বিশাল বৈচিত্রপূর্ণ ধরণী এক গহীন অন্ধকার কূপে রূপ নিল। হায়, চোখ থেকেও আজ আমি অন্ধ! নিখিল পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ আর বুঝি উপলব্ধি করতে পারবো না! হঠাৎ এক ঝাঁকুনি দিয়ে জীপ চলতে শুরু করল আবার। আমার দেহটা স্পর্শ করল সাথির দেহটিকে। বলরি পাঁঠার মত ওর শরীরটা কাঁপছে। ঘামে ভিজে গেছে ওর পরনের খাকী শার্টটা। নিজেও ভীত হযে উঠলাম। মৃত্যু প্রহর বুঝি বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে! শৈশবের কানামাছি খেলার চোখ-বাঁধা আর বন্দীর চোখ বাঁধার Sharp Contrast টের পেলাম। একটি আনন্দের, অন্যটি মৃত্যুভাবনার।

আমার গলা শুকিয়ে গেছে। সাথীর দেহের ঘাম নির্গত হতে লাগল বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির মত। বোধহয় ওর-ও পিপাসায় বুকের ছাতি শুকিয়ে গেছে। ওর-ও ঠোঁট আর জিহ্বা নিশ্চয়ই কাঠ হয়ে গেছে।

—একটু পানি খাওযাবেন? মিনতি জানালাম।

সিপাহী একজন বলে উঠল : দু-তিন মিনিট পর। এখানে ত দোকান-পাট, ঘর-বাড়ী নেই।

বুঝলাম অরণ্যের ভেতর দিয়ে চলছি।

গাছ-গাছড়া ঝোপ-জংগল আর ঢিবি-পাহাড় ডিংগিয়ে চলছে জীপটি। এর গতিবেগ প্রচণ্ড। প্রতিকুল বাতাস সর্‌সর্‌ পর্‌পর্‌ আওয়াজ ছড়িয়ে দিচ্ছে সরু পথের ধারের গাছপালাগুলোতেই। পিঁপ-পিঁপ হর্ণ বাজল। টের পেলাম শহর বা বস্তি এলাকায় পৌঁছেছি। তাই আবার মুখ খুললাম : একটু পানি খাওয়ান এবার।

সিপাহীরও যেন চমক ভাংগল।

—স্যার একজন আসামী পানি খাবে। সামনের চায়ের দোকানটায় একটু থামান।

জীপ থামল। পোয়া-গ্লাসে পানি এনে দিল কে যেন।

ঢক্ ঢক্ করে পানিটুকুন গিলে ফেললাম নিমেষে। সাথীও আবদার জানাল। সে-ও পানি পান করছে। ইতিমধ্যে জনতার বেশ ভীড় জমে গেছে। টের পেলাম ওদের ফিসফাস গুঞ্জরণ।

কেউ বলছে : শ্যালারা চর। পাকিস্তানী চর। শ্যালাদেরকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা দরকার।

কেউ বা বলছে :

—শ্যালারা হিন্দু বিদ্বেষী। টান দিয়ে নামায়ে ফেল্‌না? উত্তম মাধ্যম দিয়ে কলিজাটা শান্ত করি, একটু হাতের মজাটা মিটাই।

এরই মধ্যে ছোট মাঝারী ধরনের কংকর পাথর নিক্ষিপ্ত হতে লাগল আমার আর আমার সাথীর গায়ে-পায়ে। কেহ কেহ থু-থু-ও উপহার দিল আমাদেরকে।

www.pathagar.com

সাংবাদিকদের কব্জায়

শামসুদ্দিন সাহেব দেখলেন পরিস্থিতি গরম হয়ে উঠছে। ড্রাইভারকে বললেন : ড্রাইভার শীগ্‌গীর গাড়ি ছাড়ো। ড্রাইভার জীপ ছাড়লো বটে, কিন্তু ৪/৫ মিনিট পরে আবার থেমে গেল। এবার পড়লাম সাংবাদিকদের পাল্লায়।

—ওরা কে? কারা?

—চর।

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

—আর্মি হেড কোয়ার্টারে।

—আচ্ছা ভালোই হলো। ওদের সাথে আমরা একটু আলাপ করতে চাই। আমরা আগরতলার দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক। অনুমতি দেবেন কি?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

শামসুদ্দিন সাহেবের নির্দেশে আমি ও অচেনা সাথী, দুইজনকেই নামান হল।

—কি নাম আপনার?

—আলমগীর।

—বাড়ি?

—আখাউড়ায়।

—পেশা?

—মাস্টারী।

—লেখাপড়া?

—এম.এ; বি.এড।

—কোন্ দল করেন?

—জামা'তে ইসলামী।

—অ! মুসলিম লীগের পাণ্ডা বুঝি।

দাড়িওয়ালা হলেই ওরা, মানে আগরতলার জনগণ মুসলিম লীগের পাণ্ডা মনে করতেন।

—বয়স কত?

—তেত্রিশ।

—বিয়ে করেছেন?

—হ্যাঁ।

—ছেলে-মেয়ে আছে?

—জ্বী হ্যাঁ। পাঁচ মেয়ে এক ছেলে?

—রাম, রাম, এই বয়সেই এত ছেলেপুলে! আমরা ত ৩০ বছরের আগে বিয়েই করি না।

—আপনার নাম?

—রবিউল্যা।

—বাড়ি কোথায়?

www.pathagar.com

—কুমিল্লায়।

—কুমিল্লার কোন জায়গায়?

—শহরের বাদুর তলায়।

—কি করেন?

—কিছু করি না। আমি রিটায়ার্ড এস. আই।

—ও পুলিশের লোক বটে। মন্দ হলো না। কালকের সংবাদ-পত্রের জন্যে বড়ই উম্‌দা হয়েছে।

ক্লীক করে আওয়াজ হলো। আমাদের দুজনের ছবি তুলে নিলেন সাংবাদিক ভাইয়েরা। গোটা বিশ্বের সংবাদ-জগতে আমাদের পরিচয় ছড়িয়ে যাবে। সৃষ্টি হবে এক আলোড়ন : পাকিস্তানের দুজন চর মুক্তিসেনার হাতে ধরা পড়েছে। সংবাদ জগতে ফলও হতে যাচ্ছি!

আখাউড়ার পরিবেশ

সাংবাদিকদের কথোপকথনে সাথীর নাম পেয়ে গেলাম। রবিউল্যা।

মনে পড়ল আজ দুপুরের কথা। বন্দী হওয়ার ঘন্টা তিনেক পূর্বে এই রবিউল্ল্যাকেই গ্রামের মুক্তি যুবকেরা পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল আমারই বাড়ীর সামনে দিয়ে। বড় মেয়ে লিপি হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিয়েছিল :

—আব্বা, আব্বা, একটা লোককে মুক্তিরা ধরেছে। লোকটা নাকি বিহারী। পাঞ্জাবীদের চর। আমি আর আমার স্ত্রী ঘরের দহলিজে এসে জানালা দিয়ে দেখলাম রবিউল্যাকে।

মনে ভীষণ ব্যথা লেগেছিল—আহ্ লোকটাকে বোধহয় গুলি করে মারবে। আমার স্ত্রীরও ভীষণ ভয় হয়েছিল। নিছক সন্দেহে কি করে মানুষ মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করতে পারে? যুদ্ধ পরিবেশে 'সন্দেহ' এর মত সস্তা অস্ত্র দ্বিতীয়টি নেই।

গোটা আখাউড়াটাই থম্‌থমে ভাব ধারণ করেছিল তখন। গংগাসাগরের রেল সড়কের ব্রীজটা ভেংগে দিয়েছিল মুক্তিরা এর আগের রাত্রে। ব্রীজ ভাংগার কাজে সাহায্য করেছিল ইন্ডিয়ার দুজন গোর্খা সামরিক অফিসার।

রাতের অন্ধকারে হুস্ হুস্ করে কয়লার ইঞ্জিনটা গিয়েছিল গংগাসাগর। ভয়ে বুক কাঁপছিল তখন আমাদের সবার। রাত প্রায় পৌণে ২ টায় বিরাট শব্দ রাতের অখণ্ড নীরবতাকে খান্ খান্ করে ভেংগে দিল। দু'দুটো ডিনামাইটে উড়িয়ে দিল বৃটিশ আমলের তৈরি রেলওয়ে ব্রীজটা। সেই থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেল সম্পূর্ণভাবে। কুমিল্লা, ঢাকা, আখাউড়া, চট্টগ্রাম, সিলেট, প্রত্যেকটি স্থানই খণ্ড খণ্ড দ্বীপের মত যোগাযোগ বিহীন হয়ে পড়ল। মহাসংকটের পদধ্বনি স্পষ্টতর হতে লাগল। এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লার মোটর সড়কের "তিন লাখ পীরের" ব্রীজটিও ভেংগে দেওয়া হল। পর পর এই দুটি পুল ভাংগার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ব্যারিকেড সৃষ্টির এক অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব হিড়িক পরে গেল মহল্লায় মহল্লায়। গাছ কেটে কেটে রাস্তায় চলাচল ব্যাহত করা শুরু হল। খুন্তী-কোদাল-শাবল নিয়ে নেমে পড়ল যুব শ্রেণীর দল বড় বড় রাস্তায় গর্ত সৃষ্টির জন্যে।

বিভিন্নমুখী যাত্রীর দল পিঁপড়ার মত সারিবেঁধে হাঁটতে শুরু করল উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে। মাথায়-পিঠে রংবেরং এর পুটুলী-পেটারা, বিছানাপত্র, সুটকেস-ট্রাংক,

www.pathagar.com

হাঁড়ি পাতিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাঁটছে ক্লান্ত পদে। কেউ কেউ কোলে-কাঁখে, কাঁধে বইছে ওদের আদুরে মানিকদেরকে। ওদের চোখ-মুখ-চেহারায় ক্লান্তি আর উদ্বেগের ছাপ। অনেকের পা ফুলে উঠেছে একটানা ১০/১৫ মাইল পথ চলায়। কেউবা গাছের তলায়, কেউ দোকান-পাটের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। এদিকে মুক্তির দল ভলান্টারী সার্ভিস দিচ্ছে। জালা-বালতী ভরে খাবার পানি বিতরণ করছে পথিকদেরকে। দুর্দিনে মানুষ মানুষের সেবায় নেমেছে স্বতস্ফূর্ত ভাবে। এ এক অপূর্ব দৃশ্য! কিয়ামতের ময়দানে জম্‌জম্ পানি বিতরণের ওয়াজ-নছিহতের কাল্পনিক ছবি ভেসে উঠল মনের-মুকুরে।

এসময়ে আর একটি ব্যাপার ঘটল যা জনমনে সৃষ্টি করেছিল দারুন আতংকের। আখাউড়া থেকে কসবা পর্যন্ত সীমান্ত এলাকা সম্পূর্ণ মুক্ত। এ অঞ্চলের বাংগালী ই.পি. আর. বাহিনীরা তাদের সহকর্মী অবাংগালী ই.পি. আর. দেরকে বেয়নেট দিয়ে পরজগতে পাচার করে দিয়েছে। এখন আর প্রতিরোধের ভয় নেই। ফলে বন্ধুরাষ্ট্র আগরতলা স্টেটের বাংগালীদরদী অধিবাসীগণ সীমান্ত ডিংগীয়ে কসবা ও আখাউড়া অনুপ্রবেশ করেছে বাঁধভাঙ্গা প্লাবনের মত। তোহ্‌ফা হিসেবে তারা অধিকাংশই হাতবোমা, গ্রেনেড, ককটেল, মলোটভ ও এ ধরনের মারণাস্ত্র তুলে দিলে পূর্ব পাকিস্তানের আনকোড়া মুক্তিসেনা ও অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব শ্রেণীর হাতে। পাঞ্জাবী ও তাদের দালালদের খতম করার কাজে এই সাহায্য "সোনার বাংলা" রচনায় বিদ্রোহীদের হৃদয়ে এক উন্মত্ত উল্লাস ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল।

আগরতলার প্রায় হাজার তিনেক লোক এক ঠেলায় আখাউড়া বাজারে পদার্পণ করল সেদিন। ওদের অধিকাংশ যুবক এবং ছদ্মবেশী ভারতীয় সৈন্য। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই মাছ-মাংস, ডাল-চাল, লবণ-মরিচ এবং প্রসাধনী দ্রব্যাদি কিনে এরা সমস্ত বাজর উজার করে দিল। ২২/২৫ টাকা মন দরের চাল ৩/৪ ঘন্টার মধ্যে হুর হুর করে ৬০/৬২ টাকায় বিক্রী হতে লাগল। ডেনমার্কের কনডেন্সড মিল্ক, তিব্বতের স্নো, পাউডার, সার্ফ-সব বিক্রি হয়ে দোকানপাট প্রায় শূন্য। বুক পকেট, সাইড পকেটে পর্যন্ত স্টার সিগরেট, সাবান ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ করে আগরতলার মেহমানরা রওয়ানা হল স্বদেশাভিমুখে দিগ্বিজয়ের বেশে।

রিক্সা, ট্রাক, সাইকেল বোঝাই লবণ, মরিচ, চাল-ডাল, সুরসুর করে পাচার হয়ে গেল ওদের দেশে। বাংগালী ভাইয়েরা আগরতলার মেহমানদের অকৃত্রিম সেবা-শুশ্রূষায় আত্মহারা। এক পর্যায়ে জনৈক দোকানদার হিন্দুস্থানের পয়সায় জিনিস বিক্রি করতে অসম্মতি জানানোর ফলে গোলযোগ বেঁধে যায়। মুক্তিবাহিনীর যুবকেরা এই গোলযোগ মিটিয়ে দেয় দোকানদারকে শাসিয়ে :

—নে-নে বেটা, হিন্দুস্থানের পয়সা এখন আর বেআইনী নয়।

এই সময়েই আখাউড়ার বড় বাজারের আর একটি ঘটনা। বড় বাজারের ই.পি. আর. ক্যাম্পে সাতজন অবাংগালী সৈনিক ছিল। ওদের সাথে বাংগালী ভাইয়েরা দু' একদিন আগেই সড়ে পড়েছিল। ওদের সড়ে পড়ার পরপরই এক রাতে ঐক্যাম্পে আচমকা আক্রমণ চালাল বাংগালী যুবকেরা। ছোট-বড়, সামরিক-বেসামরিক প্রায় পাঁচশত লোক লাঠি সোটা, বন্দুক, রাইফেল নিয়ে তৈরি সবাই। বাংগালীর পক্ষ থেকে গুলী ছোঁড়া হয় ১৫/২০ টি। প্রতিউত্তরে ক্যাম্প থেকেও গুলীর আওয়াজ ভেসে আসল।

www.pathagar.com

এমনিভাবে রাত দুটো পর্যন্ত গোলাগুলি চলল। রাত দুটোর পর শুধু বাংগালীর পক্ষ থেকে গুলী হচ্ছে, কিন্তু প্রতিজবাব আর আসছে না। শত্রুপক্ষ বোধ হয় খতম হয়েছে।

রাত গড়িয়ে সকাল এল। নূতন দিন বয়ে আনল বাংগালীদের বিজয়-সূচনা। সকাল ১০টার দিকে বাংগালী যোদ্ধাগণ ক্ষেত খামার ও পাটের গুদামে আনাচে-কানাচে হতে বেরিয়ে এল। শুধু একজন নিজের জীবনটা হাতের মুঠোয় নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ক্যাম্পে প্রবেশ করল। ক্যাম্প শূন্য। একজন অবাংগালীও এতে নেই। কোন লাশও দেখা যাচ্ছে না। মাছ গোশতও চিকন চালের ভাত পূর্ণ ডেকডেকচীগুলো রয়েছে। ভাতের থালায় পানি। ওরা খেতে বসেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তার আর সময় হয়ে উঠেনি। ওরাসব রাতের আঁধারে ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেছে, কে জানে, কোন দিকে।

আকাশ বাণী থেকে খবর পরিবেশিত হল ঃ

"মুক্তি বাহিনী আখাউড়া জয় করে ফেলেছে। আখাউড়ার পতন ঘটেছে মুক্তিদের হাতে"। সেই উল্লাসের পরিণতিতেই বাঁধ ভাংগা জোয়ারের মত আগরতলার মানুষ আখাউড়ায় গিজ গিজ করেছে আজ।

নবজীবন লাভ

সামসুদ্দিন সাহেবের কণ্ঠস্বর।

আপনারা জীপে উঠুন।

হুঁস হল আমার। রবিউল্যা ও আমাকে তুলে দেওয়া হল। জীপ আবার ছুটল। পনর বিশ মিনিট পর আবার থামল। আমাদেরকে দ্বিতীয় বার নামন হল। পা-এর স্পর্শে বুঝলাম একটি গাছের গোড়ায় দাঁড় করান হয়েছে আমাদেরকে।

—Who are they?

—They are suspected to be spies?

—From where have they been arrested?

—Akhaura camp.

—What is your intention now?

—They should be shot-dead.

অর্থ বুঝলাম আমাদেরকে Shot-dead করা হচ্ছে। সংগে সংগে মৃত্যুর হিম স্পর্শ অনুভব করলাম। বাঁধা চোখের অন্ধকার রাজ্যে ফুটে উঠল অতীতের ইতিহাস। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, শৈশবকালের সমস্ত ইতিবৃত্ত। আশ্চর্য মানুষের মন। কী অদ্ভুত শক্তি এর। আয়ানার মত সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে এত মুখ, এত মায়া, আদর-বন্ধন। হায়, এক্ষুনি সব শেষ হয়ে যাবে—শুধু একটি মাত্র গুলীতে। সমস্ত দেহ থেকে ফিনফিনিয়ে ঘাম বেরুতে লাগল। নিমিষের মধ্যে চুপসে গেল জামাকাপড়। মৃত্যু কি ভয়ংকর! আজ, একটু পরেই আমি কুহেলিকা মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করবো? মনে মনে কালিমা পড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কই তা-ত পারছি না। কালেমা পড়তে চাই বটে, কিন্তু আব্বা-আম্মার অশ্রুসিক্ত চেহারামোবারক, নয়নমণি বাচ্চা-কাচ্চাদের কচি মুখ আমার কণ্ঠকে বাষ্প রুদ্ধ করে রেখেছে। ঈমানের শক্তি লয় পেয়ে যায় পারিবারিক মমতার তাপে। জিহ্বায় প্রাণ নেই।

www.pathagar.com

ভয় নেই, আছরের অজু আছে এখনও। তাই গুলি খেয়ে মরলেও মৃত্যু যন্ত্রণা অসহনীয় হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অজুর বরকতে আমার এই মৃত্যুকে শাহাদাতের মর্যাদা দেবেন।

দু-তিন সেকেন্ডের মধ্যে বিগত তেত্রিশ বছরের ইতিহাস আমার মানস দর্পনে ভেসে উঠল। টের পেলাম রবিউল্যা গোছল করে ফেলেছে। ঘামে তার শরীরও ভিজে গেছে। সে কাঁপছে শীতের প্রকম্প মত। হঠাৎ একটি গাড়ীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। নতুন কণ্ঠস্বর :

—Who is this man?

—School teacher sir.

—Who is this?

—He is a retired S.I. (Sub Inspector of Police)

এরপর সবাই চুপচাপ। মিনিট খানেক পর আবার শুনা গেল :

—Both of them are civilians I see. Don't kill them now. Put them into prison. We will decide their fate later on.

—Yes sir.

নবাগত একজন সামরিক অফিসার মনে হল। তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন শামসুদ্দিন সাহেব। ঘটাঘট আওয়াজ হল। তাক করা রাইফেলটা বুঝি নামিয়ে রাখা হল। শ্রবণশক্তি দিয়ে সব বুঝলাম। নিমিষের মধ্যে অনুভব করলাম আমার আর রবিউল্যার আয়ুষ্কাল বাড়ানো হয়েছে। পৃথিবীর মুখ আরও কতদিন দেখতে পাবো। ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা'র মুখ আর দেখতে নাপেলেও এতে কি আসে যায়? নিজের জীবনটাত আবার একটু চাখা যাবে, মন্দ কি? হুস হল—বাস্তবতায় ফিরে এসেছি। আমরা জীবিত! আমার দেহ মাটির মায়া এখন ছিন্ন করেনি।

সিধাই থানা

আবার ছাড়ল জীপ। প্রায় এক ঘন্টা পর পৌঁছলাম এক থানায়। হাত-চোখ খুলে দিল আমাদের দু'জনের। দু'জন পুলিশ ঢুকিয়ে দিল আমাদেরকে বাঘের পিঞ্জিরার মত একটি বিরাট কাঠের কুপরীতে। পৃথিবীর 'বাচ্চা পৃথিবী' মেন হল এটি।

কি আনন্দ, কত আনন্দ! আবার চোখ ফিরে পেলাম! আলো আর আলো। বাতাস আর বাতাস। রাত অনেক হয়েছে। গোটা বিশ্ব থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল আমাকে আর রবিউল্যাকে-যেন এক যুগ কেটে গেছে। কী লাভ ওদের এমন করে? এখন ত আমি বাড়িতে থাকতাম, ছেলে-মেয়ে স্ত্রীর সাথে। আমার স্ত্রী বোধ হয় মশারী ফেলে শুয়েছে। ওর কি ঘুম হবে? অসম্ভব, না, না, সে ঘুমাতে পারে না। আমার ব্যবহৃত শূন্য বালিশটি আজ তার জন্য 'কাল'। সে অঝোরে কাঁদছে নিশ্চয়ই। হয়ত তার কান্না শুনে লিপি-বিথীও ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। ওরা জিজ্ঞেস করছে :

— আম্মা আপনি কাঁদছেন কেন?

— তোর আব্বা আজ কোথায়? সে কি বেঁচে আছে, না তাকে মুক্তি সেনারা গুলীই করেছে। কল্পনার পীড়নে নিজেও ছোট্ট শিশুর মত হঠাৎ কান্নায় ভেংগে পড়লাম। পুলিশ এসে ধমক দিল। :

—এই কি হয়েছে? তুমি কাঁদছ কেন?

www.pathagar.com

—সম্বিৎ ফিরে পেলাম। নীরব হয়ে গেলাম। রবিউল্যা চুপ। নিশ্চল মূর্তির মত বসে রয়েছে। ওর বোধ শক্তি লোপ পেল বুঝি!

—এই, তোমাদের নাম, ধাম বলত?

রবিউল্যা বলল। আমিও ঠিকানা বললাম। আমাদের নাম রেকর্ড করা হয়েছে, প্রবাসী থানায় "অপরাধী" হিসেবে।

—দারোগা বাবু ক্ষিদে পেয়েছে।

—হ্যাঁ বাপু, তোমাদের জন্য চিড়ে আর চিনি আনতে পাঠিয়েছি। দারোগা বাবু রবিউল্যাকে জবাব দেয়।

কিছুক্ষণ পর একজন সিপাই চিনি, চিড়া ও এক ঘটি পানি এনে দিল। আমরা এখন ইন্ডিয়ান সরকারের হাওলায়। ওদের পোষ্য ইতর প্রাণী।

—বাবু, এটা কোন থানা?

—সিধাই থানা।

রবিউল্যা চুপিটি মেরে যায়।

একটু একটু করে চিড়া, চিনি আর পানি খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিলাম আমি ও রবিউল্যা। বাইরে তখন কড়কড়াৎ গর্জন, বৃষ্টি আর দম্‌কা বাতাস। আমার মনটা চলে গেছে ছেলেমেয়েদের কাছে। একটু পরেই হুড়-মুড় শব্দ হল ভীষণভাবে। পিঞ্জিরাটাও নড়ে উঠল বেশ জোরে। আমি ও রবিউল্যা ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলাম। দুজন পুলিশ পিঞ্জিরার দুযার খুলে দিয়ে চারজন বন্দিকে ঠেলে দিল।

নিজের দেহে স্পন্দন অনুভব করলাম। আমার মন-পাখি বাড়ি হতে ফিরে এসেছে আবার। আবদ্ধ হয়েছে স্বেচ্ছায় তার দেহ-পিঞ্জিরায়। সম্বিৎ ফিরে পেলাম, আমি বন্দি। সিধাই থানার বন্দিশালায়।

সাথী রবি ভাই

নতুন চারজন। ওরা সবাই কাবুলীওয়ালা। রবি ঠাকুরের মিনি গল্পের নায়ক 'রহমত আলী' অথবা সৈয়দ মুজতবা আলীর 'আবদুর রহমানের' মতই একজন। বয়স প্রায় ৭০/৭৫ হবে। বাকী তিনজনের একজন প্রৌঢ় বয়সের, অন্য দুজন যুবক। ওরা সবাই হৃষ্টপুষ্ট। গায়ের রং কাঁচা হলুদের মত। রবিউল্যা তাদের সাথে কথা জুড়ে দিল।

—হাম ছব কাবুলীওয়ালা আছে। হামকো মুক্তিআদমী সিলেট ছে পাকাড়লিয়া। হাম্‌রা পাঁচাত্তর হাজার তংকা ওলোগ লেগিয়া, ওয়ে দোকান মে জো কাপড়া থা ও-ভি লুটলিয়া।

—আপকা নাম কিয়া?

—জানে আলম, হ্যামারা ঘর আফগানস্থান।

—ওয় তিন আদমী আপকা কেয়া হ্যায়?

—ওয়ে বুড়ো আদমী হামারা আব্বাজান, আাওর সবছে ওয় ছোটা যো হ্যায় ইয়ে হামারা লাড়কা ফিরোজ খাঁ, আওর ওহামারা ভাতিজা সাব্বির খাঁ।

—সামঝা। রবিউল্যা উত্তর দেয়। মুখে করুন হাসি ফুটে ওঠে তার, আষাঢ়ের কালো মেঘে যেন চপল বিদ্যুতের এক টুকরো ঝিলিক!

রবিউল্যা বুক পকেট থেকে বিড়ি বের করে। প্রহরীর কাছ থেকে দিয়াশালাই নিয়ে কাঠি ঠুকে জ্বালিয়ে নেয় বিড়ির মাথাটা। আমার মনটা একটু চাংগা হয়ে ওঠে ওদের আলাপে। বিড়ি টেনে আমেজ পেতে চায় মনটা।

www.pathagar.com

— রবিউল্যা ভাই, আমাকে একটা বিড়ি দেবেন?

— নাও, নাও ভাই, একটি বিড়ি আর কি জিনিস।

রবিউল্যা ভাই নিজে একটি ধরাল আর একটি বিড়ি দিল আমাকে। থানায় প্রহরী ঘন্টা বাজায়। ঢং-ঢং-ঢং-রাত ১২টা। বিড়ি টানে রবিউল্যা ভাই, আর বলে চলে তার বন্দি হওয়ার কাহিনী :

আখাউড়ার জমির খাঁ রবিউল্যা ভাইয়ের জামাতা। ১৯৬৪ সনে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন তিনি। জমির খাঁ নন-বেঙ্গলী। আখাউড়ার ই.পি.আর. ক্যাম্প-এর লেন্স নায়ক। ২৬শে মার্চে শেখ সাহেবের ঐতিহাসিক ভাষণের পর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। গাড়ি-ঘোড়া চলাচল বন্ধ। রবিউল্যাহ ভাই নিজের মেয়ের খবরা-খবর নেয়ার জন্যে আখাউড়ায় পৌঁছেন তিনদিন হাঁটার পর।

পথে স্বাধীন-বাংলার পাগল যুবকেরা তাকে 'চর' হিসেবে বেঁধে ফেলে। প্রথম ওরা রবিউল্যা ভাইকে নন—বেঙ্গলীই মন করে। কারণ রবিউল্যা ভাইয়ের গাঢ় শ্যামলা দেহের বরণ ও চেহারাটা বিহারী-বিহারী। ওদের কি দোষ। রবিউল্যা ভাই নিজেকে বাঙ্গালী হিসাবে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও তারা আঁটে অন্য ফন্দি।

—মিয়া, বাঙ্গালী হইলে বিহারীর কাছে মাইয়্যা বিয়া দিলা কা?

—বিহারী হিসাবে ত মেয়ে বিয়ে দেই নি, বরং মুসলমান হিসাবেই দিয়েছি।

—বিহারীরা ত বাংগালী নয়।

—বাংগালী ত নয় আমিও মানি, কিন্তু...

—নিজের জামাই যখন বিহারী তা হলে তোমারে ছাড়ন যায় না। তুমিও পাঞ্জাবী আর পাকিস্তানের দালালী করবা।

নিবিষ্ট মনে শুনতে লাগলাম রবি ভাইয়ের কাহিনী। রাত ভার হয়ে আসছে। কাবুলীওয়ালা চারজন তন্দ্রাচ্ছন্ন। ঠক্ ঠক্ ঠক্। প্রহরীর বুটের আওয়াজ।

—আর গল্প নয়, ঘুমাও এবার। কাল সকালে উঠতে হবে তোমাদেরকে। যেতে হবে অনেক দূর-ঐ বটতলীতে।

—বাবু, বটতলী কোথায়? কত দূরে?

—আগরতলায়, ২২/২৫ মাইল হবে। চুপ, আর কথা নয়।

রবিউল্যা ভাই চুপ হয়ে যায়। মন আমার আবার চলে যায় বাড়ির পাশে। ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে খু-উব। হয়ত আমার স্ত্রী বাহুবেষ্টনীতে ধরে রেখেছে শাম্মীকে তন্দ্রচ্ছন্নভাবে। দরজা-জানালা বন্ধ। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে মন-পাখি আবার দেহ পিঞ্জিরায়।

রোমান্টিক সকল

রাত কেটে গেল। সকালটা মন্দ নয়।

গত রাতের বৃষ্টি প্রকৃতিকে সুন্দরী তরুণীর মত মায়াবী রূপ আর স্নিগ্ধতা দান করেছে। প্রভাত শিশির সদৃশ বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির পানি গাছের পাতায়। পাখীর হাল্কা ডানা ঝরানো শব্দ। এদের কিঁচিরমিঁচির ধ্বনিতে নূতন দিনটি মধুময় হয়ে উঠেছে। ঝির ঝিরে বাতাস আর নবীন সূর্যের মিষ্টি রোদ সোহাগ করছে কচি কিশলয়গুলোকে। গত রাতের ক্লেদ-ক্লান্তি ধুয়ে মুছে নতুন পৃথিবীর জন্ম হল।

www.pathagar.com

সাত-সকালের পেশাব-পায়খানা সেরে হাত মুখ-ধূয় নব জীবনের স্বাদ গ্রহণ করলাম আমরা সবাই। সিপাইকে অনুরোধ করে এক প্যাকেট "বানর" মার্কা বিড়ি আর দুকাপ চা আনাল রবিউল্যা ভাই। বিড়ির ভাগ পেল সবাই। চা দুকাপ শুধু খেলাম আমি আর রবিউল্যা ভাইয়ে। গত রাতের কিছু চিড়া ছিল। তা চায়ের সাথে "টা" এর পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হল। মনোরম সকাল। পাখির কুজন আর চা-চিড়ে দিয়ে ব্রেক ফাস্ট। এরপর বানর বিড়ি সেবন। অপূর্ব স্বাদ পেলাম। যাকে বলে Life full to the brim of joy!

আজকের সকালটা রোমান্স সৃষ্টি করল জীবনের রাজ্যে। এই সকালের হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ চির উজ্জল থাকবে। কাবুলী-বাংগালী আর হিন্দুস্তানের পুলিশ-সেপাই, সবাই যেন এক আত্মার বিভিন্ন রূপ আর প্রকৃতি। এমনি ধরনের মায়া-মমতা ও সৌহার্দ্রের সাগরে অবগাহন করে পরিবার-বঞ্চিত জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা হারিয়ে গেল আমাদের।

বটতলী : এত ভগবানের কৃপা!

সকাল ন'টা। তিনজন পুলিশ জোড়া হাত-কড়া আর দুগাছি দড়ি নিয়ে হাজির হল। ওদের একজন প্রায় দুই সেরী ওজনের তালাটা খুলে পিঞ্জিরার দরজাটা ঘটাস্ করে খুলল।

—তোমরা সব বেরিয়ে আস।

হামাগুড়ি দিয়ে খাঁচার ছোট দরজার ছিদ্র পথে আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম। একজন পুলিশ একজোড়া হাত কড়া দিয়ে আমাকে আর রবিউল্যা ভাইকে মিতালী পাতিয়ে দিল। আর কোমর বেঁধে দিল একগাছি দড়ি দিয়ে। ঠিক এমনিভাবে কড়া লাগাল বাকী চারজন কাবুলীওয়াকে। ওদের চারজনকে-ও বাঁধা হল একগাছি দড়িতে।

এবার আমরা ছ'জনই খানদানী আসামী বনে গেলাম।

আমার নানা পেশকার ছিলেন। তাঁর কোর্টে হররোজ আসমীদেরকে এভাবে আনতে-নিতে দেখতাম। বড় ভয় হত, মায়া হত ওদেরকে দেখে। সেই ছোট্ট বেলার ছবিটি আজ ভেসে উঠল মনের আনন্দে। চমৎকার মজা লাগল এই স্মৃতি রোমন্থন করে।

সিধাই থানার পাশ দিয়ে শুয়ে থাকা আগজরের মত বাস-রুটটি চলে গেছে আগরতলার দিকে। তিনজন এসকর্ট পুলিশ দাঁড়ায় রাস্তার পাশে। রবিউল্যা ভাই বিড়ি ধরালেন। পুলিশ তিনজনকেও বিড়ি দিলেন।

—আমাদেরকে কোথায় নেবেন স্যার?

—তোমরা এখন বটতলী যাবে। সেখান থেকে তোমাদেরকে চালান দেওয়া হবে আগরতলা কোর্টে। পুলিশের উত্তর শুনে সবাই চুপ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম : মন্দ নয়। দুচোখ ভরে দুনিয়াটাকে দেখার একটা সুযোগ মিলল্ আবার। প্রাণভরে দেখে নেবো দুনিয়াটাকে এবার। বলাত যায় না কোর্টে গিয়ে যদি আবার মৃত্যুদণ্ডই হয়ে বসে, তবে ত এই মায়াময়ী বসুন্ধরা দ্বিতীয়বার দেখার মওকা মিলবে না। "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে" : ধন্যবাদ রবিবাবুকে এই কাব্য-চেতনার জনক হিসেবে।

একটা কাঠবডি বাস থামল। সবাই চড়লাম। যাত্রীরা পুলিশদেরকে দেখে জায়গা করে দিল বসার জন্য। কিছুক্ষণ পরে বসার সুযোগ আমাদেরও ঘটল কপালে।

ভঁত-ভঁত হর্ণ বাজিয়ে বাস ছুটল। হৃদয় উজাড় করে দেখতে লাগলাম চলমান প্রাকৃতিক দৃশ্যের শোভারাজি। কোথাও বিরাট মহীরূহ ছাতার মত ডালপালা ছড়িয়ে ঠায়

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে রয়েছে মুক্ত পৃথিবীর বুকে। কোথাও দু-চারটে গরু-ছাগল নিবিড় মনে কচি-কচি সবুজ তৃণ খাচ্ছে। কোথাওবা উর্বর ভূমিখণ্ড ছড়িয়ে রয়েছে। আবার কোথাও পাহাড়ের ঢালুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চা-বাগান। পিঠে-কাঁধে শিশু বহন করে পাহাড়ী মেয়েরা চা-পাতা ছিঁড়ে ঝুড়িতে ভরছে। চা-বাগানের শ্রমিকেরা কত সুখী। কে ভোট পেল, কে হারল বা কে জিতল, দেশ কি স্বাধীন হলো না পরাধীনতার গ্লানি বয়ে আনল, ওদিকে তাদের কোন অনুভূতিই নেই। দুটো ডাল-ভাত আর একটুকরো মোটা কাপড়—এই দিয়েই ওদের জীবন ও সভ্যতার ইমারত। তাইত ওরা সুখী। ওদের পেছনে পুলিশ ধাওয়া করে না, বন্দি হয় না ওরা বিশ্বাস ঘাতক অথবা দেশ-প্রেমিক হিসেবে। কি দরকার ছিল দেশপ্রেম আর আদর্শের? গোটা দেশ যাক না গোল্লায়? দুটো ডাল-ভাত নিয়ে সংসার কাটানোইত বুদ্ধিমানের কাজ।

বাসের যাত্রীরা কথা বলছে, নানা কথা, নানা মন্তব্য। কে একজন বলে উঠল :

—এবারের চোটে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। শত শত যুবা-বৃদ্ধবনিতা আগরতলায় এসেছে শরণার্থী হয়ে, আর আমাদের লোকেরা গোপনে অস্ত্র সবরাহ করছে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে।

—তাত হবেই ভাই। শিলপাটায় গুঁতো-গুতি, সাধারণ মানুষের মরণ। এই দেখনা, দুজন বাংগালী নিরপরাধকে আজ বন্দী হতে হয়েছে। দ্বিতীয় লোকটি আমাদের দুজনের প্রতি ইংগিত করল।

কে একজন বলে উঠল :

—মানুষ চেনা বড় দায় দাদা! নিশ্চয়ই কোন গোমর রয়েছে এর মধ্যে। পাপ না করলে কি কেউ জেলে যায়? ভগবান ত বুদ্ধু নয়, নিশ্চয় ওরা "জয়বাংলার" শত্রু।

আমার কানে সব কথাই ঢুকছিল। কিন্তু সব কথাই পুরো মনোযোগ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছিলাম না।

বাসের মহিলা যাত্রীরা ভীত হয়ে পড়েছিল কাবুলীওয়ালা ও আমাদেরকে দেখে। ওদের একজন ফিসফিসিয়ে বলছিল :

—এদের বোধ হয় জ্যান্ত পুঁতে মারবে। রাম! রাম! হরে রাম!

একটানা প্রায় দেড়ঘন্টা চলার পর বাস থামল বটতলীতে। আগরতলার প্রধান বাস জংশন। শত শত লোক ভীড় করছে আমাদের বাসকে কেন্দ্র করে। অবাক হলাম : এত লোক কেন? ওরা কি চায়? ওরা কি সবাই যাত্রী? না অন্য কিছু আছে এতে? শতপ্রশ্ন শতদলের মত পাপড়ি মেলছিল আমার হৃদয় সরোবরে।

বটতলী এক ইতিহাস। ১৯৪৭ সনের ১৪-১৫ই আগস্টের ঘটনার প্রতিশোধমূলক উত্তেজনা ও আক্রমণের রংগমঞ্চ।

বাস থেকে যাত্রীরা নেমে পড়ল। এরপর এসকর্ট পুলিশ "জয়বাংলার" আসামী আমাদের ছ'জনকে নামাল। অমনি শতশত ক্ষুব্ধ জনতা আমাদেরকে ঘিরে ফেললো মৌচাকের আহত পোকার মত।

—ধর শ্যালারারে। পাকিস্তানের চর শ্যালারা।

—মার কিল-ঘুষি-লাথি।

—লাঠিটা কইরে, ল-ত (লওত)।

দুম্বুর, চটাস, ধুম-কত বিচিত্র সংগীতের সৃষ্টি হতে লাগল আমাদের দেহ-অংগ-প্রত্যংগের উপর। শিলাবৃষ্টি হচ্ছে আমাদের সযতনে লালিত দেহ-অবয়বে। এসকর্ট

www.pathagar.com

পুলিশ সাহেবেরা উন্মত্ত জনগণের ধাক্কা ও চাপে আমাদেরকে হাতছাড়া করে দুরে যেতে বাধ্য হল। অথবা একটু মজা করার খাতিরেই এমনটি ঘটাল। বিধাতা-ই এর বিচারক হবেন! বিধাতা সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।। কে একজন আমার সার্টের বুক পকেটটা চেপে ধরে মারল এক মুষ্টিযুদ্ধ ঘুষি। সটকে পড়লাম পাশের দোকানের কাঁচের বইয়মের উপর। কিন্তু রবিউল্যা ভাইয়ের সাথে হাত-কড়া বাঁধা বলে স্প্রীং এর মত পুণরায় উল্টে এসে পড়লাম তার কাছে। কোন ফাঁকে একটি লাথিও পড়ল কোমড় সোজা।

—হরির পো রা, ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট হিন্দুদেরকে তাড়িয়েছিস। কত হিন্দু মা-বোনের ইজ্জত লুটেছিস, কত লোককেই না হত্যা করেছিস। এবার সুযোগ এসেছে এর প্রতিশোধের। ধড়াসকরে চড় কষে দিল রবিউল্যা ভাইয়ের নিটোল গণ্ডদেশে। কনুই দিয়ে দিল গুঁতো তার বুকের পরে।

—নেরে, এবার হাত-পা'র একটু সুখ করে নে।

জনতা থেকে একজন বলে উঠলঃ এ'ত ভগবানের কৃপা।

সহস্রাধিক লোক জমে গেছে। সবারই মুখে কোরাস ধ্বনিঃ—মার শালারারে। শালারা পাইখ্যার (পাকিস্তানের) চর, জয়বাংলার দুষমন।

কতক্ষণ এই আক্রমণ চলেছিল তা সঠিক মনে নেই। তবে অনুমান আধ ঘণ্টা ত হবেই। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আগরতলার বীর বাংগালীরা ওদের হাত ও পায়ের সুখ মিটিয়েছে আমাদেরকে মেরে পিটে। রীতিমত খৈ ফোটা বাজারে কিল-ঘুষি। প্রায় নিশ্চিত ছিলামঃ আমাদের জীবনের যবনিকাপাত এই ফুটপাথে, জংশনে। এটাই বোধ হয় জয়বাংলার বিশ্বাসঘাতকদের বধ্যভূমি। ১৯৪৭ এর ১৪ আগস্টের পাকিস্তানবাদীদের গোরস্থান।

নির্যাতনে নব্যানন লাভ

আমার ভাগ্য অনেকটা ভাল। হীন-কৃশ মম দেহটা শাপে বর হয়েছে। রবিউল্যা ভাইয়ের সুঠাম বপুদেহখানি ঢাল হিসেবে প্রায়ই বাঁচিয়ে রেখেছে আমার বেচারা দেহটাকে ঐ নরপিশাচদের বেয়াড়া কিল-ঘুষি থেকে। বেচারা কাবুলীওয়ালাদের অবস্থা ত অবর্ণনীয়। "বুড়ো আদমী আব্বাজানের" বাম চোখের ভ্রূ ঘুষি ও দেয়ালের ঘসায় ছিলে ঝুলে গেছে। প্রবাহিত লাল চিকচিকে রক্তে বাম গণ্ডদেশ চুপসে গিয়ে প্লাস্টারের মত চট্ বেঁধেছে।

ওর অর্ধেক মুখমণ্ডলে কেযেন সিঁদুরের রং লেপটিয়ে দিয়েছে, আর বাকী অর্ধেক গোলাপী বরণ। "আব্বাজান" পূর্ব থেকেই খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। কিন্তু বটতলী এবার তার খোঁড়া পা'টি জন্মের মত অকেজো করে দিয়ে তাকে বিশ্রাম দান করল লাঠির উপর। অর্থোপেডিক হাসপাতালের স্থায়ী রুগী বানানো হল তাকে।

জানে আলম আর অন্য সবাই বেশ মার খেয়েছে। তবে ওদের মজবুত পেশী আর দেহের গড়ন ওদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে পংগুত্ব লাভের সৌজন্য থেকে। শুধু কপাল, গণ্ডদেশ আর ঠোঁটের এদিক সেদিকে দু-চারটে ছেঁছনী দাগের মত কতকগুলো চিহ্ন ফুটে উঠেছে সুস্পষ্টভাবে ওদের কাঁচা হলুদবরণ তনুর'পরে।

আমাদের সবার চোখ লাল টক্‌টকে জবা ফুলের মত হয়ে গিয়েছিল; অরঘুমো মাতালের মতো। এর কারণঃ আক্রমণকারীদের লক্ষ্যই ছিল চোখ-কান-দাঁত জখম

www.pathagar.com

করার। ওদের অধিকাংশ ঘুষি অব্যর্থভাবে আঘাত হেনেছিল বিধাতার নির্মিত এই বিশ্বাসঘাতকদের পাপিষ্ঠ মুখমণ্ডলে।

নিজের চেহারা দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, তবে সাথীদের চেহারায় আমার চেহারাটা আঁচ করা অসম্ভব ছিল না। রবিউল্যা ভাই থেকে শুরু করে সবারই ওষ্ঠ ফুলে পুষ্ট কমলা কোষের মত হয়ে গেছে। শুধু বেশকম এইটুকুই, রবিউল্যাহ্ ভাইয়ের নিম্ন ওষ্ঠটি ফুলেছে, জানে আলমের উপরের ওষ্ঠটি। পূর্বের থেকে চেনা না থাকলে ওদের পরিচয় আজ নতুন করে না-নিয়ে উপায় নেই। মানুষ মানুষকে মেরে এরূপ বিকৃত রূপও দিতে পারে? ওদের বিকৃতকৃত চেহারায় আমার মুখমণ্ডলটার নব্য নক্সা দিব্য-দৃষ্টিতে অবলোকন করলাম। কল্পনা করলাম এক বীভৎস আতংক।

দুম করে শেষ ঘুষি লাগে আমার কপালটায়। সংগে সংগে অনুভব করি-বটতলী ঘুরছে ত ঘুরছেই, চৈত্র সংক্রান্তির চড়কী মেলা বসেছে যেন বাস জংশনের হাটে। এরপর আর কয়টি কিল-ঘুষি চড়-চাপড় খেয়েছি তা বলতে পারি না। তবে এটুকু দিব্যি মনে আছে যে, প্রতিটি আঘাতেই বলে উঠেছিলাম "ইয়া আল্লাহ", "ইয়া আল্লাহ।" এটা কি কম কথা? কম রহমতের চিহ্ন? এরূপ মুসলিম-রক্ত পাগল উন্মত্ত জনতার নির্যাতনের প্রতিটি মুহূর্তে মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধুদের মায়ার পরশ কাটিয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করাটা সহজ নয় নিশ্চয়ই। একমাত্র সে-ই পরে যার প্রতি আল্লাহই হন একমাত্র মদদ্গার। এহেন পূত চিন্তায় একটা আত্মিক শক্তি অনুভব করলাম সমস্ত হৃদয় জুড়ে।

হঠাৎ জনতা ছত্র ভংগ হয়ে যেতে লাগল। অবাক হয়ে যাই। ব্যাপার কি? তিন তিনটে মিলিটারী লরী এসে দাঁড়াল। পঙ্গপালের মত সৈন্যসমূহ বেরুতে লাগল লরী থেকে। ওরা বেদম লাঠি চার্জ করে ক্রুদ্ধ জনতার থাবা থেকে মুক্ত করল আমাদের পলক-মুহূর্তে। ওরা জীপে তুলে পৌঁছিয়ে দিল আমাদেরকে কোর্ট হাজতে। জয়বাংলার বিরাগভাজন বাঙ্গালীদের ভাগ্য দশার এটিই প্রথম চিত্র যা' আগরতলার বাঙ্গালী বন্ধুরা একেঁছিল "বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার" পটদৃশ্য হিসাবে; ভিন্দেশের জয়বাংলার যুদ্ধমঞ্চে।

পানি নাই জল আছে

কোর্ট হাজত। বেশ উঁচু এর ছাদ। পাশে-দীঘে ২৫/৩০ হাত হবে। দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথ। এর স্বর্ণদ্বার আড়াই ইঞ্চি রড দিয়ে তৈরি। এর ঠিক বিপরীতে ৪/৫ হাত উঁচুতে একটা ছোট্ট জানালা। সহস্র উচ্ছৃংখল জনতার ভীড় ঠেলে এসে হঠাৎ হাজতখানাটা "বেহেস্তের" মতই ঠেকল! মুক্ত বিশ্বের আলো-হাওয়া প্রবেশ করছে ঐ জানালা দিয়ে। এর ভেতর পুলিশী নিয়ন্ত্রণ-অত্যাচার নেই। নেই রাজনৈতিকভাবে উস্কে দেয়া ক্রুদ্ধ জনতার আক্রোশ-আক্রমণ।

এমন একটি ঘরে এক মিনিটের বিশ্রাম যুগযুগান্তরের ক্লেদহারিণী!

স্বর্ণদ্বারের রডে ঠন করে আওয়াজ তুলে প্রবেশ করল এক টুকরো পাথর। চেতনায় ফিরে আসি। চোখ মেলে দেখি জনতার ভীড়। পীপড়ার মত সারি বেঁধে এসেছে আমাদের সাক্ষাৎ দর্শনে। রডের ফাঁক দিয়ে সবাই দেখে যায় এক নজর, মন্তব্য করে যায় কত ঢং-এর কত কথায়। সুযোগ পেলে ওরা নুড়ি-পাথর ছুঁড়ে মারে আমাদের মাথায়—গায়ে।

—ঐ রে, ঐ দু'টো বাংগালী। ওরা ঐ চারজন পাক-সৈন্যের চর ছিলরে। শ্যালারা এখন টের পাবে আগরতলার জেলখানা কি চিজ্!

www.pathagar.com

চার জন কাবুলীওয়ালা জয়বাংলা দরদীদের ধ্যানধারণায় চারজন পাকসৈন্য, আমি আর রবিউল্যা ভাই হচ্ছি ওদের চর।

প্রাইমারী স্কুলের ক্ষুদে শিক্ষার্থী হতে শুরু করে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও অফিস আদালতের সর্বস্তরের কর্মচারীরা আমাদেরকে দেখতে এসেছে। "আমরা সবাই" সদ্য আমদানীকৃত এক আজব জীব। এই-ই প্রথমবারের মত আগরতলার শহরবাসী তা দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে যেন।

—রাম, রাম, কি বিকট চেহারারে, এগুলো মানুষ না জানোয়ার!

—কি জানিরে ভাই, চোখগুলো দেখলেও ভীষণ ভয় হয়। ছাড়া পেলে যেন গিলে ফেল্‌বে। থুঃ!

বুকটান শাড়ী পরিহিতা দুটো ষোড়শী বয়সের মেয়ে বলাবলি করছিল। বাকশিল্প ও পোশাক-আশাকে মনে হচ্ছিল কলেজ পড়ুয়া। তাদের আনন ও বদন উৎকট উগ্রতায় সমৃদ্ধ। কেশবিন্যাস আর নাভী প্রদর্শনীয় শাড়ীর আঁচলের দোলায় তাদেরকে মনে হচ্ছিল রবি ঠাকুরের সাক্ষাত 'উর্বশী'।

—এই শালা, বাড়ী কই?

চেংরা বয়সের এক ছোঁড়া প্রশ্ন করছিল সবাইকে। উত্তর না পেয়ে সে ছুঁড়ে মারল একটা ঢিল। অমনি মাথা ফেটে ফিনকী দিয়ে রক্ত ছুটল জানে আলমের।

শান্ত্রী টের পেলঃ দর্শকবৃন্দ আনন্দের আতিশয্যে বেসামালভাবে কৌতুহলী হয়ে পড়েছে। কৌতুহলী ছেলেদের ব্যাঙ মারার কৌতুকের মত দর্শকবৃন্দ যেকোন মুহূর্তে জয়বাংলার দুষমনদের অপমৃত্যু ঘটিয়ে দিতে পারে। বিচারের আগে বিচারাধীন আসামী কোর্ট হাজতে এভাবে মারা পড়লে "শান্ত্রী" বেটার নসীবেও বজ্রপাত ঘটতে পারে। কাঁধের বাঁশী ফুঁকে জন ৮/১০ পুলিশ দিয়ে সে উৎসুক দর্শকদের দর্শন-নেত্রে পর্দা টেনে দিল। মনুষ্য জানোয়ারের প্রিয় "দর্শনশো"-এর পরসমাপ্তি ঘটল এমনিভাবে। প্রায় ৩ ঘণ্টার মত ছিল এ প্রদর্শনীর আয়ুষ্কাল।

সন্ধ্যা হয় হয়। কোর্টহাজত ইতিমধ্যে পুরাতন আসামী ও নূতন বন্দীতে গিজ গিজ হয়ে উঠল। হঠাৎ শান্ত্রী হেঁকে উঠলঃ

—"পাইখ্যার" দল উঠ্ উঠ্।

হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। গারদ খোলা হল। কোমড় বেঁধে হাজির করানো হল কোর্ট দারোগার কক্ষে।

—তোর নাম কি আলমগীর?

—জ্বী হাঁ।

— বাড়ী কই?

—আখাউড়ায়, দেবগ্রাম।

—নামটা কি বললি?

—আলমগীর।

—নাম ত খাসা রেখেছিস, কি অপরাধ করেছিস?

—আমি জানি না কি অপরাধে আমাকে ধরেছে।

—হারামজাদা, তুই জানিস না বুঝি? বলি কয়টা হিন্দু মেরেছিস?

—একটাও না। এ প্রশ্নই নাই আমাদের এলাকায়।

www.pathagar.com

—এখন না মেরেছচ, আগে রায়ট-টায়টের সময় কয়টা মেরেছিস শুনি?

বুঝলাম এত বাঘের ছাগল ছানা গিলবার ফন্দি। তুই পানি না ঘোলালেও তোর বাপ, না-হলে তোর দাদায় করেছে।

—জ্বী না, একজনও নয়। বরং পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন রায়টই আমাদের অঞ্চলে হয়নি। হওয়ার কোন উপক্রমও দেখা যায়নি। আমার স্কুলের হেড মাস্টার বাবু সতীশ চন্দ্র দেব। তিনি আমার শিক্ষক। আমি তার আদুরে ছাত্র। আমি তাঁরই অধীনে মাস্টারী করছি। সতীশ বাবু সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর আমাদের স্কুলে পরম সুখ ও শান্তিতে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব একটানা পালন করে আসছেন। সাম্প্রদায়িক দাংগা যে আমাদের এখানে হয়ই নাই—এটাই তার উত্তম প্রমাণ।

এক শ্বাসে বলে ফেললাম কথাগুলো। এজন্যে নিজেই অবাক হলাম! আমার এবক্তব্য পেশের সাহস ও সুযোগ নিয়ে দারোগা বাবুর অফিসও লোকে গিজ গিজ করছে। অফিসের বাইরে জানালা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টায় ডজন ডজন কৌতূহলী চোখ।

—কথা ত শুনে মনে হয় লেখাপড়ায় মন্দ না। প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করিস?

— হাই স্কুলে।

—পড়াশুনা কতটুকু?

—এম.এ, বি,এড।

—হুম্ তোমার ডেজিগনেশন কি?

—এসিসটেন্ট হেডমাস্টার।

—তোমার জামা নাই?

—না।

—শুধু গেঞ্জী গায়েই কি তোমাকে মুক্তিরা এরেস্ট করেছে?

—জ্বী না। সার্ট গায়ে ছিল। বটতলীর উন্মত্ত জনতা সার্ট ছিড়ে টুকরো করে ফেলেছে।

খুব পানি পিপাসা পেয়েছিল। বটতলীতে মার খেয়ে বুকের ছাতি শুকনো পাতার মত হাল্কা মনে হচ্ছিল। দারোগা বাবুর টেবিলের উপর শূন্য কাঁচের গ্লাসটি এ' তৃষ্ণা যেন আরও বাড়িয়ে তোলল। বিনয় সহকারে বললামঃ

—আমায় একটু পানি খেতে দেবেন?

দারোগা বাবু চারচোখে কটমটিয়ে তাকালেন আমার দিকে। তার দৃষ্টি যেন বলছিলঃ এত বড় স্পর্ধা নরাধমটার, কাঁচের গ্লাসে পানিও খেতে চায় আবার! শাস্ত্রী ইত্যবসরে বলে উঠলঃ আরে হারামজাদা, এখন জল খেলে ত মরবি, আরও পরে খাইস। তবু সংবরণ করতে পারলাম না নিজেকে। আবার অনুরোধ করিঃ

—একটু পানি দেন না স্যার, বুক যে শুকিয়ে রয়েছে।

—"পানি" নাই, "জল" আছে। জল খেলে দিতে পারি।

জলদগম্ভীর স্বরে দারোগা বাবু বল্লেন।

—জলই খাব স্যার।

কাঁচের গ্লাসে জল খেলাম। আহ, জলের কত দাম, কত স্বাদ এর! সাধে কি বলে জলের অপর নাম জীবন! ভগবান ওদের মংগল করুন। ওরা 'এজিদের' মত নিষ্ঠুর নয়। মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম এহেন বদান্যতার জন্যে।

www.pathagar.com

হেট্ দি সিন্ বাট নট্ দ্যা সিনারস্

সন্ধ্যা ৭ টায় দারোগা বাবু আমাদের ছ'জনার 'বায়োডাটা" লিপিবদ্ধ করেন। ইতিমধ্যে কয়েদীদের লাল "ভ্যান"ও এসে দাঁড়িয়েছে কোর্ট দারোগা বাবুর অফিসের পেছনে। এর অভিজাত বিশেষ্য হচ্ছে প্রিজনার্স ভ্যান।

এক, দু, তিন, চার করে সতর জন আসামী গুণে গুণে ঢোকান হল ভ্যানে। চকবাজারের ইলিশ মাছ গুণতির মত সুর সিপাইটির। পণ্য দ্রব্যের মত ঢোকান হল আমাদেরকে। হেডলাইট জালিয়ে ভ্যানটি গতি নিল আগরতলার জেলখানা অভিমুখে।

বাস নয়, ভ্যান হওয়ায় এতে জানালা নেই। ভেন্টিলেশনের জন্যে উপর দিকে ছাদ সংলগ্ন রয়েছে প্রায় এক হাত প্রস্থ মোটা তারের জালি আঁটা ঘেরাও। দাঁড়িয়ে শহর দেখা যায়।

কি বিচিত্র আগরতলা শহর। এঁকেবেঁকে সরীসৃপের গতিতে পিছঢালা পথ চলেছে; কে জানে কোনটা কোন দিকে। আলোয় জ্বল জ্বল করছে দোকানপাটসমূহ। কি আশ্চর্য! প্রায় সব দোকানেই পাকিস্তানী জিনিসপত্রের বিপুল সমাবেশ। খেলনা-পুতুল, লুংগী-শাড়ী-চিরুনী ইত্যাদি সব কিছুই লোভনীয়ভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এ সবই আমাদের দেশের মালপত্তর। শরণার্থী দোকানদাররা অথবা লুটেরারদল লুট করে এসব জিনিসপত্র বিক্রী করে দিয়েছে আগরতলার ব্যবসায়ীদের হাতে। টাকার বাটা বা বিনিময়ও মন্দ নয়। ব্লাকে পাকিস্তানী ১ টাকা = হিন্দুস্থানী ১.৫ টাকা হতে ২ টাকা পরিমাণ। সুতরাং পাকিস্তানী দ্রব্যের মান প্রায় দ্বিগুণ। সওদায় প্রায় ডবল লাভ। অতএব পূর্ব পাকিস্তানী বাংগালীরা কেন এই সুযোগ হাতছাড়া করবে? পান-বিড়ি-সিগারেট, বিশেষ করে স্টার সিগারেট, আগরতলার সিপাই ও কয়েদী সরদারদের মুখে, পকেটে শোভা পাচ্ছে চমৎকার! সান্ত্বনা পেলামঃ মন্দ কি, আমায় দেশ ছাড়া করলেও আগরতলা আমার অচিন প্রবাস নয়। আমার দেশের সওদায় আগরতলা ত আজ ঢাকার নিউমার্কেট বা গুলিস্তানেরই দ্বিতীয় সংস্করণ! শুধু কি তাই?

পথ-ঘাটও ত পূর্ব পাকিস্তানের রিক্সা-গাড়ী-ঘোড়া, জীপ, ট্রাক, লরীতে ভরে গেছে। এর অধিকাংশই চালাচ্ছে দেশী বাংগালী ভাইয়েরা। যাত্রী অধিকাংশও দেশেরই মনে হয়। হয়ত আখাউড়া, সিংগারবলী বা কস্‌বা অঞ্চলের লোক এসব। সুতরাং দুর্ভাবনার কিছু নেই। গোটা আগরতলাই এখন আমার Native country. আমি আছি লাল গাড়ীতে, ওরা আছে দোকানে, রাস্তায়, গলীতে। তফাৎ শুধু এটুকুই ত!

আগরতলা সেন্ট্রাল জেলের গেইটে দাঁড়াল ভ্যানটি। এক-দুই-তিন-চার করে নামতে লাগল নবাগত অতিথি আর আসামীবৃন্দ। সবার শেষে আমি নামলাম। বিরাট লোহার গেইটের অন্তর্ভুক্ত ছোট গেইটটির ডানা খুলে গেল। মাথা গলিয়ে ঢুকলাম ভেতরে। দেহ তল্লাসী চল্‌ল সবার। মুখ-কান-চোখ-বুক-পিঠ-কোমড়-জুতার তলা পর্যন্ত চেক করল মোচ্‌ধারী এক শান্ত্রী। এরপর জেল কম্পাউন্ড। সামনে শোভা পাচ্ছে হরিজনের নেতা মহাত্মা গান্ধীর আবক্ষ মর্মর শ্বেতপ্রস্তর মূর্তি। এর গোড়ায় লেখা রয়েছেঃ HATE THE SIN BUT NOT THE SINNERS. "স্বাগতম" জানানোর মত মনে হল এ বাণীটিকে।

বেশ আনন্দ লাগল। পাপী নয় বরং পাপকেইত ঘৃণা করতেন মহাপুরুষ সম্প্রদায়। এটিই যদি জেলখানার মূলমন্ত্র হয়, তাহলে আগরতলা জেল নিঃসন্দেহে আরামেরই হবে। নৈতিকতা উন্নয়নের হাসপাতালই হচ্ছে এ বন্দীশালা। এক বুক সাহস সঞ্চিত হল।

www.pathagar.com

বোনাফাইড বন্দী হলাম

আমরা পৌঁছলাম আর একটি গেইটে। এটি সেকেন্ড গেইট। এখানে নতুন আসামীদের এন্ট্রি হয়, পুরাতনদের হাজিরা চেক।

খোদ জেলার অথবা সহকারী জেলার এখানে ডিউটি করেন চূড়ান্ত তল্লাশী তদারকের জন্য। কাবুলীওয়ালা চারজনের দেহ তল্লাশী ও বাড়ী-ঘর-দোরের ঠিকানা লিখা-জোখার পর তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হল। জেইলর শ্রী মধুসুধন চক্রবর্ত্তী সত্যিই তিনি "শ্রী", অন্তত বাহ্যার্থে। উজ্জ্বল শ্রী তনুবিশিষ্ট দীর্ঘকায় অফিসার। মনে হয় আর্য বংশীয়। স্বাস্থ্যটা একটি আদর্শ মডেল স্বরূপ। খাকী পোশাক আর নাইটক্যাপে তাকে খাসা ইউরোপীয় দেখাচ্ছিল।

—কি নাম তোমার? মিষ্টি কণ্ঠে তিনি শুধালেন।

নাম বল্লাম। ধাম বল্লাম। পেশাও।

ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর পুনরায় প্রশ্ন করলেন ঃ

—তোমার বাড়ী তাহলে দেবগ্রামেই? তুমি "মাবু"কে চিন?

—জ্বী হ্যাঁ। তিনি আমার ফুফাত ভাই ও ভগ্নীপতি।

—এখন সে কি করে?

—বিজনেস।

—কোথায়?

—ঢাকায়। আপনি মাবু ভাইকে কেমন করে জানেন?

—আমরা ক্লাসমেইট ছিলাম। দেবগ্রাম স্কুলে একই সাথে পড়তাম। আমাদের বাড়ী ত "নয়াদীল"।

মধূ বাবুর দিলখোলা কথাবার্তায় হৃদ্যতা অনুভব করলাম। একটু সাহসও এল মনে এই ভেবে যে এখন নিশ্চিয়ই তিনি একটু অনুকম্পা দেখাবেন আমার প্রতি।

—আচ্ছা স্যার, আমি কি একটা সরকারী জামা পেতে পারি?

—না, বিদেশী বন্দীদের জন্যে এরূপ কোন ব্যবস্থা নেই।

—তবে শিক্ষিত লোক হিসেবে কি কোন ক্লাস...

—না, তা-ও হবে না। পাকিস্তানীদের জন্যে কোন ক্লাস জেলখানায় নাই। আইনের অপারগতা জানালেন তিনি।

পরে রবিউল্যা ভাইকেও এমনি তরো প্রশ্ন করার পর মধু বাবু আমাদের উভয়কে মূল জেল-কম্পউন্ডে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

আগরতলার জেলখানায় বর্গাকৃতির বিরাট বাঁধাই খাতায় আমার এবং রবিউল্যা ভাইয়ের নাম উঠে গেল। আজ থেকে আমরা হিন্দুস্তান সরকারের "বোনাফাইড" বন্দী। মহামতী ইন্দিরা দেবীর সরকার এখন থেকে আমাদের শাসক ও প্রতিপালক। মন্দ নয়, স্বজাতির শাসনের নাগপাশ মুক্ত হয়ে আজ বংগালী হিন্দু ভাইদের শাসক গোষ্ঠির প্রশাসনিক স্বাদ ভোগ করতে যাচ্ছি। আর যাই হোক, এতে একটানা পাকিস্তানী জীবনটায় বৈচিত্র তথা চাট্‌নীর মজাটা ত পাওয়া যাবে?

www.pathagar.com

স্বাগতমে মহেন্দ্র দা

সেকেন্ড গেইটের ভেতরমুখী দরজা খোলা হল। রবিউল্যা ভাই ও আমি অন্যান্য কোর্ট হাজিরা আসামী ও কয়েদীদের সাথে ঢুকলাম কম্পাউন্ডে।

বেঁটে, গোলগাল হাত পা বিশিষ্ট একটি লোক আমাদেরকে সু-স্বাগত জানানোর জন্য পূর্ব থেকে প্রতিক্ষীত ছিল সেখানে। পরনে সাদা হাফ প্যান্ট ও সাদা হাফ সার্ট, কোমড়ে লাল চামড়ার চওড়া বেল্ট, মাথায় সাদা গান্ধী টুপী। বাদামী রং এর গোল চোখ, ভ্রূযুগল সরু ও পাতলা। হাতে একটা ব্যাটন বা রুলার। গায়ের রং ফিকেসাদা। বৃহদাকারের দাঁতের পাঁটি, শুভ্র ও সমান।

—হেই, ফাইল, ফাইল।

আসামী কয়েদী সবাই দুজন করে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল।

—পাইখ্যা কারারে? পাকিস্তান কার বাড়ী?

—আমাদের দুজনের।

রবিউল্যা ভাই জবাব দেয়।

শালারা তোরা দুইডা পাইখ্যার দল। গরু খাওঅইন্যা হুকুনের (শকুনের) দল? তোদের মধ্যে মাস্তর কে থা রে?

—আমি! ভীত সন্ত্রস্তভাবে জবাব দিলাম।

লোকটা আমার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করল অগ্নিঝরা নেত্রে।

—ছালা তোর কপাল থোঁতে কি অইছে রে? ফোলা কেন্‌রে ছ্যালা? কি বদমাইছী করছে?

—বটতলীতে পাবলিক আমাদেরকে মেরেছে খুব। এজন্যে ঠোঁট-কপাল ফুলে গেছে।

—শ্যালা, তুই বুঝি মাস্তারী করে? তোর নামে ফুন (টেলিফোন) অইছে একতু দেইখ্যা রাখনের লাইগ্যা। কিন্তু ছ্যালা, তোর ছরীর যা, একটা ছড় দিলেই ত তোর আর খবর পাওয়া যাইব না। সে হাতের রুলারটা ব্যবহার না করে শুধু খালি হাতে একটা চড় বাম গন্ডদেশে কষে মারল।

—ছ্যালা, তোরে খুব মারনের অর্দার অইছিলরে। ভাগ্য তোর বাল। একটা চড়ই শুধু এহন খাইলি।

মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করলামঃ লোকটির হাতটি যেন একটি চেপ্টা ইস্পাতের টুকরো। মায়ের পেট থেকে পড়ে এমন নিকষ চড় কখনও খেয়েছি কি না মনে পড়লো না। গোটা কম্পাউন্ডটা চরকীর মত ঘুরতে লাগল চড়ের মহিমায়। নিওন লাইটের থামগুলো সহস্র তারকার মত জ্বল জ্বল করছিল আমার দৃষ্টি পথে।

চটাস্ চটাস্ শব্দ শুরু হয়ে গেল আবার। ব্যাটনের আঘাত, লাথি, কিল আর চড়ের ধ্বনিতে 'সিম্ফনি' বিরচিত হল স্থানটিতে। নূতন আসামী আর রবিউল্যা ভাইকে আমন্ত্রণ জানানোর যন্ত্রসংগীত মঞ্চস্থ করল এ লোকটি এভাবে।

এদের সবার স্বাস্থ্য সুন্দর ও সবল। তাই অভ্যর্থনাকারী "স্বাস্থ্যই সম্পদের" পরীক্ষা করল তাদের দেহের উপর। শেখ সাদীর (র.) মত সান্ত্বনা পেলামঃ আল্লাহ যা করেন ভালর জন্যেই। আমার স্বাস্থ্যটা মোটা ও পুষ্ট হচ্ছে না বলে কত ক্ষোভ ছিল। আজ যদি রবিউল্যা ভাইয়ের মত স্বাস্থ্য হতো, তাহলে এই নির্যাতনও ত সইতে হতো আমাকে। শুধু স্বাস্থ্যই সম্পদ নয়, অনেক সময় স্বাস্থ্যহীনতাও আশীর্বাদ যে!

www.pathagar.com

অভ্যর্থনাকারীর নাম মহেন্দ্র দা। জাতে তীপ্‌রা। ভাল বাংলা বলতে পারে না। 'তুই' আর 'তুমি' দ্বারাই সে সম্বোধন করে সবাইকে। কর্ত্তা অনুযায়ী ক্রিয়া বসিয়ে কথা বলার ব্যাকরণজ্ঞান নেই। তাই সে বলে "তুমি আইছে"—এবং এ ধরনের অনেক কথা। সে "স" কে "ছ" এবং "ট" কে "ত" বলে।

সে ডাকাত। খুনী। নিজের স্ত্রীকে তিন টুকরো করেছে দা দিয়ে; পরপুরুষের সাথে তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল বলে। অসৎ স্ত্রীকে খুন করে চরিত্রবান মহেন্দ্রদা পুরস্কৃত হলেন খুনীর তমঘা পেয়ে।

চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে মহেন্দ্রদা-এর। যেদিন আগরতলার জেলে শুভপদার্পণ করেছিল সেদিন মহেন্দ্র দা' তের বছরের তেজস্বী যুবা। মহেন্দ্র দা' ১নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড মেট বা সর্দার। সেকেন্ড গেইটের নূতন অতিথিদেরকে আপ্যায়ন করার দায়িত্ব তারই উপর ন্যাস্ত। হাতের ব্যাটনটা দেখিয়ে মহেন্দ্র দা বলে ঃ

—দেখ্ ছ্যালা, এই তা আজ ১০ বছর আছে। দেখ্‌না রং তা এক্কেবারে ছাদা হইয়া ক্ষয় অইছে—তোদের মত মেমানদেরকে ছাগত জানাতে।

গুঁড়ো ইটের সরু রাস্তা। দুপাশে সারিবদ্ধ গুল্ম লতার সারি। এরই পাশে সবুজ মাঠ আর রংবেরং এর ফুলবাগান। এরপরেই এক নম্বর ওয়ার্ড। শান্ত্রী লোহার দরজা খুলে দেয়। মহেন্দ্রদা প্রত্যেককে তিনটে করে কম্বল, একটা থালা ও একটা বাটি দিয়ে বলে ঃ ধুক ধুক, ছ্যালা। এইডি তোরার ছম্বল। জেলখানার রুতির বড় ছাদ আছে রে। দেখবি দুদিনে তোগো শরীর কেমন ছুন্দর অইছে!

মহেন্দ্র দা চলে যায়। শান্ত্রী লোহার কপাট লাগিয়ে দেয় তিন তিনটে বড় তালা ঝুলিয়ে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাসপাতাল দর্শন

এখানে প্রথমেই আমাদের পরিচয় হয় কছিমদ্দির সাথে।

কছিমদ্দির আসল নাম কাছিম আলী। সম্ভবতঃ "কাসেম আলী" নামের বিকৃতি হবে। বাড়ী আগরতলার কাছেই; বিশাল ঘরে। মা-বাবা গরীব। গতর খেটে রুজি করে। ভাগ্য ভাল কছিমদ্দির। সে বিয়ে-থা করেনি। দুদিন উপোস থাকার পর ছাগল চুরি করেছিল দুমুঠো অন্নের জন্য। ছাগলসহ ধরা পড়েও কছিমদ্দি ৫৪ ধারার আসামী।

দুপুর বেলার খাওয়ার সময় কছিমদ্দি ও শংকর দা সম্বন্ধে আমি জেনে নেই সমর বর্মনের কাছ থেকে। সমর বর্মন ঝুনা লোক। জেলের আইন-কানুন তার নখ দর্পনে। তিনি আমার জেল জীবনের গাইড বুক্। ১৮ বছর জেল খেটেছেন।

দুপুরে খাওয়ার পূর্বে আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। প্রত্যেক নূতন আসামীকেই জেলে ঢোকার পরের দিন হাসপাতালে যেতে হয়। হাসপাতালটা ১নং ওয়ার্ডের সম্মুখে, মাঠের পূর্বপাশে। ডাক্তার বাবু, কম্পউন্ডার এবং একজন কয়েদী—এই তিনজন মিলেই ডাক্তার খানার এডমিনিস্ট্রেশন।

ডাক্তার বাবু একজন হেলথ ইন্সপেক্টারই বটে। কালো ছিপছিপে গড়ন। সাক্ষাৎ তালপাতার সেপাই। বয়স সত্তরের উর্ধ্বে। চশ্মা ব্যবহার করেন। গায়ের রং শ্যামলা কালো। পান আর চুরুট ফুঁকে দাঁতের ফাঁকে কলাই রং ধরেছেন। মেজাজ খিটখিটে, কড়া। আসামী হাজতীদের চিকিৎসা করে করে "রসিকতা" হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। লৌহ কপাটের মতই তার চেহারাটা। কথা বলার সময় মনে হয় ঠাস্ ঠাস্ পাকা মুলী বাঁশ ফাটানো আওয়াজ বেরুচ্ছে। ভেঙ্কী ও ভেংচী দিয়ে তিনি রুগীদের কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

—কি রে, তোর নাম কি?

আমাকে জিজ্ঞেস করেন ডাক্তার বাবু। পরিচয় জেনে বলে উঠেন তিনি ঃ হ, হ, বুঝেছি, তুই-ই সর্বনাশ করলি আমার। পাকিস্তানী বন্দীদের মধ্যে তুই-ই প্রথম এই জেলখানায় আইলিরে, হিন্দুস্থানের ডাল-ভাত শেষ করতে আইছিসরে।

এ সময় বিপিন বাবু কথা বলার চেষ্টা করছিল। বিপিন বাবু কম্পাউন্ডার।

—বিপিন, তোমার সাথে আমি কথা কইছিনা। তুমি তোমার কাজ করগে। মিক্সচারটা বানিয়ে দিয়েছ যতীনকে? ঐ দুটো টেবলেটও তাকে দিতে হবে।

বিপিন বাবুর চেহারাটা অন্ধকার হয়ে যায়। ডাক্তার বাবু ছক মাপা পথে হাসপাতালটা চালাতে চান। খাতিরজমা একআধটু কথা বলতে গেলেও বিরক্ত হয়ে যান তিনি। মানুষ কি শুধু কলের পুতুল? ওর মনটা কি মরে যায় জেলখানায় চাকুরী করে বলে?

—দুটো কথাই কইতে পারব না, ত এমন চাকুরী কেমনে করা যায় ডাক্তার বাবু?

—আবার তর্ক করছ বিপিন, এ ত ভাল নয়। কত বারণ করেছি যে ডিউটির সময় কোন ফালতুমি চলবে না। ফের যদি তর্ক কর তবে আমি জেলারের কাছে জানাবোঃ "হয় আমাকে বদলী করুন, না হয় বিপিনকে, এক জায়গায় দুই শার্দুল টিকে না"।

www.pathagar.com

চশমাটা একটু নীচে নামিয়ে তিনি ডাকলেন ঃ

—নরেশ, নরেশ্যা কইরে?

—আজ্ঞে বাবু আইতেছি।

—তার মুখে একটু জল দে ত। ঠোঁট ফুইল্যা গেছে। গায়ে ত জ্বরও দেখি! আর দেখরে নরেশ্যা, দুই ফোটা কালা মিকচারটা খাইয়াইয়া দিবি তারে।

নরেশ আমায় ঔষধ পত্র দিয়ে দেয়। কম্পাউন্ডার বাবু আর নরেশ মিলে আমার ওজনও নেয়। মাথা-চুল-হাত-পা তালাস করে আইডেনটিফিকেশন মার্ক খুঁজে বের করার ব্যর্থ প্রয়াস পায়। পরে একখানা কার্ড কম্পাউন্ডার বাবু দিয়ে বলেন ঃ

—তোমার নাম আলমগীর? ধর, এই কার্ডটা যত্নে রাইখিস। হারাইলে কিন্তু কেন্টিনে নিব, তখন বুঝবা জেলখানার মাইর কারে কয়। আর ধর এই টেবলেট কয়টা। সকাল বিকাল দুটো কইরা জল দিয়া খাইবা।

—কম্পাউন্ডার বাবু, আবার কখন ঔষধের জন্য আসব?

—বিকালের দিকে আইসআনে?

জেলীদের জন্য হাসপাতালও আছে? এ ত বিরাট এক রহমত দেখি। পাপীদের পাপ স্খালন হয় শাস্তিতে, আর রোগ সারান হয় ডাক্তার বাবুর কালা মিকচার আর ভেংচীতে, বিলক্ষণ!

ঔষধ আর কার্ডটা নিয়ে চলে আসি ওয়ার্ডে। আন্ডার ট্রায়েল প্রিজনার'স এর কার্ড এটা। নাম, ধাম, দেহের ওজন, সনাক্ত চিহ্ন, ইত্যাদি এতে লিপিবদ্ধ করা হয়। ধারায় উল্লেখ রয়েছে ঃ ৫৪ নং।

চান্ এর দৃশ্য

কিছুক্ষণ পর ১০টার ঘন্টি পরে। কয়েদী-হাজতীরা ওয়ার্ড থেকে ফাইল বেঁধে বেড়িয়ে আসে "চান" করার জন্যে। দুটো হাউজ ভর্ত্তি পানি নিয়ে ভীষণ কাড়াকাড়ি, ধ্বস্তাধ্বস্তি। বাটি আর বাসন নিয়ে লেগে যায় পিটাপিটি ওদের মধ্যে। শান্ত্রীদা এসে এলাপাথারি বেত মেরে ঝগড়ার দানা ভেংগে দেয়। কড়া নির্দেশ দেয় ঃ

—যা শ্যালারা, চান আর তোরার করণ লাগব না। সব "সি" ক্লাস তোরা। যা, বারান্দায় উঠ গিয়ে। [সি = C : Callous বুঝায়।]

সপাং সপাং কয়েক ঘা বসিয়ে দিল শন্ত্রীদা কয়েকজনের হাতে-পিঠে, উরু বগলে। অমনি হুর-হুর করে ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সব উঠে গিয়ে ওয়ার্ডের বিরাট বারান্দায়। মুখোমুখি দু-সারিতে বসে যায় সব, থালা-বাটি সামনে পেতে।

একপাল গরু-ছাগলের মত সবাইকে খেদিয়ে বসান হল। আমিও হুড়মুড়ি খেয়ে বসি তাদের সাথে। কারো কাপড় অর্ধেক ভিজা, কেহবা শুধু মাথায় পানি ঢেলেছিল, কেহ বা নেংটি পরেছিল চান করতে। কয়েকজনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দোষে সবাইকে আধা নাওয়া, অ-নাওয়া অবস্থায় ফিরতে হল। চৌবাচ্চার পানিও আজ সব শেষ হতে পারেনি. এস. টি. কোলরিজের মত ছন্দ জেগে উঠল হৃদয় রাজ্যে ঃ Water, water, every where; but not a single drop to take a bath.

হাসি পেল খু-উব। এটা ছিল ট্র্যাজিক হাসি। নিজেও আজ চান করতে পারিনি। ভালই হয়েছে। হয়ত চানের সুযোগ পেলে জ্বরটা বেড়ে যেত, গা হাত পা-এর ব্যথাও বোধ হয় আরও প্রবল হত। আফসোস নেই চান না করতে পারায়।

www.pathagar.com

চান-এর আর একটি দৃশ্য কোনদিন ভুলতে পারবো না। একে ত নির্দিষ্ট পরিমাণ পানির শংকা ও ভীতি, তার উপরে পরিধেয় বস্ত্রের প্রকট অভাব গোসলের দৃশ্যকে বড়ই মর্মন্তদ করে তোলে। কত হাজতী প্রায় বিবস্ত্র হয়ে পড়েছে পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে। কেহ কেহ বা জেলখানার কম্বল মুড়িয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকে রেখেছে। চানের সময় জন্ম নেয় এক বীভৎষ দৃশ্য।

নেংটি পড়ে কেহ চান সেরেছে। আবার কেহ গায়ের হাত কাটা গেঞ্জিটার দুই হাতায় দু' পা ঢুকিয়ে জাংইগার মত পরে মাথায় 'জল' ঢালছে থালা দিয়ে। যার পরিধেয় বস্ত্র কম্বল, সে চট্ রে একটু আড় হয়ে উলংগাবস্থায় চান সেরে ফেলেছে। কেহ বা অন্যের শুকনো বস্ত্র চুরি করে চান সেরে চুপি চুপি সরে পড়েছে। এ ধরনের ঘটনার জন্যে শাস্ত্রী বা কয়েদী সর্দার হয়ত বেদম পিটাচ্ছে এক নিরপরাধ আসামীকে। নিজেরও এহেন অবস্থা। গায়ের হাত কাটা গেঞ্জি, পরিধানের পুরাতন লুংগী আর প্লাস্টিকের সেন্ডেলই সম্বল। এই পোশাক দিয়ে অনিশ্চিত জীবন কাটাতে হবে সেখানে। জেলার বাবুর কাছে পোশাক চেয়ে পাইনি। কনভিক্টেড্ না হলে কাউকে কাজও দেয়া হয় না।, পোশাকও মিলে না। তাই বড্ড অসহায়ত্ব বোধ করলাম।

একে ত পূর্বপাকিস্তানী, প্রবাসী, তার উপর নিকৃষ্ট রাজবন্দী। আপন বলতে কেহ নেই এই জেলখানায়, এই দেশেও। বন্দীদের মধ্যে অনেকে বাহির থেকে পোশাক পরিচ্ছদ পেয়ে থাকে। ওদের আত্মীয় স্বজন বছরে দু'চারবার দু-একজোড়া জামা কাপড় পাঠায়। ফলমূলও দিয়ে যায় কখনও। এসব থেকে আমি বঞ্চিত। গোটা জেলে আমি বুঝি একটি মাত্র জীব-অনন্য, একাকী। হতভাগা ভাগ্য বিপর্যস্ত আদম ছুরত।

এমনিভাবে চান শেষ হয়। আমাদের ১নং ওয়ার্ডে।

লাঁঞ্চ

চান শেষে মধ্যাহ্ন ভোজ। দারুন ডিসিপ্লিন মেনে খেতে হয়। খাসা প্রটোকলের দৃশ্য এটি।

হেড কুক শংকর দা, তার এসিসটেন্ট নিতাই ও শুকুর নিরামিশ ও ডালের বালতী আর ভাতের টুকরী নিয়ে এল। শংকর দা এক বাটি করে ভাত পাতে পাতে দিচ্ছে। তারই পেছনে বাটি বাটি তরল ডাল আর শাকসব্জির নিরামিষ দিয়ে যাচ্ছে নিতাই চন্দ্র ও শুকুর মিয়া। ভাতের বাটিটার পরিমাণ এক পোয়া হবে। এক পোয়া ভাত প্রত্যেক হাজতী ও কয়েদীকে দেয়ার নির্দেশ আছে কর্তৃপক্ষের। কিন্তু শংকরদা এর মধ্যেও চালাকি করেছে। বাটির তলানীটা ভেতরের দিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ দাবিয়ে রেখেছে। ফলে এক পোয়া ভাতের পরিবর্তে ২ থেকে ৩ ছটাক পরিমাণ মাত্র ভাত ধরে বাটিতে। এভাবে প্রতি জনকে দু এক ছটাক করে ঠকিয়ে শংকরদা যে চালটুকু বাঁচিয়ে নিচ্ছে তা অদৃশ্য হাতের বদৌলতে বাইরে বিক্রী করে দু পয়সা কামাই হচ্ছে। কখনও বা জমাদ্দার বাবু এবং শাস্ত্রীদার নেক নজর বজায় রাখার জন্যে উদ্ধৃত্ত চাল-ডাল এমনি করে সঞ্চয় করে তাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয় শংকর দা। দুধ, ফলমূল, ডাল, তেল এমনকি লবণটুকুতে পর্যন্ত এ ধরনের হাত সাফাই করে শংকরদা একজন উঁচু দরের সর্দার হয়েছে জেলকর্তৃপক্ষের কাছে। ফলে তাগড়া দেহ ও জোয়ান জেলীদের দুর্দশা বেড়ে গেছে করুণভাবে। একে ত আধ পোয়া খাওয়া, তার মধ্যে এ থেকে আরও দু

www.pathagar.com

এক ছটাক কম। অসন্তোষের ভাব সদাই বিরাজমান থাকত কয়েদী-হাজতীদের মধ্যে। অর্থাৎ অপরাধীদেরকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব যারা পালন করতেন প্রকৃতপক্ষে তারাই যে হচ্ছে অধিকতর অপরাধী এর বিচার কে করে? বেড়া ঘাস খাচ্ছে প্রতিনিয়ত এ প্রমাণ করার নাই কি কেহ এ জগতটিতে?

প্রতি কয়েদী বা হাজতীর জন্য ইন্দিরা সরকার কর্তৃক আধ পোয়া ডাল, আধ পোয়া তরকারী ও আধ পোয়া পরিমাণ মাছ মাংস অথবা একটা ডিম বরাদ্দ করা হয় প্রতি বেলার খাওয়ার জন্যে। সপ্তাহে আধ পোয়া করে সরিষা তৈলও দেয়া হয় জেলীদের মাথায়-গায়ে ব্যবহারের জন্যে। কিন্তু হায় বিধি বাম! আধপোয়া থাক দূরের কথা, এক ফোটা তেল, পাতে দু একটির বেশী ডালের দানাও দৃষ্টি গোচরীভূত হয় না। হলুদ মিশানো গংগার জল আর দু'চারটে পঁচা মিষ্টি কুমড়োর আধ ইঞ্চি পরিসরের টুকরো অথবা এ পরিমাণ মাংস দিয়েই কয়েদী হাজতীদের লাঁঞ্চ পর্ব সমাধান করানো হয়। অবশ্যি যেদিন ডিমের পর্ব থাকে সেদিন ঈদের খুশী! কারণ ডিমটা ত আর ভেংগে সিকি পরিমাণ করা চলে না? প্রতি মংগল আর শনিবারে ডিম আসে আমাদের পাতে। তাই মংগল আর শনিবার হচ্ছে কয়েদী জীবনের 'ফিস্ট ডে'।

খেতে বসি সাথীদের সাথে। খাওয়ার সময় প্রতি লোকমায় কংকর, মরা ভাত, অথবা ধানের খোসার বিরক্তি জন্মে। কংকর আর ধান উকুন-বাছাই করে করে খাওয়ায় একটানা স্বাদে বিরক্তি আর বিস্বাদ ঘটে। দুঃখে অন্তর ফেটে যায়, চোখ দিয়ে পানি গড়ায় অজ্ঞাতে। ভাবিঃ এই বুঝি ছিল কপালে! পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে জন্মিয়ে লেখাপড়া শেষে অবশেষে আগরতলার সেন্ট্রাল জেলে এই খাদ্য গ্রহণের জন্যেই বুঝি আল্লাহ আমাকে দুনিয়ায় পাঠান? বৌ-ঝি, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, আমার ছাত্র-ছাত্রী-ওরা ত সবাই আজও জীবিত আছে। কত আরাম আয়াসে আমোদ স্ফুর্তিতেই না তাদের সাথে চলেছি, ফিরেছি। খাওয়াদাওয়ার কতইনা স্ট্যান্ডার্ড ছিল আমার। কিন্তু আজ একি হল? যারা আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে; ওরা কি লাভবান হলো আমায় হিন্দুস্থানের জেলের ডাল-ভাত খাওয়ায়ে? তাদেরকে কে এই আমনবিক অধিকার দিল, কিসের নেশায় ওরা এমন কাজ করল? সবই বুঝি গত বছরের "শবেবরাত" এর বরাদ্দ!

—এই পাইখ্যা, তাড়াতাড়ি খা। নইলে তোর ভাত ফালাইয়া দিমু। জেলের ভেতর ভাতের দাম আছে রে। একতা ভাত লোকছান করবি ত কেন্তিনে নিয়া থেক করমু তোরে।

মহেন্দ্রদার বেতের গুঁতোয় হুঁস হয়। সবাই খেয়ে সেড়েছে, অবশিষ্ট হিসেবে শুধু আমিই একাকী। নাকে-মুখে কোন রকমে ভাত গুঁজে প্রমাণ করলাম; ভাতের দাম আমিও দিতে জানি বুঝলে মহেন্দ্র দা!

মহাত্মাজীর বাণীর সারমর্ম HATE THE SIN BUT NOT THE SINNERS এর মর্ম অনুধাবন করলাম হাড়ে হাড়ে। এটা জিহ্বার নিছক প্রসাধনী। প্রকৃত অর্থে জেলের দর্শন হচ্ছে ঠিক উল্টো ঃ HATE THE SINNERS BUT NOT THE SIN. নইলে জেলখানার সার্থকতা কোথায়?

মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ।

আবার হাউজে ভীড় জমল। ঠেলাঠেলির দৃশ্য। শান্ত্রীদার খবরদারী প্রকট।

www.pathagar.com

বিড়ির মহিমা

প্রত্যেকেই নিজ নিজ থালা-বাটি ধুয়ে বাটি ভরে খাবার পানি নিয়ে ঢুকেছি ওয়ার্ডে। এরপরই শুরু হল বিড়ি জ্বালানোর পালা। বড়ই চমৎকার এ দৃশ্যটি।

বিড়ি জেলখানার কারেন্সী। 'লাইফ এন্ড টাইম' উভয়টা দিব্যি কাটানো যায় বিড়ির চাক্‌তিতে। প্রত্যেক বিড়ির মালিক দস্তুরমত জেলখানার একজন লর্ড। তার সম্মান ও কদর এত বেশী যে দেবতারও বোধ হয় লজ্জায় কান গরম হয়ে যায়।

রথিন তার কানের ভাঁজে গোঁজান বিড়িটি খুলে একটি উল্টো "ফু" দিয়ে সঠিকভাবে মুখে লাগাল। আর অমনি মাছির মত ভন্ ভন্ করে ১০/১২ জন জড় হয়ে গেল তার চারিদিকে। সৌরজগতের গ্রহরাজির মধ্যমনি সূর্যের মত অধিষ্ঠিত রথিন দা'।

—দাদা, একটু আগুন দেন না?

—খাইছছ? একটু দম-অ নিলিনা। লগে লগেই বিড়ি না ধরাইলে মরবি বইলা মনে অয়রে! শান্ত্রীদা পকেট থেকে ম্যাচলাইটটা বের করে কালো চাক্‌তিতে বৃদ্ধাংগুলি চেপে আগুন জ্বালায়। রথিন রডের ফাঁকা দিয়ে মুখটা একটু বের করে জ্বালিয়ে নেয় বিড়িটা।

—ঐ রে, ঐ আগুন দেহা যায়। অন্য এক হাজতী নম্বরের (ওয়ার্ডের) মধ্যে উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে সোনারাম, বেচু, গেঁদা লাইন ধরে রথিনের বিড়ি থেকে নিজেদের বিড়ি জ্বালিয়ে নেয়। দু-তিন মিনিটেই গোটা নম্বরটা ধুয়া আর ধুয়ায় ক্যামফ্লেজড হয়ে পড়ে। অগুণতি আগুনের লুক্কার মত বিড়ির মাথার আগুন দৃষ্টিগোচর হয় হাজতীকয়েদীদের মুখে-মুখে। ১নং ওয়ার্ডে দীপালী উৎসব যেন, অথবা লাল আগুনের আতস বাজির মেলা!

চাকতির মত গোল-গোল বৈঠক বসে গেছে এদিক সেদিক। রথিনকে কেন্দ্র করে বসেছে এমনিভাবে কয়েকজন। রথিন বিড়ি ফুঁকছে। আর অন্যেরা তীর্থের কাকের মত চেয়ে আছে তার মুখপানে।

—ছালারা, তোগো লইগ্যা একবারও একটা বিড়ি পুরা খাইতে পারি না। "সি" কেলাসের মত বইয়্যা রইছছ।

—দাদা, আইজক্যাও পা টিপা দিমু তোমারে, রুটি দেমু অর্ধেকটা। বিড়িডা দাওনা, একটা টানদি। কয়েদী সুরেশ বিনম্রভাবে বলে রথিনকে। রথিন লম্বা একটা টান দিয়ে দুই তৃতীয়াংশ খতম করে বিড়িটার। বাকীটুকু দেয় সুরেশকে।

—ধর শালা, গা যদি টিপা না দেছ ত দেহিছ আর কোন দিন নি বিড়ি চাছ? এবার সুরেশ মহারাজ। রথিনের মত সুরেশেকেও অনুনয় বিনয় জানায় অন্যেরা। সুরেশ "শুকার" অংশটুকু খেয়ে শুধু খোলটুকু ছুঁড়ে দেয় অন্যদেরকে। কি ধ্বস্তা ধ্বস্তি ঐটুকু খোলের জন্য। যে অংশীদার হতে পারল না, সে আবার অন্য বৈঠকে গিয়ে বসে চান্সের আশায়।

কেন্টিনের কাহিনী

—রবিউল্যা, রবিউল্যা কে রে?

জামাদার বাবু লম্বা লম্বা করে হাঁক দিতে থাকে। অমনি রবিউল্যা ভাই হন্তদন্ত হয়ে ওয়ার্ডের গেইটে দাঁড়ায়। বলে ঃ

—স্যার, আমার নাম রবিউল্যা।

—পাকিস্তানী তুই?

www.pathagar.com

—হ্য সার।

—তা হলে ঠিকই আছে। তোর সাথে আর একটা মাস্টারও ধরা পড়েছে না?

—হ্যঁ স্যার।

—হে কোন নম্বরে?

—একই নম্বরে আছি স্যার।

—আয় শ্যালা, তাড়াতাড়ি বাইরে আয়। সুরেশ্যা, তালা খুইল্যা দে। সা'বেরে কেন্টিনে লইয়া যাই।

—রবিউল্যাহ ভাই বেরিয়ে যায়।

—দৌড় দে শ্যালা, এক দৌড়ে কেন্টিনে যা।

রবিউল্যা ভাই দৌড়ে। মোটা মানুষ, বড্ড কষ্ট হচ্ছিল তার।

"বাবারে, মা-রে, মাপ চাই বাবু..."

"অ-মাগ্‌গো,...আল্লারে, ইয়া আল্লা...দাদা পায়ে পড়ি" ১৫/২০ মিনিট এ ধরনের চীৎকার ১ নং ওয়ার্ডে ভেসে আসছিল। ওয়ার্ডের সব কয়েদী-হাজতী রডের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছিল কেন্টিনের দৃশ্য। শান্ত্রী সুরেশ দা এক ধমক দিয়ে সবাইকে সরিয়ে দিল জানালা থেকে।

বিশ পঁচিশ মিনিট পর তালা খোলার শব্দ হল। সুরেশদা গেইট খুলেছে। রবিউল্যাহ ভাই ফিরে এসেছে। চোখ-মুখ ফোলা। হাতে বেতের দাগ। চুল এলোমেলো। সার্ট কুঁচকানো। মাতালের মত টলতে টলতে রবিউল্যা ভাই নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কে একজন কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল তার দেহ। বলল ঃ নে, কম্বলটা গায়ে রাখ। তবেই আর বাতে ধরবো না, গা-হাত-পা'র ব্যথাও থাকবো না। কম্বল ত একটা বিরাট ওষুধ রে!

বিকালের দিকে রবিউল্যা ভাই কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কম্বলের মুড়িতে তার মাথা-গা-হাত-পা'র ব্যথাটাও অনেক কমেছিল। রবিউল্যা ভাইয়ের নিকট গিয়ে বসলাম ঃ

—রবিউল্যা ভাই, এখন কি রকম বোধ হচ্ছে?

—অমাগো, কোমড়ে ব্যথা, মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। আমি বেশী দিন বাঁচবোনা আলম, বেশিদিন বাঁচবো না রে। তোমার কথাও জমাদার বাবু জিজ্ঞাসা করেছে, একটু সাবধানে থাক। রবিউল্যাহ ভাই যন্ত্রণায় কাতর স্বরে কথাগুলো বললেন। ভয় পেয়ে যাই। শুধোই ঃ

—রবিউল্যা ভাই, কেন্টিনে তোমাকে নিয়ে খু-উব মেরেছে?

—হ্যাঁ, ২০/২৫ মিনিটের মত শুধু চড়-থাপ্পর-কিল-ঘুষি আর লাথি। ওরা চারজন ছিল সেখানে, কেন্টিনের হলের চার দেয়াল ঘেঁষে।

—তারপর? আমার আত্মা যেন বেরিয়ে যেতে চায় এক্ষুনি।

—আমাকে জমাদার বাবু কেন্টিনের দরজার কাছে নিয়েই এক লাথি মেরে ঘরে ঢুকায়। আর অমনি একজন বেত দিয়ে প্রহার করতে করতে তার বিপরীতে দ্বিতীয় জনের নিকট পৌঁছায়। এই দ্বিতীয়জন শুধু খালি হাতে কিল-চর মারতে থাকে আমাকে নাকে-মুখে, বুকে, পিঠে। মাটিতে পরে যাই। তৃতীয় ও চতুর্থ জন আমাকে চুল ধরে

www.pathagar.com

টেনে দাঁড় করিয়ে হাঁটাতে থাকে। আর মাঝে মাঝে বুট দিয়ে গুঁতা দেয় আমার পাছা ও কোমড়ে। তারপর আবার প্রথমবারের মত মারতে থাকে, মাটিতে পরে যাই, আমাকে আবার হাটায়, আবার মারে।

যেপর্যন্ত না ওরা সবাই মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সেপর্যন্ত এরা আমাকে মারার ক্ষেত্রে কোন বিশ্রাম নিল না।

—কি জন্যে আমাকেও তারা এভাবে মারবে?

—তা জানি কেমনে? তবে নিশ্চয়ই বাহির থেকে কেহ মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছে আমাদের নামে, মানুষ মেরেছি বা হিন্দু বিদ্বেষী আমরা এই বলে।

—এর কি তদন্ত হবে না, সত্য মিথ্যা যাচাই হবে না?

—জেলে ঢুকেছ, আবার তদন্ত চাও? জাননা এটা হিন্দুস্তানের জেল, আর আমরা হলাম পাকিস্তানী। এমনিতেই আমরা ওদের শত্রু। শান্ত্রীর জুতোর আওয়াজ শুনা মাত্রই আমরা কথা বন্ধ করে দিলাম।

ভাল আছ ত?

বিকাল বেলায় ওয়ার্ডের আবহাওয়াটা থম্‌থমে্‌ভাব ধরে। সমস্ত কয়েদী-হাজতীর জীবনস্পন্দন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। ফিসফাস করে একে অপরের সাথে কথা বলছে। বিকাল ৫টায় ওয়ার্ডের বারান্দায় নৈশ ভোজের পর্ব শেষ হয় প্রত্যেকের ৫টা রুটি এক বাটি ডাল আর এক চামচ নিরামিষ তরকারী দিয়ে। খুব কড়াকড়ি পরিবেশে সবাইকে খাওয়ার পর্ব সমাধা করতে হয়। দুজন শান্ত্রী আর জামাদার বাবু প্রত্যেক হাজতী ও কয়েদীর খাওয়ার তল্লাশী করেন অভিনিবেশ সহকারে। বিশেষ করে আমাকে দেখিয়ে জমাদার বাবু বলেন ঃ

—হুঁ শ্যালা, আর তুমি বাকী রইছ। জামাদার বাবু একজন কয়েদীর প্রতি চোখ টিপে কি যেন ইশারায় বললেনও। টের পেলাম আমার সাজা ঘনিয়ে আসছে। ভয়ে বুক দুরু-দুরু করতে লাগল। খাওয়া শেষে ওয়ার্ডে ঢুকলাম। দেখলাম স্ব-স্ব স্থানে গিয়ে যার যেমনটি ইচ্ছা হল তেমনিভাবে কাত-চিত-উপর হয়ে শুয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই 'কনভালেন্সের' চার্লস ল্যাম্বের মত স্ব-স্ব শয্যার ডিক্‌টেটর।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ১নং ওয়ার্ডের মূমূর্ষ বাল্বগুলো জ্বলে উঠেছে। বাইরের কম্পাউন্ডের নিওন বাতিগুলো ঠাঠা করছে। একটু বাতাস নেই। নানা রং-এর ফুল গাছগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে। ওয়ার্ডের ভিতর বড্ড গরম। সবাই ছট-ফট করছে তীব্র উষ্ণতায়।

কিছুক্ষণ পর বিরাট গোঁফ ওয়ালা এক কয়েদী আমার বিছানার পাশে এসে বসল। মুখে তার বিড়ি। মিশকালো গায়ের রং। যুব বয়সের। চোখ একটা ট্যারা। চেহারার দিকে তাকালে মনে হয আস্ত একটা "ভিলেইন"।

—কী নাম তোমার?

—আলমগীর।

—তুমি কি কর?

—মাস্টারী।

—ভাল আছ ত?

www.pathagar.com

জবাব কি দেব ভেবে পাই না। হতবাক হয়ে যাই। শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসি। চোখ-মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে এক অজানা আশংকায়।

—হারামজাদা কোথাকার। জয় বাংলার দুষমন। পাঞ্জাবীর স্পই শ্যালা। এই কথাগুলো বলেই রহমান এক কিল বসিয়ে দেয় আমার পিঠে। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে চীৎকার দিয়ে উঠি ঃ —হায় আল্লাহ!

অমনি আর একটি ঘুষি গর্দানে কষে মারে সে। বলে উঠে ঃ শ্যালা, আল্লাহ থাকলে কি তুই জেলে আইতি? শ্যালা পাপ করছছ তুই, আল্লারে কোন মুখে ডাকছ? চুপ্ চুপ্। নইলে হাড্ডি গুড়া কইরা নুন কইর‍্যা ফেলুম। চুপ হয়ে যাই।

জেলখানায় পিটানোর সময় কান্নাটা বিরাট অপরাধ। এতে জেলের নিখুঁত শান্তি ও কঠোর শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। সে একটি শীষ দেয়। সংগে সগে ১০/১২ জন কয়েদী এসে আমায় ভীমরুলের মত ঘিরে ফেলে। এ প্লানটি পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত ছিল। মনে মনে কলেমা শাহাদাত আওড়ানোর চেষ্টা করতে থাকি।

—এই বেটারা, কি হইছেরে এখানে। 'হায় আল্লাহ' কইয়্যা কাইন্দা উঠছে কেডারে? আর একজন গোঁফ ওয়ালা কয়েদী অকুস্থলে উপস্থিত হয়। হাতে তার সুরু বেত। কী হইছেরে রহমাইন্যা। এখন আবার কারে মারতে ধরছছ?

—না, মারব কারে। এমনি ই না মাস্টারের কাছে আইছি। হে (সে) জয় বাংলার লোক। আমাগো দেশের লোক। দেশের খবর লইতে আইছি।

গোঁফওয়ালা রহমান জবাব দেয় সুন্দরভাবে। একেবারে সোনার মানুষ।

—রহমাইন্যা, মানুষেরে মাইরামাইরা তোর বদ নিশা হইয়া গেছে। তুই জানস না, আমার ওয়ার্ডের কোন লোকেরে মারতে হইলে আমি সিরাজের হুকুম নেওন লাগে? ওই যে মানুটারে মারছচ, হে কি তোর মত গরু চোর, না ডাকাত, না বদমাইস? মানুষের চেহারা দেখলেই ত কওন যায় কে কিরহম? হের চেহারায় কয়, হে বালা মাইনষের ফুত (ছেলে), ভাগ্য দোষে না আজ বন্দী অইছেরে। উঠ্ রহমাইন্যা উঠ্। তোরা সব যা। আর কেহ যদি কোন সময় তার উপরে হাত তোলছছ তো এই বেত দিয়া তোরার গায়ের ছাল তুইল্যা ফেলুম, বুজঝছ?

সুবোধ ছেলের মত রহমান ও তার সংগীরা আমার শয্যা স্থান ত্যাগ করে। অঝোরে কেঁদে ফেলি মায়ার পরশে। —সিরাজ ভাই...কান্নায় আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে যায়। সিরাজ ভাই বলে উঠে ঃ নে, নে এখন ঘুমা। তোরে আর কেউ কোন কিছু কইব না আমি সিরাজ ওয়ার্ডে থাকেত। কিছুক্ষণ পরেই শান্তী হেঁকে ওঠে ঃ

—এট্যানসান। জেইলার বাবু আইয়্যে।

শান্ত্রীর বুট আর কণ্ঠের কোরাস আওয়াজে ১নং ওয়ার্ড চকিত হয়ে ওঠে। সিরাজ ভাইও চীৎকার দিয়ে ওঠে ঃ ফ-আ-আ-ইল। দুড়মুড় করে ওয়ার্ডের সবাই সটান দাঁড়িয়ে যায় নমস্কার ভংগীতে, জেইলার বাবুকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। জেইলার বাবু ও শান্ত্রী ১নং ওয়ার্ডের নীরবতাকে জুতো দিয়ে পিষে বারান্দা অতিক্রম করে যান। লোহার রডের জানালার কাছে আমাকে দেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ

—বাংলাদেশের মাস্টার কোথায়?

—জ্বী, এই ত আমি। অপ্রস্তুত স্বরে জবাব দেই।

—তোমার বেড্ কোনটা?

www.pathagar.com

—এই টা। বেড্‌টি দেখিয়ে দেই। তারপর জেইলার চলে যান। তার জুতোর মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ রাত্রির নীরবতায় ধীরে ধীরে মিশে গেল।

—এক, দুই, তিন,...ছিচল্লিশ। ব্রেক আপ। সিরাজ ভাইয়ের গুণতি শেষ হয়। বন্দীরা সবাই গলা খাকানী, নাক ঝাড়া, পেশাব-পায়খানার দিনান্ত কর্ম চুকিয়ে কালো কম্বলে দেহ মুড়ে বিশ্রামের নীড় নেয় নিঃসীম রাতের কোলে।

অনিল-অজিতের কাণ্ড

রাত দুটোর দিকে এক কাণ্ড ঘটল। ওয়ার্ডের সবাই ঘুম থেকে উঠে বমি করার উদ্বেগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। অনিল পাগলটার কাণ্ড। সে বাহ্যি করে দু হাত দিয়ে ধরে ওয়ার্ডের দেয়ালে বিক্ষিপ্তভাবে লেপে দিয়েছে। "হি'হি" করে হেসে সে আটখানা। তার পায়খানার দূর্গন্ধ আর হাসির "হি-হি" তানে নিদ্রাদেবী পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে ১নং ওয়ার্ড থেকে। —ছি, ছি, থু-থু, অগ্‌-ওয়াক, রাম-রাম, ধ্বনিতে সংগীতময় করে তুলেছে সবাই ১নং ওয়ার্ডটিকে। সিরাজ ভাই অনিলকে লাঠিপেটা করে তাকে দিয়ে সব ময়লা ধুইয়ে শয্যাশায়িত করাল। শান্ত্রীদাকে বলে কয়ে হাসপাতাল থেকে ব্লিচিং পাউডার ও ফিনাল আনিয়ে ছিটিয়ে দেয়া হল। অনিলের বাহ্য-গন্ধ পরাভূত হল এমনিভাবে।

অনিলের নাটক শেষ হতে না হতেই অজিত এসে দাঁড়াল মঞ্চে। থালা-বাটি-কম্বল গুটিয়ে মাথায় তুলে সে কান্না জুড়ে দিলঃ মা, তুমি কোথায়? আমি বাড়ি যাব মা, আমি বাড়ি যাব। ওরা ত আমাকে যেতে দেয় না মা, তুমি এসে নিয়ে যাওনা। অজিত ঠাস করে বারি খায় লৌহ কপাটে। কপাল ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে তার ডান নাকে।

অজিতের করুণ কান্না অনিলের দ্বারা সৃষ্ট দুর্গন্ধময় পরিবেশকে এক বেদনা বিধূর সাগরে রূপান্তরিত করে। শান্ত্রীদা পর্যন্ত তার জন্যে দরদী হয়ে উঠে ঃ

—অজিত, তুই কাঁদিস না। এক হপ্তাহের মধ্যেই তোর মা তোকে জেল থেকে নিয়ে যাবে। এখন ঘুমোগে।

—না, না, আমি ওসব শুনব না। শান্ত্রী দা, লক্ষীটি দরজাটা খুলে দাও। আমি এক্ষুণি মায়ের কাছে চলে যাব। ঐ যে, ঐ যে, মা আমার দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাকে নেয়ার জন্যে। অমনি সিরাজ ভাই এসে অজিতের ঘারে ধরে তাকে শুইয়ে দেয় তার জায়গায়। শাসিয়ে বলে ঃ

—দেখ অজিত্‌তা, ফের উঠবি তো বেত দিয়ে তোর পিঠের চামড়া কাইট্যা ফেলমু।

—না, না আমায় মেরো না। আমার মা কাঁদছেন আমার জন্যে। ভয়ে জড়সড় হয়ে অজিত শুয়ে থাকে বিছানায়, বাঁ হাত দিয়ে কপালের রক্ত মুছে নেয় ধুতির আঁচলে।

ধনাঢ্য চাটুয্য বংশের ছেলে অজিত মস্তিষ্ক-বৈকল্যের দায়ে আজ জেলে। বিধির কী লীলা!

রাত্রির অখণ্ড নীরবতা গভীরতর হয়ে সওয়ার হয় ওয়ার্ডের চতুর্সীমানায়। গোটা ওয়ার্ডটি যমপুরীর মত রূপ নিয়েছে। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবার কথা ক্ষণিকের জন্যে ভুলে যাই ১নং ওয়ার্ডের বিভীষিকায়। মনে হল এক প্রেতাত্মার জগতে শুয়ে আছি। কালো কম্বলের ফ্লোরএর বেডে সবাই ঘোর নিদ্রায় ডুবে আছে। বিশ্রী নাক ডাকার শব্দ, মাঝে মাঝে ঘং ঘং, খুল্লুর খুল্লুর কাশির উৎপাত ব্যতীত গোটা ওয়ার্ডটির চেহারা নিদ্রিত আদম ছুরতের নানা ভংগীতে পটে-আঁকা স্থবির চিত্র যেন।

এটাচ্‌ড্‌ বাথরুমের ঝাঁঝাল পেশাব-পায়খানার গন্ধ মাঝে মাঝে নাসারন্ধ্রকে চাঙ্গা করে তোলছে। সর্দিহীন বাসিন্দাদের বড়ই করুণ অবস্থা।

www.pathagar.com

ইন্টাররোগেশন

দুপুরের খানা শেষ। ওয়ার্ডবাসিন্দারা বিশ্রাম নিচ্ছে নানা ঢং ও ভংগীতে। এদের কেহ শুয়ে আছে খালিগায়ে, কেহবা গেঞ্জী গায়ে, কেহ উপুর কেহবা চিৎ হয়ে। রোদটা তখন কড়া ছিল না। মাঝে মঝে দু'চার ফোটা বৃষ্টিও হচ্ছিল আংগিনাতে। প্রাচীর বেষ্টনীর গরম উষ্ণ বাতাস বৃষ্টির মৃদু সংস্পর্শে ঠাণ্ডা হয়ে প্রবেশ করছিল আমাদের ওয়ার্ডের ফাঁকা-ফাঁকা রডএর জানালা দিয়ে। ঘুমপাড়ানো পরশ-ছুঁইয়ে দিয়েছিল প্রতিটি বাসিন্দাকে।

—আলম কইরে? আলম?

জমাদার বাবুর কর্কশ হাঁক শুনে আমি বিছানা থেকে ধড়্ফড়্ উঠে যাই। বুকটা দুরু দুরু কাঁপতে থাকে; বোধ হয় কেন্টিনে নেবে ওরা আমাকে।

—এই ত আমি স্যার। সটান দাঁড়িয়ে জবাব দিলাম।

—হারামজাদা, শীঘ্র বেরঅ। সেকেন্ডে গেটে দৌড়ায়ে যা।

শান্ত্রী কপাট খুলে দেয়। ডবল মার্চ করে গৌড়ে যাই সেকেন্ড গেটে।

সেকেন্ড গেটের কক্ষ। তিনটি চেয়ারে তিনজন বসে আছেন। সামনের টেবিলে গরম চা'য়ের ধূঁয়ো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। এরা কেক খাচ্ছেন আর কথা বলছেন পরস্পরে।

— ভিতরে আসতে পারি কি স্যার?

— কে? অ, তোর নাম কি আলম?

— জ্বী হ্যাঁ।

—ঐ যে টুলটা। টুলটায় বস্।

তিনজনের একজন কথাগুলো বলে চা খেতে শুরু করলেন। চায়ের কাপ থেকে তখনও গরম ধুঁয়ো বেরুচ্ছে। আমার ইচ্ছা হল একটু চা যদি খেতে পারতাম। আহ্! চায়ের রংটই দুমাসে ভুলে গিছি! এক চুমুক চা যদি তারা আমায় খেতে দিত।

মনে পড়ে যায় অতীতের একটুকরো কাহিনী। খড়মপুরের রফিকউদ্দিন খাদিম সাহেব এসেছিলেন আখাউড়ায়, আমার দেবগ্রামের বাড়িতে। তখন ছিল সাতসকাল। ফজরের নামাজ পড়েই এক ক্রোশপথ হেঁটে খাদিম সাহেব এসেছিলেন সেদিন। খুব ক্লান্ত অথচ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল তাঁকে।

জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে?

—ফজরের নামাজ পড়েই তোমার বাসায় হেঁটে এসেছি নাস্তা করার জন্যে। কই, তোমার বউ কই? একটু চা খাওয়াওনা নাতীন।

খাদিম সাহেবের জবান বেহেস্তি আন্তরিকতা ও সরলতায় পরিপূর্ণ। আমি খুব আনন্দ অনুভব করলাম তাঁর কথায়। খুশীতে চীৎকার দিয়ে বলে উঠলাম স্ত্রীকে ঃ

—এই যে, শুনছ! খাদিম সাহেব এসেছেন নাস্তা করতে। শীঘ্র চা-টা বানাও না।

—এত সকালে কে এত কষ্ট করবে? কৌতুকের সুরে আমার স্ত্রী জবাব দেয়।

সিদ্ধ আটার তুলতুলে রুটি বানিয়ে দিয়েছিল সেদিন হাসনু। সেদিনের চা টাও চমৎকার হয়েছিল রং ও স্বাদে। খাদিম সাহেব পেয়ালাতে এক চুমুক দিয়েই হেসে বলেছিলেন ঃ

—তোমার বউ 'ফাইন' চা বানাতে পারে। জীবনে এই দুইবারই চায়ের স্বাদ পেয়েছি। একবার ১৯৪২/৪৩-এ কোলকাতার চৌরংগীতে মকবুলের হোটেলে খেয়ে,

www.pathagar.com

এইবার তোমার গিন্নীর চা খেয়ে। সত্যিই চায়ের প্রস্তুত প্রণালীতে তোমার বউটির মত এমন পারদর্শী মেয়ে আর একজনও চোখে পড়েনি।

আমার মনে খাদিম সাহেবের সেই হাসিমাখা চেহারাটা ফুটে উঠে; সংগে সংগে ভেসে উঠে প্রশংসিত স্ত্রীর উজ্জ্বল চেহারাটাও।

সেকেন্ড গেইটের কক্ষে অবস্থানরত তিনজনের একজন প্রশ্ন করেন আমাকে। চেতনা ফিরে পাই প্রশ্নবাণে। স্মৃতির স্বর্ণসূত্র ছিঁড়ে যায়। হরিয়ে যায় আমার স্ত্রী ও খাদিম নানার উজ্জ্বল চেহারা দুটো জেলখানার সেকেন্ড গেইটের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুঁড়তে থাকেন এই তিন ভদ্রলোক। সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাই অতি সন্তর্পণে। কী জানি, কোন উত্তর কন্ট্রাডিকটিং হয়ে গেলে ত মিথ্যাবাদী বনে যাব, সাজাও বেড়ে যেতে পারে?

— কি করিস?

—শিক্ষকতা।

—আচ্ছা তা হলে তুই, সরি! তুমি স্কুল মাস্টার! কতটুকু পড়েছ?

—এম,এ, বি,এড।

—তাই না কি? বসুন, বসুন চেয়ারটায় বসুন আপনি। আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে আপনাকে অবজ্ঞা করে। আপনার গায়ের ছোঁড়া গেঞ্জী, পরনের নোংরা লুংগী ও খালি পা দেখে মনে করেছিলাম আপনি একটি ইতর। এ ভদ্দলোকের কথা শুনামাত্রই কবি শেখ সাদীর দাওযাত খাওয়ার কাহিনীটা মনে পড়ল।

—না, না, তাতে কি আসে আয়। বন্দী ত বন্দীই। তার জন্যে "তুই-তুমি-আপনি" একই কথা। টুল আর চেয়ার ত একই পর্যায়ের। চেয়ারে বসলে ত আর আমার দুর্দিন লঘু হবে না?

আধা সংকোচ আধা নির্ভীক চিত্তে জবাব দিলাম।

আপনি কি বিবাহিত?

—জ্বী হ্যাঁ।

—ছেলেমেয়ে আছে কি?

—হ্যাঁ আছে।

—কয়টা?

—ছয়টা।

—ছ-অ-অ-য় টি? বলেন কি? কবে বিয়ে করেছেন?

—১৯৬১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর।

—তখন আপনার বয়স কত ছিল?

—বাইশ তেইশ হবে।

—এত অল্প বয়সে বিয়ে করেছেন? আমার বয়স ত বর্তমানে ৩৪ বছর, কিন্তু এখনও ত আমার বাবা মা বিয়ে করার কথা বলছেন না। যাক আপনার ছেলে মেয়ে কতটি বললেন?

—মেয়ে ৫টি, ছেলে মাত্র ১টি।

—ফাইন! ওদের কি নাম?

—লিপি, বিথী, ফাহিমা, সুহেলী ও আসাদ।

—মাত্র পাঁচ জনের নাম বললেন যে, আর একজন গেল কোথায়?

www.pathagar.com

লজ্জা পেয়ে যাই। মনে মনে হিসাব কষে দেখি তাই ত? আর একজনের নামটা কি? নার্ভাস হয়ে যাই। অথচ ঝটপট্ না বললে শুধু লজ্জার ব্যাপারই নয়, নিজের বাচ্চার নাম নিজেরই স্মরণে নেই, প্রশ্ন কর্তারা এতে মিথ্যাবাদীও ঠাওরাবেন যে।

—জ্বী, শেষ মেয়েটির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও রাখিনি। তবে কুমকুম বলে ডাকে সবাই।

—O, I See! তাই বুঝি ওর নামটা স্মরণ করতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল। যাকগে সে কথা।

—আপনার শ্বশুর কি করেন?

—স্টেশন মাস্টার।

—কোথাকার?

—লাকসাম স্টেশন।

—কী নাম ওনার?

—মিস্টার আলী ইমাম।

—ইনি কি এখনও চাকুরীতে আছেন?

—বলতে পারি না।

—কেন?

—কারণ রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে কারো সাথে আমার কোন যোগাযোগ নেই।

—তিনি কি পাক আর্মীর সহযোগিতা করছেন, না মুক্তি বাহনীর? আপনার কী মনে হয়?

—তিনি আমার আদর্শের পরিপন্থী। একজন খাটি আওয়ামী লীগার। সুতরাং সাহায্য করলে মুক্তি বাহিনীরই করে থাকবেন, পাক আর্মীর নয়।

—আপনি কোন দল করেন?

—জামায়াতে ইসলামী

—আপনার বাবা কোন পার্টি করেন?

—কোন রাজনৈতিক দল নয়। তিনি শুধু ধর্ম প্রচার করেন। এই ধর্ম প্রচার পার্টিকে তাবলীগে জামাত বলে।

—তাবলীগে জমাতও জামায়তে ইসলামীতে পার্থক্য কি?

—জামাতে ইসলামী ইসলামের প্রত্যেক বিভাগের কাজ করে,—রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সমাজনীতি ইত্যাদি সবই। তার তাবলীগে জমাত শুধু ইসলামের ধর্মীয় দিকটাই প্রচার করে যাচ্ছে।

—আপনি আর আপনার আব্বা দুই দলে কেন?

—না, আমরা দুই দলে নই। সামগ্রিক কাজটা করে যাচ্ছি আমি জামাতে ইসলামীতে যোগদান করে, আর আমার আব্বা করে যাচ্ছেন আংশিকভাবে একই পূর্ণাংগ আদর্শ ইসলামের জন্যে।

এবার দ্বিতীয়জন প্রশ্নবাণ ছুঁড়তে শুরু করলেন।

—আচ্ছা, তাহলে আপনি জামাতে ইসলামীর লোক। আপনাদের দলের লীডার বুঝি মওদুদী, পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। তিনি কি এখন পূর্ব পাকিস্তানে না পশ্চিম পাকিস্তানে আছেন?

www.pathagar.com

—কোথায় আছেন জানি না।

—বেশ, আপনাদের পূর্ব পাকিস্তানের লীডার গোলাম আযম কোথায়? তিনি এখন কি করেন?

—জনাব, দেখুন আমি পাড়াগাঁয়ের মত স্বীয় গ্রাম দেবগ্রাম থাকি। এসব খবরাখবর রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া হাই স্কুলের মাস্টারীর কাজ সেরে লীডারদের ব্যক্তিগত খবরাখবর জানার এতফুরসত পাওয়াও যায় না।

—আচ্ছা, বুঝেছি। আপনার মামার বাড়ি কোথায়? মামা আছেন?

—কুমিল্লায়। জ্বি হ্যাঁ, আমার মামা আছেন।

—কুমিল্লা কোন জায়গায়?

—দক্ষিণ চর্থা।

—আপনার মামা কি করেন?

—কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের পলিটিক্যাল সাইন্সের প্রফেসর।

—কি নাম তার?

—প্রফেসর শামসুল আবেদীন।

—নাইস্। কুমিল্লা শহর থেকে অর্থাৎ আপনার মামার বাড়ি থেকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট কত দূর?

—৬/৭ মাইল।

—আপনার কোন আত্মীয় কি আর্মীতে চাকুরী করেন?

—না।

—একজনও নয়-দূর বা নিকটাত্মীয়?

—না।

—ক্যান্টনমেন্টে কোনদিন গিয়েছেন কি?

—না।

—একদিনও না?

—না।

—পাক আর্মী ত আপনাদের দেশেরই আর্মীই। ওদের কারো সাথে আপনার বন্ধুত্ব বা পরিচয় আছে কি?

— না, নেই।

—ওদেরকে কি দেখেছেন কোনদিন?

—হ্যাঁ, দেখেছি।

—ওরা কি কি অস্ত্র নিয়ে ট্রেনিং দেয় এবং যুদ্ধ করে? কয়েকটি অস্ত্রের নাম বলুন ত দেখি।

—রাইফেল নিয়ে ওদেরকে চলাফেরা করতে দেখেছি।

—আরো কয়েকটা অস্ত্রের নাম বলুন না দেখি?

—রাইফেল ছাড়া কোন অস্ত্রের নাম জানি না।

—রাইফেলটা কোন দেশের?

—তা জানি না।

—একটু চা খাবেন?

—না, ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

—খান না!

—না। মাফ করবেন। আজ হঠাৎ এক কাপ চা খেয়ে কাল আবার পাব কোথায় এর নেশা মেটাতে?

—আচ্ছা, থাক তাহলে। আপনাদের দেশে কয়টি রাজনৈতিক দল আছে?

—জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজাম ইসলাম, আওয়ামী লীগ ইত্যাদি।

—কোন দলটি শক্তিশালী?

—শতকরা ৯৯ টি ভোট আওয়ামী লীগ পেয়েছে ১৯৭০ সনে। সুতরাং আওয়ামী লীগকেই শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বলতে হবে।

কোন রাজনৈতিক দলের নেতা কে, এসব নেতা কে কোথায় আছেন, কি ভাবে ওরা বর্তমান গোলযোগের সময় কাজ করে যাচ্ছেন, ওদের সহযোগী হিসেবে কার ভূমিকা কি, শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে কি হত্যা করা হয়েছে না জীবিত, যদি জীবিত হন তবে তিনি পূর্ব না পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দী আছেন, ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করার পর আমার 'ইন্টারোগেশন' পর্ব শেষ হয়।

ওরা তিনজনই ডি.আই.বি. অফিসার তিন এলাকার। একজন দিল্লী, দ্বিতীয়জন কোলকাতা এবং তৃতীয়জন আগরতলা থেকে এসেছেন "ইন্টারোগেশন" এর জন্য। সব প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে রেকর্ড করে এরা নিয়ে গেছেন। কী জানি এর পরিণাম কি হবে?

আশংকা জাগলো; এসব প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী জামাতে ইসলামী ও অন্যান্য নেতা ও আত্মীয়-স্বজনের উপর কোন আক্রমণ চালানো হয় কিনা তা ই বা কে বলতে পারে? দুর্ভাবনায় আমার মন চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠে। নিজের মেয়ের নামটিও ভুলে গিয়েছিলাম। "শামীমার"র পরিবর্তে ঝটপট "কুমকুম" বলেছিলাম ছোট মেয়েটির নাম। ওয়ার্ডে ফিরে এসে ছোট লাল ইটের কণা দিয়ে "কুমকুম" নামটি লিখে রাখলাম বিছানার মাথার কাছের দেয়ালে, যেন অন্যদিন ইন্টাররোগেশন হলে এই নামটি বলতে ভুলে না যাই।

সিরাজ ভাই মানুষটি

জেলখানায়-ও রাত পোহায়। ভোরের নিষ্পাপ বাতাস ফুলের মিষ্টি গন্ধ উপহার দিয়ে যায় জেলখানার অধিবাসীকে। মুক্ত পৃথিবীর মুক্ত হাওয়ার সাথে বন্দীদের যোগসূত্র রক্ষা করে চলছে শুধু প্রকৃতি। প্রকৃতি কত কোমল! কত দেলদরাজ!

দিনমণির আগমনে নির্মল প্রভাতের উন্মোচন হতে থাকে। ওয়ার্ডের বাসিন্দাদেরও ঘুম কাটে। প্রত্যহিক ক্রিয়াদি শুরু হয়া একজনের পর একজন বাথরুমে ধাওয়া করে প্রস্রাব করতে বসে যায়। দিবা-রাত্রির নিয়ন্ত্রিত খাদ্যে ওদের ক্ষুধা যৎকিঞ্চিতই নিবৃত্ত হয়। রাত ২/৩টা থেকে ওদের মধ্যে পানি খাওয়ার হিড়িক চলে ক্ষুধার আগুন নেভানোর জন্যে। বাটিতে সংরক্ষিত পানি ঢক্ ঢক্ করে ওরা খায় প্রতি মধ্যরাতে, আর ভোরের আগমনীকে স্বাগতম জানায় কলসী-কলসী প্রশ্রাব ত্যাগে।

ভোর পাঁচটায় শান্ত্রী ঘন্টা বাজায় সেকেন্ড গেইটে। অমনি শুরু হয়ে যায় প্রতিদিনকার জেলখানার প্রভাত সংগীত ঃ

"পতিত পাবন সীতারাম-ঈশ্বরে তেরী আল্লাহতে নাম।"

সংগীত শেষে মাঝে মাঝে কয়েদীরা শরীর চর্চাও করে ১৫/২০ মিনিট। ঘুমন্ত দেহের জড়তাকে কাটিয়ে হাত পা গুলোকে কর্ম স্পন্দনের উপযোগী করে তোলে এরা।

www.pathagar.com

মহেন্দ্র ও তার মত বড় বড় সর্দাররা কর্ম বণ্টন করে দেয় কয়েদীদের মধ্যে। কারো কাজ ফুল ফুল গাছের গোড়া খোঁচান, কেহবা ফুল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে তোড়া রচনা করে জেইলার বাবু, জেল সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব, জমাদার বাবুর বাসা-বাড়ীর জন্যে। কেহবা কোদাল খুন্তী নিয়ে নেমে পড়ে কৃষি কাজে-ফুলকপি, পুঁই শাক আর মানকচুর খেতে। নিকৃষ্টতম কয়েদীদেরকে দেওয়া হয় টিউবওয়েল চেপে-চেপে হাউজ ভরাট করা, পেশাব পায়খানার নর্দমা পরিষ্কার করা রোলার টেনে টেনে জেল-কম্পাউণ্ডের লাল-ইটের রাস্তা মসৃণ করার মত গুরুশ্রমের বিবিধ কাজ। চলার পথে Swiss-made ঘড়ির কাঁটার ব্যতিক্রম হতে পারে, কিন্তু কয়েদী পারে না তার বরাদ্দ কাজ থেকে তিল পরিমাণ সরে যেতে।

সিরাজভাই মহেন্দ্রদার মতই একজন সর্দার। ডবল খুনী। আদত বাড়ী পূর্ব পাকিস্তানের নোয়াখালী জেলায়। ১৯৫৪ সনে নোয়াখালীতে খুন করে দেশত্যাগী হয়েছে স্বদেশের জেলের মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে। আগরতলায় এসে স্বামী-স্ত্রী দুইজনই আশ্রয় নিয়েছে।

ছোট-খাট একটা বাড়ী করে সুখের সংসার পেতেছিল সিরাজ ভাই। বছর দুয়েক পরে একটি ছেলে হল তার। পাড়াপড়শী অধিকাংশই অমুসলিম। ওরা সিরাজ ভাইকে বিদ্বেষের চোখে দেখতে লাগল। সে খুনী, তার উপর আবার পূর্ব পাকিস্তানী। সে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এদেশে। "এই শ্যালাকে ভিটে ছাড়া করতে হবে।"

সিরাজ ভাই ষড়যন্ত্রকারীদের দুজনকে হত্যা করল এক রাতে। তার স্ত্রীও হত্যার কাজে জড়িত ছিল বলে দুজনারই ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সিরাজ ভাই ১নং ওয়ার্ডের ২য় সর্দার, মহেন্দ্রদা প্রথম। স্ত্রী বেগম সিরাজ মহিলা ওয়ার্ডের "গিন্নী" বা কর্ত্রী। সিরাজ ভাই এর ছেলেটা আগরতলায়ই থাকে। বর্তমানে ১০/১২ হবে তার বয়স। বাবা-মাকে দেখার জন্য মাসে দুবার আসে জেল গেইটে। জেইলারবাবু মধুসূধন চক্রবর্তী না-কি সিরাজ ভাইয়ের ছেলেকে বেশ আদর করেন।

রবিউল্যা ভাইয়ের সাথে সিরাজ ভাইয়ের বেশ হৃদ্যতা জমে উঠে। এই সূত্রে আমিও রবিউল্যা ভাইয়ের মত ১নং ওয়ার্ডে ধীরে ধীরে নিঃশংক চিত্তের অধিকারী হয়ে উঠি। এক দুপুরে সিরাজ ভাই বরিউল্যা ভাইকে একটি বিড়ি দেয়, আর নিজেও একটি বিড়ি ধরিয়ে নিজের জীবনের এ কাহিনী আপন মনে বলে যায়।

—দেখ রবি মিয়া, আমার দেশের মানুষই তোমরা। আইজ বড় কষ্ট লাগে মনে। কিয়ের লাইগ্যা নিজের দেশ ছাড়লাম? খাটতাম, খাটতাম জেল নিজের দেশে কতই না এতে ভাল হইত। আর যা-ই হক জেলের বিতর ত নিজের দেশের মানুষেরও দেহাডা অইত। কি হে মাষ্টার বুঝনি আমার কতাডা?

—সিরাজ ভাই, আর কতদিন তোমার জেল খাটতে অইব? রবিউল্যা ভাই ভেজা কণ্ঠে শুধায়।

—আল্লাহ আল্লাহ কইর‍্যা ১০ বছর কাইট্যা গেছে, আর ৪টা বছর রইছে এহনও। খালি ছেলেডার চিন্তায় মনটা কাঁইন্দা উঠে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সিরাজ ভাই।

—জীবনে ত দুই দুইডা খুন করেছি। খুনের স্বাদ মিটছেরে আমার। এহেন কিছু বালা কাম করতে চাই।

হঠাৎ সিরাজ ভাই দাঁড়িয়ে যায়। মাথায় কয়েদীর সাদা টুপিটা তাক করে নেয়। ঠিক করে নেয় কোমরের বেল্টটাও। হাতের বেতটা ঘুরিয়ে বেরিয়ে যায় ওয়ার্ড থেকে মাঠের তদারকী কাজে।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগারদেরকে স্বাগতম

সন্ধ্যার দিকে নতুন নতুন অতিথি আসল অনেক। হর রোজই ১৫/২০ জন করে পূর্ব পাকিস্তানী 'বন্দী' হয়ে আসতে লাগল, যেন স্রোতের মুখে টাটকা পুঁটি মাছের জোয়ার। যুদ্ধের তীব্রতা যে বাড়ছে এরই উপসর্গ এটি।

সিলেটের চা বগানের মালিক মহিবুর রহমান এলেন। খানদানী মুসলিম লীগার। সাবে এম-পিও একজন আসলেন এখানে। নাম সায়েদ মিয়া।

সিলেটের মহিবুর রহমান আমার পাশেই কম্বল পেতে আশ্রয় নিলেন। আলাপ জমিয়ে জানতে পারলাম ঃ

মুক্তিফৌজ মহি ভাইকে 'কিডন্যাপ' করেছে। দুদিন ক্যাম্পে জিম্মী হিসেবে আটক রেখে ৮/১০ হাজারের মত টাকা তার বাড়ী থেকে আদায় করিয়ে পরে জেলে চালান দেয়।

মহি ভাইয়ের স্ত্রী বড়ই সুন্দরী। ৭/৮ বছরের একটি মাত্র ছেলে তাদের। ফুটফুটে সুন্দর। নয়নমনি ওদের দুজনার। স্মৃতি বড়ই পীড়াদায়ক। তার আকাংখা একবার ছুটতে পারলে স্ত্রীপুত্রসহ অন্য কোথাও পালিয়ে যাবেন, নইলে সবাই মিলে এক সাথেই গুলি খেয়ে মরবেন। তবু একাকী থাকতে তিনি পারবেন না। মিনমিনিয়ে কেঁদে-কেঁদে তার চোখ দুটো টকটকে লাল জবা হয়েছে। জেলখানা ত শুধু দেহ বন্দী করে রাখে, যদি মনাটকেও এরা বেড়ী পরিয়ে দিতে পারত তাহলে ত এত কষ্ট হতো না!

দুদিন পর মহিবুর রহমানকে কেন্টিনে নেওয়া হয়।

—"শ্যালা মুসলিম লীগার"। রবিউল্যা ভাইয়ের মত মহিভাইকেও ধোলাই করে জমাদার বাবু আর মহেন্দ্র গং।

মহিভাই এমনিতেই মোটা। রবিউল্যা ভাইকেও ছাড়িয়ে গেছে তাঁর দেহের আহত স্থানসমূহের স্ফীতিগুলো। একটি চোখে এমন এক ঘুষি লেগেছে যে এই চোখের লাল রং মোটেই প্রশমিত হচ্ছে না। মহিভাই বলেন ঃ

—আমার বাম চোখটা কি নষ্ট হয়ে যাবে আলম?"

মহি ভাই খুব বড় লোক। বড়ই আরাম আয়েশ প্রিয়। তার দেহের গঠন ও চালচলনই একথা বলে। পরিধানের লুংগী ও হাফ শার্টটি ছিল অত্যন্ত মিহি ও মূল্যবান সূতোর। তার সোনার দেহখানা কালো ইটের 'ঝামা' বরণ হয়ে গেল দুদিনে।

জনাব সায়েদ এক্স এম. পি। তিনিও মুসলিম লীগার। খুবই বৃদ্ধ। চুল-দাড়ি সফেদ সাদা। গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে। কপালে অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে তাঁর। লম্বা দেহ, উঁচু নাক, ফর্সা তনু। তাঁকে কেন্টিনে নেয়নি জমাদার বাবু। তবে প্রথমদিন চার-পাঁচটে বেত্রাঘাতে তিনি আপ্যায়িত হয়েছিলেন ১নং কম্পউন্ডের আংগীনাতে। বেত্রাঘাতে এম.পি সাহেবের বাম হতের কনিষ্ঠ অংগুলী ভেংগে যায়।

প্রতিদিন বিকেলে নৈশ-ভোজের প্রস্তুতির জন্যে কয়েদীরা যখন জড় হত, অথবা চত্তরে বসত তখন এমপি সাহেবকে কানে ধরে উঠান বসানো হত ৪০/৫০ বার। শ্লেষমাখা উচ্চকণ্ঠে জমাদার বাবু বলত ঃ

—বেডা বুইর‍্যা কোথাকার? মুসলিম লীগ কইর‍্যা কত মানুষ মারাইছছ তুই। তোরেও কেন্টিনে নিতাম। বয়স বেশী দেইখ্যা বাঁইচ্চা গেলী। নে শ্যালা, কানে ধইরা উইট্যা বইয়্যা এর প্রায়শ্চিত্ত কর।

www.pathagar.com

আমরা, মানে মহিবুর, রবিউল্যা ভাই ও অন্যান্য পূর্ব পাকিস্তানী বন্দীরা এই হৃদয়হীন দৃশ্য দেখে নেতিয়ে পড়তাম। মাথা নীচু করে চোখ নত রাখতাম এ অপমানজনক দৃশ্য দর্শন থেকে।

নবাগতদের জোয়ার

চারদিন কেটে গেছে। ৭৬ জনের জন্য নির্মিত এক নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান বাসিন্দা একশত পঁচিশ জন। গায়ে-গায়ে ঘেঁষে শুতে হয়। পায়ে পায়ে উঠা-বসা করতে হয়। একদিকে গ্রীষ্মকালীন গরম আর ঘামের গন্ধ, অপরদিকে বাহ্যিপূর্ণ পায়খানার চুকা বগ্‌লানী খোশবুর বাসিন্দা আমরা সবাই। প্রতিদিন নতুন নতুন মুখের সমারোহে ১নং ওয়ার্ড জমজমাট হয়ে উঠল বেশ। ভালই লাগছিল নতুন অতিথিদের আগমনে, কারণ এদের আগমন রচনা করছিল নবতর চেতনা আর ঔৎসুক্য জেলজীবনের একটানা স্রোতে।

নরসিংদীর চালব্যবসায়ী সেলায়মান মিয়া, কসবার গৃহস্থ তালেব আলী, কুমিল্লা লালমাইয়ের আবদুর রশীদ, ইমামুদ্দীন ও অহিদ, গংগাসাগরের জনৈক মোরগ ব্যবসায়ী, সিলেটের জনৈক চাউল পাচারকারী, নোয়াখালীর ভিক্ষুক কফিলউদ্দিন, কসবার কুটি অঞ্চলের সাহাদাত হোসেন—এদের অনেকেই ১নং ওয়ার্ডে তসরীফ এনেছে। এরা সবাই পূর্ব পাকিস্তানী, বাংগালী। ওর সবাই শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আগরতলার শরণার্থী ক্যাম্পে। বিগত তিন দিনের মধ্যে নানা সন্দেহ আর অজুহাতের স্রোতে ওরা থরে থরে জমা হয় ১নং ওয়ার্ডের জগতে।

বেশ আনন্দ পেলাম এতে। এখন আমাদের ওয়ার্ডটি বিদেশী-জগৎ বলে মনে হয় না। নিজের দেশের লোক এসে প্রবাস বন্দীজীবনের অনেকটা ক্লান্তি ও অসহায়ত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। ফরাগত হলাম বেশ।

শ্যামবরণ, নাদুস-নুদুস সোলায়মান মিয়া পাক বাহিনীর অপারেশনের সময় যশোর বর্ডার দিয়ে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করে। শরণার্থী হিসাবে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কোলকাতা ঘুরে আগরতলায় পৌঁছে। এখানে এসেই ডি.আই.বি. "মুসলিম লীগার" হিসেবে সন্দেহ করে ঢুকিয়ে দেয় সোলায়মান মিয়াকে এই মেহমানখানায়। সুলায়মান মিয়ার মিশ কালো দাড়ি আর গোঁফ "অকাল" হয়েছিল এই ভাগ্য বরণের। মেজাজ কোমল ও সদালাপী হওয়ায় সবাই তাকে ভালবাসে অকৃত্রিম আন্তরিকতায়।

তালেব আলী মিয়া বনেদী গৃহস্থ। কসবা বর্ডার পেরিয়ে নিরাপত্তার জন্যে আগরতলায় আশ্রয় নেয় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। ওখান থেকে "বেআইনী প্রবেশকারী" হিসেবে ধৃত হয়ে প্রেরিত হয় জেলে। হ্যাংলা-পাতলা গড়ন, উজ্জল তনু। অবস্থা সম্পন্ন বলে জেলজীবনেও তাকে মধুর মনে হল স্বভাব আচরণে।

আবদুর রশীদ, ইমামুদ্দিন ও অহিদ। এরা চাচাত-জেঠাত ভাই। সোনামুড়া বর্ডার মুক্ত জেনে জোট বেঁধে আগরতলায় এসেছিল প্রমোদ ভ্রমণে। বাসে ফিরবার পথে পুলিশ ওদেরকে জিজ্ঞেস করে ঃ

—তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—বাংলাদেশে। ইমামুদ্দিন জবাব দেয় একটু বেয়াড়াভাবে। এটা তার মজ্জাগত স্বাভাব, বেতমজী নয়।

—আগরতলায় এসেছ কেন?

—এমনি আসছিলাম, একটু ঘোরাফেরা করতে আর কি?

www.pathagar.com

অমনি পুলিশটি নাঁবিয়ে নেয় ওদেরকে। চালান দেয় জেলে। দুধ-সাদামন হওয়া সত্ত্বেও স্বভাবজাত অমার্জিত জবানের জন্য তাদের এই দশা ঘটল।

গংগাসাগরের মোরগ ব্যবসায়ী সামাদ মিয়া। এক মসজিদের ইমাম। মুক্তিযোদ্ধা ও পাঞ্জাবীদের গোলাগুলিতে তাঁর দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার কিছু নেই দেখে ঘরের পাঁচ জোড়া মোরগ নিয়ে আগরতলা বাজারে আসেন। ৫ জোড়া ৭৫/- টাকায় বিক্রী করে বাড়ি ফেরার পথে পুলিশ ধরে পাঠিয়ে দেয় জেলগৃহে। ইমাম সাহেব বলেন ঃ

—বাবা, আমি এইডাই বুঝতে পারি না যে, যেই পুলিশটা আমারে বর্ডার ক্রস করার সময় অনুমতি দিছিল, হেই পুলিশটাই আবার আমারে কেন ধইর‍্যা জেলে পাঠায়?

—পুলিশের কি আপনি মোরগ বিক্রী কইর‍্যা যে দেশে ফিরবেন এই কথা জানাইছিলেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তাকেও বলছি আমার দুঃখের কথা। তখন সে কইছে ঃ আপনি বুড়া মানুষ আমার বাপের সমান, তাছাড়া জয় বাংলার লোক, আপনারে সাহায্য করণ ত আমার পরম ভাগ্যের কতা।

সিলেটের চাউল পাচারকারী রইছউদ্দিনও জেলে ঢুকে এমনিভাবে। চাউল বিক্রী করার সময় তার এজাজত ছিল বর্ডারে ঢোকার। শুধু তা-ই নয়, বরং তাকে ওখানকার পুলিশ বলে ঃ

—দাদা, রোজ চাউল তুই নিয়ে আইবি, ভাল দর দিমু তোরে। ব্যাপারী এতে খুব খুশী হয়। চাউলের দর মাত্র ২৪/= টাকা, আগরতলায় ৬০/= টাকা। অনেক লাভ হইব ত! আবার এই টাকা থাইক্যা ১৬/= টাকা দরের জিরা (প্রতি সের) আগরতলা থাইক্যা কিন্‌না সিলেটে ৬০/= টাকা বিক্রী করলে লাভ-কইর‍্যা লাল হওয়ন যাইব। ব্যাপারী এই নিয়তে দেড় মন চাউল ৯০/= টাকায় বিক্রী করে দুই সের জিরা কিনেছিল দেশে নিতে। কিন্তু তা আর হলো না। তার জিরা সীজ হলো বেআইনী ভাবে হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রীয় মাল পাকিস্তানে নেওয়ার অপরাধে। বেপারীর পায়ের তলায় বেত মেরে ফুলিয়ে দিয়েছিল বর্ডারের দেশপ্রেমিক ইন্ডিয়ান পুলিশ ভাইয়েরা। স্ট্রেচারে করে পরে তারা তাকে চালান দিয়ে দিল আগরতলার সদর জেলে।

জামাতে নামাজ কায়েম

শরীরের নাম মহাশয় যাহা সওয়ায় (সহ্য করান হয়) তা-ই সয়। তাই জেলখানার জীবনে আমার দেহ-মনটাও সয়ে উঠেছে। এখন মা-বাবা, ভাই-বোন, বৌ-ঝি, আত্মীয়ের জন্যে মনটা তেমন আর কেঁদে উঠেনা। শাহাদাত হুসেন, সুলেয়মান মিয়া, তালেব আলী, কফিলদ্দিন ও এদের মত অন্যান্য পাকিস্তানী বন্দীরা এখন আমার আপনজন, আপন-সংসার। তাদের সাথে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় গালগপ্প করে, সুখ-দুঃখের স্মৃতিচারণ করে, বিড়ি ফুঁকে, জেলজীবনে স্বাভাবিকত্বের রং ধরেছে মন-মগজে। তবে মাঝে মাঝে দুপুরে, কখনও সন্ধ্যায় মনটা কঁকিয়ে উঠে ছেলেমেয়েদের চিন্তায়।

সাত দিন কেটে গেল। প্রথম প্রথম ভয়ে বসে-বসে অথবা কোনদিন শুয়ে-শুয়ে নামাজটা আদায় করে নিতাম। হিন্দুস্তানের জেলখানা, তার উপর পাকিস্তানী মুসলিম বন্দী, তারও ওপর জামা'তি ইসলামী; ছুতো পেলেই কেন্টিনে নিয়ে বেদম পিটিয়ে

www.pathagar.com

পৈশাচিক আনন্দ ও তৃপ্তি পায় যারা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে কী রক্ষে আছে? আমার মত ভীতু তালেব আলী এবং সুলেমান মিয়াও বসে বসে নামাজ আদায় করে ওয়ার্ডে।

একদিন দুপুরে আমি ও সুলয়মান ভাই স্থির করলাম সিরাজ ভাইকে ধরে নামাজ পড়ার পারমিশনটা নেব। বসে বসে চোরের মত নামাজ পড়তে আর মনটা চাচ্ছে না। কে যেন হৃদয়ের সিংহাসনে বসে বলছিল ঃ তোমার হায়াত এবং মওতের মালিক যিনি তার উপর তোমার ভরসা ও প্রত্যয় এখন-ও সৃষ্টি হয়নি? বেওকুফ কোথাকার? এই জেলজীবন থেকে মুক্তি দাতা কি তোমার এ মধু বাবু, না তোমার মধুবাবু তথা গোটা বিশ্বের স্রষ্টা যিনি তার? এখনও মানুষকে ভয় কর তুমি? ছি, ধিক্ তোমার জীবনে! তোমার স্রষ্টাকে তুমি মহাপরাক্রমশালী হিসাবে যদি মানতে ও জানতে তবে আজও বসে বসে নামাজ পড়তে না?" একদিকে জেল-জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, চাক্ষুস বাস্তব শাস্তির হাতছানি; অপরদিকে অদৃশ্য অনাজ্ঞাত ভবিষ্যতের "প্রশাস্তির" আহ্বানে বড়ই পেরেশানী বোধ করছিলাম। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম-দেহটাত পিঞ্জিরাবদ্ধ হয়েই আছে; এর জন্যে কোন পরওয়া নেই, এবার "মনটার" সুস্থতা উদ্ধারের জন্যে সিরাজ ভাইকে নামাজের কথাটা বলেই ফেলব। "মন" আমার; ওটা হিন্দুস্তান সরকারের গোলাম নয়।

দুপুরের Lunch শেষ করে সিরাজ ভাই শোয়েছে তার দুগ্ধশুভ্র ফেননিভ শয্যাটিতে। দুজন মেট্ হাত-পা-গা ম্যাসেজ করছে সিরাজ ভাইয়ের। উদ্দেশ্য ঃ তার সদ্য অগ্নিসংযোগকৃত মুখের বিড়িটার প্রান্তিক অংশটুকুর সুখ টান দিতে হবে।

—সিরাজ ভাই।

—হুঁ, কেডারে? কি অইছে তোগ?

মুদ্রিত নয়নযুগল একটু ফাঁক করে তাকাল সিরাজ ভাই আমাদের দিকে। ওর চোখ দুটো তখন লাল করমচার মত। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল ঃ হয় মনজুর; না-হয় বাজারে কিল!

—কিচ্ছু না, একটা কথা কওয়ার লাইগ্যা দুই তিন দিন ধইর‍্যা গুরতাছি। যদি আপনে...

—এরে অই শ্যালা; এহন কতদূর ঘুমাইতাম ছাইছলাম; তোরার জ্বালায় দেহি ঘুমডাও আর অইত না। ভূমইকা ছাইর‍্যা কতাডা কইলে কইয়্যালা।

গালি দিয়ে কথাটা বললে-ও সিরাজ ভাইয়ের স্নেহসিক্ত হৃদয়টা এর মধ্যে ফুটে উঠছিল। তাই আমি বাকীটুকু বলার জন্যে সুলেমান ভাইয়ের পায়ের পাতায় গুঁতো দিলাম আমার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে। সুলেমান ভাই তেজী ভাব ধরলেন। ফিস্‌ফিসিয়ে বললাম তাকে ঃ অপছন্দ হলে হয় একটা ধমক নয়ত দুটো বেতের বারি। লজ্জার কিছু নেই এতে। এখানে ত সবাই "বেত্র মশাইয়ের" অনুগত বান্দা!

—আমরা পাকিস্তানী নামজ-কালামের একটু সুযোগ চাইছলাম। আপনি যদি আমগরে একটা "পারামিশন" দিতেন তা অইলে...।

—আরে তোরা কছ্ কি? তোরা নামাজ পরবি ত পারমিশন দেমুনা ত কি দেমুরে? সিরাজ ভাই এক লাফে বিছানার মায়া ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে যায়। তার চোখমুখে কে যেন স্বর্গীয় আনন্দ মেখে দিয়েছে।

—দেখ্, সারাটা জীবন ত কম পাপ করি নাই। খুন-খারাবী, বদমাইশি, বাং-মদ খাইয়া সোনার রং এর শরীরটারে ত্যামা বানাইয়া লইছিরে। এতে ভোগের আনন্দ

www.pathagar.com

পাইছি; কিন্তু সুখের মুখটা পাইলাম না। এহন যৌবন হারাইয়া বুঝি; শরীরের মজা লুইট্যা মনডারে কত যে ফতুর বানাইয়া লইছি!

বিবেকের তীব্র দংশনে সিরাজ ভাই চাংগা হয়ে উঠে। তার গোঁফওয়ালা চেহারাটা মুহূর্তের মধ্যে অনুশোচনার অনলে পীত রং ধরে। খুনী সিরাজ ভাইয়ের অন্তরের "মানুষ-সিরাজ" আবির্ভূত হয়ে উঠল। আমি আর সুলেমান ভাই বিস্ময় আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। সিরাজ ভাইয়ের ভাবগদগদ ও ভক্তি মিশ্রিত কণ্ঠস্বর আমাদেরকে সম্মোহিত করে রেখেছে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ; নির্বাক।

—তোরা বিলালের মত আজান দিবি। সুন্দর আজানে আমার ১ নম্বর ওয়ার্ডেরে ঘুম্ পাতাইয়া ফেলবি; নইলে কিন্তু পিডের চামড়া বেতাইয়্যা তুইল্লালামু।

—হেঁ, হেঁ সিরাজ ভাই। বিলালের মত আজান দেওয়নের লোক আমডার আছে, আমনে খালি হুকুমডা দেন।

সুলেমান ভাই জবাব দেয় পরম উৎসাহে।

—যা, তোরার আর্জি আমি মাইন্যা নিলাম। দেহি তোগ উছিলায় আল্লায়নি আমারে ফুলছিরাত পার করে।

হাতের লাঠিটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বজ্র নিনাদে হাঁক দিল সিরাজ ভাই ঃ

—বেনমাজীর দল, তোরা সব পূব দিকে যা; আর নামাজীর দল, তোরা সব পশ্চিমে যা। এই নিয়মেই তোরা তোরার হান্ডি-বাসন লইয়্যা বিছানা কইর‍্যা লা।

যো-হুকুম ঐ কাজ। থালা-বাটির ঠনাঠন শব্দ আর কম্বল ঝেড়ে বিছানা-গুটানোর হিড়িক পড়ে গেল নিমিষে। দু-তিন মিনিটের মধ্যে গম্ গম্ সরগোলের আওয়াজে দুপুরের নীরব ১ নং ওয়ার্ড প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। এক অপূর্ব স্বর্গীয় শিহরণ অনুভব করলাম এ দৃশ্যে। সুলেমান ভাই ও অন্যান্য নামাজীদের চেহারায় ফুটে উঠল তাজা ফুলের হাসি।

—মাস্টার, কইরে হুন, তোগের মধ্যে যে আজান দিব তারে ক' তার আজান যেন বিলালের মত মদুর হয়। তার আজানের ছোঁয়ায় আমার ঘুম যেন সকালে ভাইংগ্যা যায়; নইলে তোগো জামাত বাইংগ্যা দিমু, বুঝলিরে?

সিরাজ ভাইয়ের হুশিয়ারী দপ্ করে আমাদের উৎসাহটা নিবিয়ে দিল। আজনের "সুর" সুমধুর হবে কি-না; আর হলেও বা সিরাজ ভাইকে কতটুকু মোহিত করবে ইত্যাদি সংশয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম সবাই।

তালেব আলি, সোলেমান ভাই এবং রবিউল্যা ভাইকে নিয়ে আলোচনা করে ঠিক করলাম ইমামদ্দিনকে দিয়ে পহেলা আজান দেওয়ান। আগরতলা জেলখানার হৃদয়হীন মরুতে "তাকেই" আমরা প্রথম মুয়াজ্জিন হিসেবে মনোনীত করি।

ইমামদ্দিন প্রথম জীবনে মাদ্রাসায় পড়েছে হাসতম পর্যন্ত; তাছাড়া বর্তমানে "নাইন ক্লাসের" ছাত্র। বেশ চালু ও বুদ্ধিমান। নাদুস-নুদুস চেহারা। গলার এলহান সুমধুর। নৌজোয়ান বয়সের হওয়ায় কণ্ঠস্বর চড়া ও মজবুত। জেলে ঢুকে প্রথম প্রথম কাঁদত, কখন-ও বা আপন মনে শিল্পী আব্বাস উদ্দিনের "আগে জানলে তোর ভাংগা নৌকায় চড়তাম না" গানটি গাইত। তার এই গানে আমরা তন্ময় হয়ে যেতাম। ইত্যাদি বিবেচনায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ১নং ওয়ার্ডের "বিল্লাল" ইমামদ্দিনই যথাযথ হবে। বাকী আল্লাহর হাতে।

www.pathagar.com

জোহর থেকে "আজান" দেয়া শুরু হবে। জেলখানার সদর গেইটে একটার ঘন্টি পড়লেই ইমামদ্দিন ছড়িয়ে দেবে তার আজান। বিকেল ৪টায় আছর, রাত্রি ৯ টায় এশা আর ভোর ৫টায় ফজরের সময়-নির্ঘন্ট সাব্যস্ত হল।

দুপুর ১টায় ঘন্টি পড়ার সাথে সাথেই ইমামদ্দিন জোহরের আজান ছড়িয়ে দিল ১নং ওয়ার্ডের আবদ্ধ বাতাসে। সংগে সংগে চমকিয়ে উঠল-হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান, নামাজী-বেনামাজী বন্দীসমূহের অন্তরাত্মা। ইমামদ্দিনের সুমধুর এলহান তাদের নয়ন-মনে স্বর্গীয় দীপ্তি দেদীপ্যমান করে তোলে। ধর্মীয় জ্ঞান ও আশীর্বাদ বঞ্চিত ওদের বিশুষ্ক-পিপাসার্ত্ত আত্মাসমূহ যেন এক পশলা রহমতের বৃষ্টি উপভোগ করল!

আমাদের জোহরের জামাত বেনামাজী, বিশেষ করে অমুসলমান বন্দীদের বদ্ধচিন্তার জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে; বিশেষ করে শৃংখলা ও কাতার বন্দী জামাতের বেহশতী-রূপ, সৌন্দর্য ও সাম্যের প্রদর্শনীতে। ওরা পরস্পর বলাবলি শুরু করেছে ঃ

—দেখ্ দেখ্ কত ছুন্দররে মুসছলমানের নামাজ। এক ছাতে উতে-বসে; এক ছাতে হাত তুলে ভগবানরে ডাকে-কি ছুন্দর ছুর করে-করে!

আর একজন বলে উঠে ঃ

—কত মিঠা সুর রে, পরানডা যেন কইর‍্যা লয় শন্তির রাজ্যে। চোখ জুড়ায় দেইখ্যা, কান আর কইলজ্যা ঠাণ্ডা হয় কোরআনের ছুরে!

তৃতীয় জন জানতে চায় ঃ

—ছুর ত সুন্দর, অর্থটা কিরে? ইত্যাদি।

সময়ের নির্ঘন্ট অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ধীরে ধীরে কায়েম হয়ে যায়; দু'চারজন করে নামাজীও বাড়তে থাকে। ক্রমে দেখা গেল ১নং ওয়ার্ডে নামাজী বেনামাজীর সংখ্যা ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১নং ওয়ার্ডের অর্ধেকটা এখন দস্তুর মত মসজিদের রূপ ও জুলুস ধরেছে।

সিরাজভাই খুব খুশী, ইমামদ্দিনের আজান ও আমাদের নামাজে একাগ্রতা ও শৃংখলা দেখে। শুধু তা-ই নয়, পাঁচ বার পাঁচ ওয়াক্তের আজান ও নামাজ শেষ না-হওয়া অবধি ১নং ওয়ার্ডে যে নীরবতা ও ভক্তি বিরাজ করে তা সিরাজ ভাইয়ের ডাণ্ডাও সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়নি। লাঠি বা ডাণ্ডা দিয়ে দুষ্টকে দমন করা যায় বটে কিন্তু ধর্ম-ব্যতীত যে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া যায় না তা সিরাজ ভাই টের পেল। একদিকন সিরাজ ভাই এক পেকেট আগরবাতী সুলেমান ভাইকে দিয়ে বলল ঃ

—ধর্ রে ধর, এইগুলি আইজ হ্যাঞ্জে (সন্ধ্যায়) জ্বালাইয়া 'মলুদ' পড়বি, দোয়া করবি হক্‌কেলের (সবার) লাইগ্যা আর বাংলাদেশের লাইগ্যা-ও।

সিরাজ ভাইয়ের এ কামনা আমাদের মনে বিপুল আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার করল। আমরা এইদিনই বাদ-মাগরিব আগরবাতি জ্বালিয়ে সাড়ম্বে মিলাদ পড়লাম। "মিলাদ" ও "দরূদ শরীফ" পাঠের কোরাস-লাহান সমস্ত ওয়ার্ডটিকে স্বর্গীয় সুর ও আমেজে তন্ময় করে তোলল। অবাক-বিস্ময়ে হিন্দুস্তানী বন্দীরা জড় হয়ে গেল আমাদের মাহফিলের চতুর্দিকে। ওরা সবাই বন্দী জীবনের একঘেয়েমী জড়তা ও বিস্বাদের মধ্যে পেল এক নূতন রূপ আর অফুরন্ত সূরের মুর্ছনা। আবিষ্কার করল অসীম সত্ত্বার সাথে তাদের এক অকৃত্রিম যোগসূত্র!

হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সবার সাথে এক গভীর আত্মীয়তা সৃষ্টি হয়েছিল আমার ও অন্যান্য পাকিস্তানীদের মধ্যে। বাড়ী ঘরের অভাব, পরিবার পরিজনের বিয়োগ

www.pathagar.com

ব্যথা এখন আর আগের মত মনে জেগে উঠে না। হৃদয়-মন বশীভূত হয়ে গেছে সিরাজ ভাই আর মহেন্দ্রদা'র জগতে। ছোটবেলায় আব্বা-আম্মা সন্তানদেরকে ধর্ম শিক্ষায় দীক্ষিত করলে বিপদে-আপদে এ শিক্ষা যে কত মূল্যবান সম্পদ হয়; এর মাধ্যমে শান্তি এবং সম্মান ও যে লাভ করা যায় ১নং ওয়ার্ড-এর প্রমাণ আমরা। আমাদের ওয়ার্ডটা উত্তর দক্ষিণে লম্বা প্রায় ৭০০ হাত। পশ্চিম দিকে সব নামাজী, পূর্বে বেনামাজিরা। সেদিন থেকে পশ্চিমাংশ হল নামাজের ও নামাজীর স্থান। সেদিন সিরাজ ভাইর আর এক চেহারা ফুটে উঠল। সেটা হল ঈমানদার সিরাজভাই; যা ছিল এতদিন সুপ্ত, অনাবিষ্কৃত।

আমাদের ওয়ার্ডে এখন নামাজ পুরোপুরি কায়েম হয়ে গেছে। প্রতি ওয়াক্ত নামাজে ৮০/৮২ জন নামাজী হয়। প্রতিদিন মাগরেবের পর মিলাদ পাঠ একটি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন ফজরের নামাজ-এর পর আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে মোনাজাত করে সবাই জেলের আজাব থেকে মুক্তির জন্যে।

পীর ছাহেবের জিন্দেগী

এমনি ভাবে আর এক ভাগ্যাহতের কথা।

—অ ভাই, আপনার বাড়িটা কোনখানে?

—হুহ! যা বেটা তোর কী দরকার আমার বাড়ি দিয়া?

নতুন অতিথি এসেছেন। উদোম গতর। মাথায় পট্টি। চোখ দুটো বড় বড় গোলাকৃতির। কট্‌মটিয়ে তাকান এদিক সেদিক। যেন কাউকে খোঁজছেন চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে।

ধাঁতানী ও ধমক দিয়ে জবাব দেন তিনি। তারপর "হায় আল্লাহ" বলে উপরের দিকে তাকিয়ে ডান হাত দিয়ে নিজের কপালে সজোরে আঘাত হানেন।

সুলেমান ভাই ও অন্যান্য আশেপাশের সবাই ভয় পেয়ে যায় তার এই আচরণে।

সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে এসেছে। অপরাহ্নেই নৈশ ভোজ পর্ব শেষ করে সন্ধ্যার কোলে আশ্রয় নিচ্ছিল ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। শাস্ত্রীদা লকের তালাগুলো টেনে ঝাঁকিয়ে পরখ করছিল চাবি ঘুরানোটা যথাযথ হয়েছে কি না। জমাদার বাবু তার ডিউটির শেষ চক্করটা সমাপ্ত করছিলেন ১নং ওয়ার্ডের বারান্দাটায় বুটের খটাস খটাস আওয়াজ তুলে আর হাতের লঠিটা দিয়ে লৌহ কপাটের মধ্যে চটাস চটাস আঘাত হেনে। সেকেন্ড গেইটে সান্ধ্য ঘণ্টাও বেজে উঠেছে একটি সূর্যমুখর ঝরা দিবসের বেদনা মূর্ত হয়ে।

হঠাৎ আচমকা আজান চকিত করে তুলল আমাকে, সুলেমান ভাই, ইমামুদ্দিন ও অন্যান্য সবাইকে। আজানের সুর সুন্দর নয়, তবে মাখরেজ আদায়ের নিখুঁত ও নিপুণতার পরিচয় রয়েছে।

—আরে, এই যে হেই লোকটা?

—হ্যাঁ তাইত দেখছি। সুলেমান ভাইয়ের কথায় সায় দেই।

অজু সেরে মাগরেবের নামাজে সবাই দাঁড়িয়ে গেল। লোকটি নিজেই ইমামতীর স্থানে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলেন।

চমক সৃষ্টি হল।

নামাজ শেষে আবার মিলাদ পাঠ হল। লোকটি মুনাজাত করালেন। তার মুনাজাতে সবাই কান্নায় ভেংগে পড়ল। গুনাহ মাফ আর মুক্তির উচ্ছল আবেদনই ছিল মুনাজাতের বিষয় বস্তু।

www.pathagar.com

নামাজ শেষে লোকটির পরিচয় পাওয়ার সুযোগ ঘটল অন্তরংগ পরিবেশের মাঝে।

—এ রে, দেচ্ছা, একটা বিড়ি আমারে।

তালেব আলী মিয়া একটি বিড়ি দিল তাকে। তর্জনী আর মধ্যমার সাহায্যে বিড়িটি চেপে ভীষণ জোরে ২/৩ টান দিয়েই সাবাড় করে ফেললেন তিনি। এরপর বলতে লাগলেন তার নিজরে হৃদয়চেরা কাহিনী ঃ

—আমারে তোরা জানসনা? আমি একজন বড় পীরছাহেব। শেখ ছাহেবের জন্যে আমি কত দোয়া করছি আল্লার দরবারে তার মুক্তি আর জয় বাংলার সৃষ্টির জন্যে। আমার এক একজন ভক্ত পাক আর্মীর এক একজন আজরাইল। পাকবাহিনীরা যখন ছতুরায় (পীর ছাহেবের বাড়ী, কুমিল্লার কসবা থানার একটি গ্রাম) প্রবেশ করল তখন আমি হিজরত করে হিন্দুস্থানে আসি আজ থেকে ৪ দিন আগে। আগরতলায় পৌঁছার পর পরই হিন্দুস্থানের চ্যাংরা যুবক ও জনসাধারণ পাকিস্তানের চর মনে করে আমায় পাকড়াও করল। মাথার পাগড়ী গায়ের আলখেল্লা সব কিছুই মারধোর করে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

ইয়া আল্লাহ, তুই এর বিচার করিস—চীৎকার করে উঠলেন তিনি। কিড়মিড় করে তাকালেন চতুর্দিকে। যেন তার অগ্নিক্ষরা দৃষ্টিতে সবাইকে এক্ষুণি ভস্মে পরিণত করে ফেলবেন। পীর সাহেবের এই বিকট চীৎকার ও মাঝে মাঝে হুম করে স্ফীত আওয়াজ তোলে। দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভংগীতে শ্রোতৃবৃন্দ তার প্রতি দয়ার্দ্র অপেক্ষা ভীত ও শংকিত হয়ে পড়ে।

—তালেব আলী কইরে, আর একটা বিড়ি দে। বিড়ির আগুন ধরাইয়্যা মনের আগুনটা জ্বালাই। একান্ত ভক্তি করে তালেব আলী মিয়া টেক থেকে বিড়ি খুলে দেয়। পীর ছাহেব পুণঃ বলতে থাকেন তার অব্যক্ত বেদনাসিক্ত কাহিনী ঃ

শ্যালার বেটারা লাথি জুতা মেরে আমায় অজ্ঞান করে দেয়। মাথা ফাটিয়ে পিঠের চামড়া ছিড়ে ফেলে গুঁতিয়ে। কতক্ষণ অচেতন ছিলাম জানিনা। জ্ঞান ফিরে এলে চোখ মেলে দেখলাম আমি জেলখানার হাসপাতালে আছি। আমার চুলদাড়ি কেটে মুড়ে অষুধ লাগান হল আহত স্থানগুলোতে।

পীর ছাহেবের নাম জনাব মুহাম্মদ আবুল খায়ের। কথা বার্তায় ও চালচলনে মনে হয় তিনি একজন খান্দানী পীর। হাত পা টিপান, বাতাস করান, উত্তম মসলাদার খানা খাওয়ানো ছিল তার মুরীদানের স্বাভাবিক কর্ম। তাছাড়া নজরানা আর তোহফায় তার সংসার সমৃদ্ধি ও আয়েশের জুলুসে ঠিকরিয়ে পড়ত। পীর ছাহেবের দেহতনুর নাদুসনুদুস শ্রী মুখমণ্ডলের তৈলাক্ততায় এর প্রমাণ সুস্পষ্ট। মেজাজ মর্জি অত্যন্ত কর্কশ ও কুশ্রী। হাঁসির আওয়াজ শুনলে মনে হয় কোন "ভিলেইন" নাটক করছে বুঝি। তাকে দেখে সেক্সপীয়রের শ্যাইলকের ছবি প্রতিবিম্বিত হয় মনের পর্দায়।

মুরীদ-সাগরেদদের ভক্তি ও কোরবানীর ফসলে পালিত পীর ছাহেব ১ নং ওয়ার্ডে প্রবেশ করে বড়ই অসহায় ও দুর্বল হয়ে পড়েন। পীরালী স্বভাবের চর্চিত অভ্যাসসমূহ মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠতে চায় চলনবলনে। কিন্তু লৌহ গারদের কঠোরতা আর হৃদয়হীন পরিবেশ ধীরে ধীরে পীরছাহেবের স্বার্থান্ধ পীরালীকে মোমের মত দুর্বল ও নগ্ন করে তোলে। তিনি অনুকম্পা প্রার্থী এখন। ছোট শিশুর মত স্নেহপিয়াসী হয়ে উঠেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর আর বদ্ মেজাজ এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভাগ্য ভাল ১নং

www.pathagar.com

ওয়ার্ডে জামাত প্রতিষ্ঠা হওয়ায়। জামাতের বরকতে পীর ছাহেব নামাজীদের সান্নিধ্য ও শ্রদ্ধা কুড়িয়ে জেলজীবনসাগরে ঠাঁই পেলেন।

পীর ছাহেবের দাম দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। তাঁর পেশাগত দক্ষতা ও স্বভাব পুনরায় শাপে বর হয়ে দেখা দিল। কয়েদী-হাজতীরা তাঁকে "পীর" জেনে ঝাড়-ফুঁক আর "কিছমতের" সওদার জন্যে ভীড় জমাতে লাগল। সোনারাম, গেঁদু, আব্দুর রহমান, এমনকি সিরাজভাইসহ সবাই পীর ছাহেবের দরবারে সকাল-দুপুর, বিকাল-সন্ধ্যায় ভীড় করতে লাগল।

—কইরে, তুই নাকি ভাল হাত দেখতে পারছ। আমার হাতটা একটু দেখছেন। সিরাজ ভাই এর বাম হাতটা স্বীয় কোলে টেনে এনে হাতের রেখা দেখতে থাকেন পীর ছাহেব। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ চাহনির ভংগীমায় মনে হচ্ছিল পীর ছাহেব একজন যা তা জ্যোতিষবীদ নন।

—বেশি দিন আর কষ্ট করণ লাগতনা। কয়েক বছরের মধ্যেই আপনার মুক্তি হইব। তবে ভাল কাজ কর্ম করলে ভবিষ্যত জীবনও আপনার সুন্দর অইব বইল্যা মনে হয়।

—নে ধর, এই বিড়ি দুইড্যা তোরে দিলাম। বালা কইর‍্যা দেখছেন; আমার ভাগ্যটা আল্লায় খুলবনি। আর আমার একটা মাত্র ফুত (পুত্র), তার কপালডাও আল্লায় বাল করবনি!

—হ, হ, ফুত একডাই দেখা যায় হাতের রেখায়। বড় বাল হে।

সিরাজ ভাই এর ব্যথিত চিত্তে শান্তির প্রলেপ দেন তিনি জ্যোতিষী প্যাঁচে। এ ধরনের বাকচাতুর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করে পীর ছাহেব ৮/১০ টা বিড়ি সিরাজ ভাইয়ের মন গলিয়ে আদায় করে নেন। তালেব আলীর কাছে ঘন-ঘন বিড়ি খাওয়ার ধর্ণা ধীরে ধীরে কমে যায় পীর ছাহেবের। পীর ছাহেব এখন শুধু ঝাঁড় ফুক আর হাত দেখার মুরুব্বীই নন, তিনি এখন রীতিমত একজন বিড়ির রাজাও।

পুর্বে উল্লেখ করেছিলাম জেলখানায় বিড়ির মূল্য কত। এক বিড়ি দিয়ে একখানা রুটি, তিন বিড়ি দিয়ে এক কাপ দুধ, ৪/৫ টা বিড়ি দিয়ে গা-হাত-পা টিপানোর সুযোগ আদায় করা যায়। বিড়ি জেলের কারেন্সী। এই কারেন্সীর অধিকারী যে, সে সম্রাটের মত প্রতাপশালীই বটে!

সেদিন জনৈক পূর্বপাকিস্তানী যুবক এই বিড়ির জন্যে কী-ই না মার খেয়েছিল। তার পাশের কয়েদীর বিছানা থেকে এক প্যাকেট বিড়ি চুরি করে ধরা পড়ায় শাস্ত্রী সুরেশদা রুলার দিয়ে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলেছিল তাকে। ঠিক অমনি ধরনের আর এক যুবক একটি বিড়ির জন্যে পায়খানা ও পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করেছিল আধ ঘন্টা যাবত। এই ছেলেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ২য় বর্ষ অনার্স। মুক্তি। "পাকিস্তানী চর" হিসেবে সন্দিগ্ধ হয়ে তাকে জেলে আসতে হয়েছে। সশস্ত্র সৈনিক এ যুবকটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে দুর্ধর্ষশত্রু মোকাবেলায় অসীম সাহসী, অথচ সামান্য বিড়ির নেশা তার এই সৈনিক মনটিকে এভাবে পরাভূত করেছে দেখে অবাক হলাম! নেশা পেশাকেও হার মানায়!

পীর ছাহেব মনে মনে খুব খুশী। বিড়ির আমদানীতে নিজের জেলজীবনের বন্দীত্ব অনেকটা ভুলে গেছেন। সেদিন সুরশদাও এসে জিজ্ঞেস করে ঃ

—পীর কে রে ওয়ার্ডে?

www.pathagar.com

—আমি স্যার। নমস্কারের ভংগীতে হাত দুটো কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে পীর ছাহেব জবাব দেন। নতুন মক্কেল জুটেছে দেখে আত্মপ্রাসাদ লাভ করেন তিনি।

—দেখ্ ত আমার হাতটা। তুই না কি ভাল গণক।

চোখ দুটো ছানাবড়া করে হাত পরীক্ষা করতে লাগলেন পীর সাহেব। মিনিট দুয়েক পর সুরেশদার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

—শাস্ত্রীদা, এক পেকেট লোবান, দুইটা মোম বাতি আর এক মুট কড্ডা বালু লাগব। আইজ সন্ধ্যায় এই গুলি দিয়া যাইবেন। কাইল সন্ধ্যায় আবার ডিউটিতে আইলে আপনের হাত গইন্যা দিমু।

সুরেশদার ভক্তি বেড়ে গেল পীর সাহেবের প্রতি। সন্ধ্যার সময় 'হাত গণনার' মালমসলা সবই আনা হল। এক পেকেটে বিড়ি আর দুটো রুটি পীর ছাহেব তোহফা হিসেবে লাভ করলেন সুরেশদার নিকট থেকে।

জেলখানার অধিকাংশ লোকই চরিত্রহীন এবং পাপাসক্ত। এই স্থানে এসেই সচেতন প্রতিটি পাপী নিজের পাপ কর্মের অনুশোচনা করার উৎকৃষ্ট সময় ও সুযোগ পেয়ে থাকে। বাড়ী-ঘর, জোত-জমি, স্ত্রী-সংসার সব কিছুরই মোহমুক্তি এখানে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়। ফলে অনুশোচনার পূত অনলে বিদগ্ধ প্রত্যেক পাপাসক্ত তার স্বীয় কর্মফলের ভয়াবহ পরিণাম তীব্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। অনুশোচনার অগ্নিদাহনে বেচইন আত্মার শান্তি ও আশ্বাস খুঁজে বেড়ায় পাপিষ্ঠরা জেল জগতের গণক, জ্যোতিষদের কাছে, পীর আর সাধুদের সান্নিধ্য ও ধর্মোপদেশে। 'ধর্ম' আত্মার আত্মীয়। জেলজীবন এবং হাসপাতালেও এ উপলব্ধি ঘটে বিবেকজাগ্রতদের চেতনা জগতে।

সুরেশদা শাস্ত্রী। তিনিও পাপকর্ম কম করেননি জীবনে। যৌবন বয়সে আনকোরা বহু কুমারীর সতীত্ব লুটেছেন লাগামহীনভাবে। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে লাম্পট্য অভিযোগে কয়েদী হওয়ার দুর্ভাগ্য তার হয়নি বটে, তবে দাম্পত্য জীবনে এই চরিত্রহীনতার বিষক্রিয়া তাকে জর্জরিত করে রেখেছে। নিজের স্ত্রীর সতীত্বের প্রতি সন্দেহ, ওর বদ মেজাজ ও কর্তৃত্ব সুরেশদার সুখের সংসারকে নরককুণ্ডে পরিণত করে রেখেছে। সুরেশদার কপাল আরও খারাপ। চাকুরীত পেল বটে তাও আবার জেলখানায়, যেখানে তারই মত বহু নষ্ট চরিত্র, লম্পট পাপের প্রায়চিত্ত করছে কঠিন সাজা বরন করে। ওরা কত সুখী, ওদের পাপ স্খালন হচ্ছে জেল খেটে, রুলার-বুটের গুঁতো খেয়ে! কী আশ্চর্য, লম্পট সুরেশদা এদের দণ্ডমুণ্ডের খবরদারীর কর্তা!

দণ্ড শুধু লজ্জা ও শাস্তি নয়, এটি পাপস্খালন ও আত্মার প্রশান্তিও। সুরেশদা দণ্ডমুক্ত থেকে বস্তুত মহাদণ্ড ভোগছেন মহাপ্রভুর ইশারায়। তিনি আর তার অন্তর্যামীর মধ্যেই এটা এতদিন সীমিত ও অদৃশ্য ছিল। এখন পীর সাহেবের বদৌলতে আমরা সুরেশদার এহেন চরিত্র জেনেছি। পাপ কোনদিনই গোপনীয় থাকে না। সুরেশদা এর আনকোড়া প্রমাণ। গণকেরে হাত দেখানোর কুফলটি কি তা-ও সুরেশদা শিখিয়ে গেছেন।

সুরেশদা পাপস্খালন করতে চায় দোষ স্বীকার করে বা জেলী হয়ে নয়, বরং হাতের রেখার ছত্রে-ছত্রে মুক্তির পথ খোঁজে, নিরিবিলি ভদ্রলোকের লেবাস এঁটে, মান সম্ভ্রম বজায় রেখে। তাই তিনি পীর ছাহেবের শুভ ভবিষ্যত বাণীর প্রত্যাশী।

পীর ছাহেব টের পেলেন সুরেশদার মনের অবস্থা। একাধিক মাত্রা বিশিষ্ট মনোহারিনী মন্তব্য করে তিনি অনুতপ্ত সুরেশদাকে শীতল সান্ত্বনা দেন। এভাবে তিনি নিজের বিড়ি ও রুটির বাড়তি স্বার্থটুকু বহাল রাখেন একনিষ্ঠভাবে।

www.pathagar.com

একদিন জিজ্ঞেস করি ঃ

—পীর সা'ব, মোম বাতি, লোবান আর কড্ডা বালি হাত গণনার ক্ষেত্রে কি কাজে আসে?

—ধ্যাৎ বোকা, ঐগুলো ত হইছে বিশ্বাস ও ভক্তি সৃষ্টির শ্রেফ উপকরণ। আসলে কী ছাই হাত গণা জানি আমি! শুধু শুধু অবসর সময় কাটে না, পেটের ক্ষুদা দুই রুটিতে মিটে না, বিড়ির নেশাটাও যায় না,—এসব অসুবিধা কাটানোর লাইগ্যাইত আমি গণক সাজছি। নে ধর, বিড়ি ধরা একটা। তিনি হে-হে করে হাসেন। তার নয়ন যুগলে প্রতিবিম্বিত হয় চাতুর্যের কায়া।

ব্যাপারটা বুঝে নিলাম। বিড়ি দিয়ে আমাকে বশে রাখেন পীর ছাহেব। এমনিভাবে বশে রাখেন তিনি তালেব আলী, সুলেমান ভাই ও অন্যদেরকে।

অতি ভক্তিতে চোরের লক্ষণ, অতি কথা মূর্খতা, পীর ছাহেব এই দুটো নীতিমালা ভুলে যান। ধীরে ধীরে তার হাত গণনার ভণ্ডামী আর ইমামতীর মেকী ব্যক্তিত্ব গতিশীল সময়ের ক্ষুরধারে ক্ষয় পেয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়। এ ভণিতা জেলার বাবু ও জেল সুপারের নিকট পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। ৫৪নং ধারার আসামী পীর আবুল খায়েরকে গুপ্তচর বৃত্তির একজন ঝুনা চর হিসাবে অভিযুক্ত করে পুলিশকোর্টে মামলাও দায়ের করা হয়।

কে বা কারা পীর ছাহেবের নসীব মন্দ করল তা জানা যায়নি। জেলখানার বাসিন্দাদের কার্যকলাপের রিপোর্ট জেল কর্তৃপক্ষকে প্রদানের জন্যে অনেক সরকারী চর জেলখানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে রব উঠে। সংগে সংগে আমি ও আমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধব এরপর থেকে কথা-বার্তায় অনেকটা সংযমী হই ও সতর্কতা বজায় রেখে চলতে থাকি। এতদিনের মানসিক ধর্য ও সাধনায় অর্জিত আমাদের মনের শান্তি সরকারী চরের ভয়ে নিমেষে লীন হয়ে যায়।

কফিলদ্দিনের ক্যারেকটর

সুলেমান ভাই নাছোড় বান্দা।

একদিন কফিলদ্দি মিঞাকে জোঁকের মত ধরল। সে বনেদী ভিক্ষুক, বয়স ৮০ এর কোঠায়। দন্তবিহীণ মুখ, ভাঁজ পড়া কপাল। কুঁচকানো দেহের চর্ম যেটির রং ঘন শ্যামল। চোখ দুটো চকচক্ করে। গুঁ-মেরে বসে থাকে সে। বাড়ী নোয়াখালি। নিজেকে বড় বুদ্ধিমান ঠাওরায়।

—হারিকেনে না ভোট টা দিচ্ছ? তুমি মুসলিম লীগার না?

—হ-হ, তুমি ত বালঅ জান দেহি! আমরা সবাই আম্‌লীগ মিয়া। সব নৌকায় ভোট দিছি। মাথা চুলকায়, নাক-খুঁটে, পরিধেয় লুংগী ঝাড়া দিয়ে কফিলদ্দি মিঞা উত্তর দেয়।

—এই ত বেশ, এখন যাইবা কই? আলেমরা না কইছে যে ভোট দিলে ইসলামী দলের দিতে অইব মিয়া? তুমি মিয়া ধর্ম-ছাড়া দলরে দিলা; মরলে বুঝবা আল্লায় তোমারে কি শাস্তিই-না দেয়! সব আলেমে ভোট দিছে হারিকেনে, নইলে পাল্লায়,—আর মিয়া তুমি এই ডা করলা কি?

সুলেমান মিয়ার গম্ভীর স্বর আর মুরুব্বিয়ানা চাহনিতে কফিলদ্দি মিয়া ফিক করে হেসে উঠে। দাড়ি দুটোতে হাত নেড়ে চেড়ে বলে ঃ

-আরে মিয়া, আসল কথাটা এইবার তাহলে ভাইংগা কই, হুন। দাড়ি দেখলেই হেরা মনে করে মুছলিম লীগ; আর মারে খুইব। এই ডরে আমি আমলীগ্ কইছি জানটা বাঁচানের লাইগা।

www.pathagar.com

—হু। তাহলে ভোটটা করে দিলা?

—হারিকেনে দিছি। আমার ফুতে দিছে দাড়ি ফাল্লায়।

—অ বুড়া, তুমি বড় চালাক দেখছি? বাপ-ফুতে দুই দলে শামিল অইছ; যে দলেই জিতুক না ক্যান তোমরা ত একটা না একটায় থাকবাই! বুড়া খিল্ খিলিয়ে হাসে আর বাঁহাতে তার নাকের পশম টেনে টেনে তোলার অভ্যাসটা আপন গতিতে চলতে থাকে।

লক্ষ্মীপূজায় আগরতলা

লক্ষ্মী পূজা ঘনিয়ে এল। ঢোল নাকড়ার শব্দ বাইরের জগত থেকে জেলখানার সীমানায় অনুপ্রবেশ করছে বাতাসের ডানায় ভর করে। সমস্ত আগরতলা আহলাদে আটখানা বটে!

নতুন মেহমান পাঁচটি যুবক সন্ধ্যায় এসেছে ১নং ওয়ার্ডে। এদের বয়স ১২/১৪ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। এদের দুজন মদ পানের নেশায় মাতলামী করাতে, দুজন নারী ঘটিত কুকাজে লিপ্ত হওয়ায়, অপর জন সিনেমার টিকেট কালোবাজারী করার দায়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পাঁচজনই শহুরে। চরিত্র সংশোধনের জন্যে এদেরকে পাঠানো হয়েছে ১নং ওয়ার্ডে। সবাই স্কুল-কলেজের ছাত্র। লক্ষ্মী পূজার আনন্দে উন্মত্ত হয়ে এসব অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছিল এরা।

পূজা এলেই আগরতলায় পুলিশ বাহিনী উদ্বিগ্ন ও কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। কোথায় কোন ছোক্‌রা যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করে ফেলে, কোথায় মদ খেয়ে চুর থেকে কোন মাতাল বাড়ীঘরে প্রবেশ করে শ্লীলতাহানী করে, অথবা কোথায় কোন চাকর মনিবের স্বর্ণালংকার ও তৈজসপত্র চুরি করে পূজার হৈ হুল্লোরে গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে—এসব চিন্তা ও উদ্বেগের মানসিক চাপে পুলিশ বিভাগ সদা তটস্থ হয়ে থাকে। পূজা-পার্বণ পুলিশের জন্যে পূণ্যময়ী না হয়ে অভিশাপ হিসাবে হাজিরা দেয়।

লক্ষ্মী পূজার সময় আরো অপরাধীর আমদানী হতে লাগল। বটতলী, সেই বটতলী যেখানে আমরা গণপিটুনি খেয়েছি সেখান থেকে পাকড়াও করে এনেছে এক বুড়ো ও তার পুত্র বধূকে। আমার দেহ মন ভয়ে কাঁটা-কাঁটা হয়ে ওঠে। বটতলীর জনগণ বড়ই বদমেজাজী ও মুসলিম বিদ্বেষী। ওখানেই ত আমি আর রবিউল্যা ভাইসহ চারজন কাবুলীওয়ালা বেদম মার খেয়েছিলাম। বুড়ো আর তার পুত্রবধূ কি ব্যাপার ঘটাল সেখানে? খোঁজ নেই চুপি চুপি। মেট সুধীর আর অনন্তের প্রগলভতা থেকে আসল ঘটনাটি উদ্ধার করি। আমার সর্ব দেহ ঘৃণায় রী রী করে উঠে। এমন গর্হিত কাজও চলে এই সভ্য দুনিয়ায়?

বুড়োর বয়স ষাট পেরিয়েছে। ছেলেকে বিয়ে করিয়েছে বছর দুয়েক হল। অপরূপা সুন্দরী। কচি মুখ, নিটোল স্বাস্থ্য। মেঘ বরণ কেশ তার। ছেলে বিদেশে গেছে বছর খানেক হল। সে জাহাজের এক কোম্পানীতে কাজ করে। ইত্যবসরে ঘটনা ঘটে। কেলেংকারীর ঘটনা। শ্বশুর এ সুযোগে পুত্র বধূর সাথে যৌন সম্ভোগ করেছে। ছি, ছি, এমন কথা, এমন মামলা কখনও ঘটেছে এই দুনিয়ায়? জয়, ফ্রয়েডীয়ান ফিলসফির জয়! শ'এর কথায় ম্যারেজ একটি নিছক "লিগ্যাল প্রসটিটিউশন"-ই বটে। সভ্য (?) ইংল্যাণ্ড আমেরীকায় পারস্পরিক সম্মতিতে যৌন সম্ভোগে মামলা দায়ের হয় না। সমাজেরও এতে মাথা ব্যথা নেই। এমকি সমকামিতার ক্ষেত্রও। ভারতেও তেমনটি হচ্ছে!

www.pathagar.com

মনে পড়ে জমাদার বাবু ক্ষীতিশের কথাটা। সেদিন দুপুরে জমাদার বাবু বলছিলেন রবিউল্যাহ ভাইকেঃ শ্যালারা কত তাগড়া হয়েছ বাংলার দুধ-মাছ-মাংস খেয়ে। ভগবানের কৃপায় "জয়বাংলা" হয়ে গেলে আমাদের নাড়েও (পেটে) দুধ-কলা-মাছ-মাংস জুটবে। সিঁদল (যুটকী) আর মেয়ে মানুষ ছাড়া আগরতলায় আর কিছুই সস্তা পাওয়া যায় নারে!

রবিউল্যাহ ভাইয়ের সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুঠাম গঠন ক্ষীতিশ বাবুর ঈর্ষা জাগায়। ক্ষীতিশ বাবু হেংলা লিক্‌লিকে। তালপাতার আদর্শ সেপাই বটে। যশোরে কইয়ের মত মাথাটা বিরাট আর দেহখানি এতটুকুন। সিঁদল খেয়ে খেয়ে ক্ষীতিশ বাবু যুটকীই হয়ে গেছেন। রবিউল্যাহ ভাইকে বেদম প্রহার করান এই ক্ষীতিশ বাবুই। ইদানীং তার হিংসার প্রখরতা পূর্বের মত নেই।

ঝিমানো দুপুরে ক্ষীতিশ বাবু আসেন রবিউল্যাহ ভাইয়ের কাছে গালগল্প করে, ডিউটির একঘেঁয়েমী কাটান রবি ভাইয়ের সহবতে।

—দেখ রে রবি, তোগ দেশ ধন-ধানে ভরা। তোরা অতিথি এলে মাছ-মুরগী কিনে আপ্যায়ন করিস। বিশেষ করে মেঘনার ইলিশ ত এমনিতেই খাসা, তাই না? আর আমরা বুজুরী (ছোট টেংরা মাছ) খাওয়াতে পারলেই মনে করি আমাদের অতিথির ভাগ্য পোয়াবারো। রবিউল্যা ভাই হাসে। জমাদার বাবুকে একটা বিড়ি দেয়, নিজেও একটা ধরিয়ে তৃপ্তি ভরে টান দিয়ে বলে ঃ বাবু, ভগবানের কৃপায় খাওয়া-দাওয়ায় খুব সুখে আছিলাম দেশে। মাছ-মাংস ত আমাদের দৈনিক না খেলে পেটের ভাতই হজম হইতে চায় না। আর এর মধ্যি যদি কোন মেমান আইস্যা পরে তো কোন কথাই নাই। পোলাও-কোর্মা, ফিরনী-পায়েসে ঈদের-উৎসব হয় আমাগো ঘরে।

ক্ষীতিশ বাবুর জিহ্বায় লালা এসে যায়।

—রবি, যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তবে তোর বাড়ীতে আমি যামুরে। কি খাওয়াবী ক'ত? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাধে কি হিন্দুস্তান বাংলাদেশ স্বাধীন করতে চায়? দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এখনই যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদরাজী আগরতলায় পুঞ্জিভূত হয়েছে এর হিসাব বেশুমার। আর স্বাধীন হলে ত গোটা পূর্ব-পাকিস্তানই ক্ষীতিশ বাবুর মত লোকেরা গো গ্রাসে গিলে ফেলবে!

বর্তমানে জেলখানায় যেসব চাল খেতে দিচ্ছে সবই ত পূর্ব-পাকিস্তানের খাদ্য গুদাম থেকে লুট করে আনা। সেদিন ক্ষীতিশ বাবুর পকেটে স্টার সিগারেটের প্যাকেটটি কি শোভাই না পাচ্ছিল। কাঞ্চন আর কামিনী সম্ভোগ আগরতলার নৈতিক বাঁধন শিথিল করে দিয়েছে, সমাজ জীবনে ডেকে এনেছে উচ্ছৃঙ্খলতার ভয়াবহ বন্যা। নইলে এমন পাপাসক্ত শ্বশুর-ও মনুষ্য সমাজে পরিদৃশ্য হয়?

পাপী আর পাপের প্রতিবিম্বন সাগর ১নং ওয়ার্ডটা। ইমামদ্দিনের মত ছেলেও হারিয়ে ফেলল তার নৈতিক বাঁধন। বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায়ও উচ্ছন্নে গেল! মন্দ না, ভালই লাগল এসব ঘটনা জেনে। কারণ আগরতলা জেলখানা ত জেলখানই নয়, বরং এটা আগরতলা সামাজের নৈতিক চরিত্র পরিমাপের ব্যারমিটার-ও! এটা আগরতলা সমাজের নিকষ দর্পন! অবশ্যি সব দেশের জেলখানার বেলায়ও এই উপসংহার প্রযোজ্য।

—সুলেমান ভাই, অ সুলেমান ভাই, কোন চিন্তা নেই আমাদের। আমরা অচীরেই মুক্তি পেয়ে যাব।

www.pathagar.com

—কেমনে, কি কইর‍্যা বুঝলা তুমি?

আমার কথায় সুলেমান ভাই অবাক হয়ে যায়।

—এইটাত সোজা কথা। যে দেশে ছেলে-বুড়ো নারী ধর্ষণের অপরাধে জেল খাটে, যেদেশে মদ আর ব্যভিচার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, যেদেশের স্কুল-কলেজ পড়ুয়া কচি ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত চরিত্রহীনকাজে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণে বন্দী হয়, সে দেশের লোক কিভাবে আমাদেরকে বিনা অপরাধে আটকিয়ে রাখবে? সুলেমান ভাই-এর মুখে ফুটে উঠে মলিন হাসি।

—সত্যই কি তা-ই? আমার কথার বাস্তবতাতে ভরসা পায় সুলেমান ভাই। তার চেহারাটা তো তাই বলছে মনে হল।

সন্ধ্যা জনজমাট হয়ে নাঁবল ১ নং ওয়ার্ডের আংগীনায়। কয়েদীরা ঢুকছে লক-আপে। ওদের একজন এক বালতী মিষ্টান্ন নিয়ে এল। শসা-আনারস আর পাকা পেপের কুচি-কুচি টুকরো দই আর চিনি দিয়ে মাখা। হাত পেতে সবাই নিল একটু একটু করে। এ বদন্যতায় দিব্যিজ্ঞান হল লক্ষ্মীপূজার "পরসাদ" -এর মোড়কে জেলখানায় ভগবানও দর্শন দেন!

শাহাদাত হোসেন : মিষ্টিরীয়াস ফিগার

কিছুদিন পর আর একজন অতিথির আগমন ঘটে আমাদের ওয়ার্ডে। কসবা কুটি অঞ্চলের শাহাদাত হোসেন। একটা মিষ্টেরীয়াস ফীগার বলে মনে হয় তাকে। সে নিজের পরিচয় দেয় স্কুল শিক্ষক হিসেবে, কসবার কুটি হাইস্কুলের। জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক পরিবার পরিজনকে ফেলে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায়। শাহাদাত হোসেন এই ভদ্রলোকের স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র স্বজনকে কসবা থেকে আগরতলায় পৌঁছিয়ে দেয়ার নৈতিক দায়িত্বটুকু পালন করে 'ভ্রাতা' হিসেবে। আগরতলার ত্রাণ-শিবিরে সে তাদেরকে নিয়ে উঠে। শরণার্থী হিসেবে দুদিন কাটানোর পর রেশন কার্ড করতে গিয়েই শাহাদাত হোসেনের উপর বিপদ নিপতিত হয়। শিবিরের রেশন অফিসার শাহাদাতকে মুসলমান আর বাকী সদস্যদেরকে হিন্দু দেখে সন্দেহ করে। "বদমায়েশ" হিসেবে সন্দেহ করে তাকে খুব নির্যাতন করে। নির্যাতনে তার মাথার খুলির সম্মুখ ভাগ ফেটে যায়।

সে বলে ঃ ভাই, বিশাল ঘরে ছিলাম দুদিন। এখানকার হিন্দুরা বড়ই মুসলিম বিদ্বেষী। অনেক মুসলমান শরণার্থীকে ওরা বলি দিয়েছে "জয় বাংলার" প্রতি মা-কালীর প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করার জন্য।

—এ্যাঁ, বল কী? সুলেমান ভাই ও আমরা সবাই আঁতকে উঠি।

দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে শাহাদত আরও বলে ঃ

—কছম খোদার, যুবক-মুসলমানকে ধরে ধরে ওরা যে কোথায় নিয়ে যায় তার কোন খবরই নেই।

—যুবকদেরকে নিয়ে ওদের লাভ? প্রশ্ন করলাম।

—জানেন না, যুবকসম্প্রদায়ই ত বিপদ। ওদের শৌর্য বীর্য, শক্তি-সাহস একই সংগে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান ফৌজের জন্যে বিপদজনক। এই জন্যে বাংলার তেজোদীপ্ত যুবকসম্প্রদায় হিন্দু ও পাঞ্জাবী যাদের হাতেই পড় ক না কেন ওদের সহজে রক্ষা নেই!

—চুপ্ চুপ্, রথীনদা আসছে এদিকে। আমার হুঁসীয়ারীতে শাহাদত ও অন্যান্য সবাই নীরব হয়ে যায়। কফিলদ্দি মিয়ার হাসি মুখখানা শাহাদতের কথা শুনে ফ্যাকাশে ও বিবর্ণ

www.pathagar.com

রূপ ধরে। কফিলদ্দি মিয়া নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ওর বুকের হাড় আধ ইঞ্চি করে উঠানামা করছে শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুত গতিতে। রথীনদা এক চক্কর দিয়ে গেল আমাদের পাশ দিয়ে।

শাহাদত আবার বলতে লাগল ঃ

—হিন্দুরা মুসলিম বিদ্বেষী, বিশেষ করে আগরতলার হিন্দুরা। ওরা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে দেখলেই হিংস্র বাঘের মত আক্রমণ করতে চায়। যদি জেল থেকে বেরুতে পারি তাহলে একবার শ্যালাগরে দেখাতাম "বরাক বাঁশের" গাঁট কাকে বলে।

দেখেন ত হারামজাদারার কাণ্ডটা! পাঞ্জাবীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে হিন্দু পরিবারটা বাঁচিয়ে আনলাম, সে হিন্দু পরিবারের লোকেরাই শেষ পর্যন্ত আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দিল!

কত কথা, কত ক্ষোভ শাহাদতের মনে। শুধু পারেনা কিছু করতে ঐ লোহার শিকগুলোর জন্যে।

ইয়ে গাদ্দার হ্যায়

পরের দিন সকাল বেলায় আমার বিছানার মাথার কাছে জানালার লোহার শিক ধরে কে একজন দাঁড়াল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর গোঁফ রয়েছে তার মুখমণ্ডলে। পরনে কয়েদী পোশাক। উর্দূতে বলে উঠে ফিস ফিসিয়ে ঃ

—তোম্‌রা বহুত বদনসীব। আল্লাপাক পরওয়ারদেগার কো ডাকো। অহি মনজুর করেগা তোমারা দিল কি আরজু।

—ভাইয়া, আপ কোন হ্যায়?

—হাম আবদুল খালেক। উনিশশ পয়ষট্টি ছাল মে ঝং কি ওয়াক্ত হিন্দুস্থানকী আর্মি হামকো পাকাড়লিয়া। হ্যাম আখাউড়া বর্ডারকি ই.পি.আর.থা। আজ ছ-বরছ গুজার গিয়া। হ্যাম জ্যান্তা নেহী হামরা বাল-বাচ্চা কি কেয়া খবর হ্যায়!

আবদুল খালেকের চোখ দুটো ছলছল করে উঠে ছেলেমেয়ে স্ত্রীর বিচ্ছেদ বেদনায়। উজ্জ্বল চেহারা তার ছাই বরণ হয়ে যায়। বাড়ী পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে। দুদিন পরেই তাকে মুক্তি দেয়ার কথা! সিকিউরিটি আক্ট এ সে বন্দী হয়েছিল।

দুদিন কেটে গেল। আবদুল খালেক আজ দেশে ফিরবে। কয়েদী পোশাক পাল্টিয়ে ছ-বছর পুরানো ই.পি.আর.এর পোষাক পরিধান করেছে আবদুল খালেক। প্রত্যেক সহকয়েদী থেকে সে বিদায় নিল প্রাণ খোলা হাসি আর কথা কয়ে। দেশে যাবে, ছেলে মেয়ে স্ত্রীর সাথে নতুন করে সাক্ষাতের সোনালি স্বপ্ন তার মনমগজে।

দু নম্বর গেট পার হয়ে এক নম্বর অতিক্রম করে আবদুল খালেক যে মাত্র বাইরের জগতে পা দিল, অমনি তাকে এম.আই.এস. (মেইনটিনেন্স অব ইন্টারনাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট) এ আবার গ্রেপ্তার করা হল। ফিরে আসল ১নং ওয়ার্ডের চত্বরে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য ফের বন্দী হল সে।

—ইয়ে ব্যাইমান কওম। ইয়ে গাদ্দার হ্যায়। ঝুট বাত বলকে হামকো বহুত পেরেশান করদিয়া। রাগে আবদুল খালেক ফেটে পড়ে। শান্ত্রী রুলার দিয়ে বেদম পিটিয়ে বুট দিয়ে লাথি মেরে তাকে নিয়ে যায় ৬ নং ওয়ার্ডে।

দুদিন পর। জেলখানায় থমথমে আবহাওয়া। সিভিল সার্জন, এস.পি., ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন জেলে। জেলার বাবুর মুখ গম্ভীর। ক্ষীতিশ বাবুর জমাদারী ভাব নেই চেহারায়।

www.pathagar.com

সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি 'লাশ' ১নং ওয়ার্ডের উঠোন দিয়ে হাসপাতালে নেয়া হল। ঘন্টা আধেকপর তা আবার নিয়ে গেল অন্য এক ওয়ার্ডে।

আবদুল খালেককে শিকার করা হয়েছে। পোস্টমর্টম করার পর তার লাশ জেলখানায় পুঁতে রাখা হয়েছে। আবদুল খালেক দেশের বাড়ীতে ফিরতে পারল না। নিশ্চয়ই তার ছেলে-মেয়ে স্ত্রী আত্মীয় স্বজন আজও বসে রয়েচে তার ফেরত পথের দিকে চেয়ে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম আবদুল খালেকের এহেন শাহাদাতে।

প্রদীপ বাবুর প্রণয় কাব্য

বিশ্বের সব প্রাণীই ঘুমায়। দিবা-রাত্রি সৃষ্টি হয়েছে পর্যায়ক্রমে কাজ এবং ঘুম আর বিশ্রামের জন্যে। পশু-পাখী-কীট-পতংগ, উদ্ভিদ এমন কি জড় জগতও ঘুমায়, বিশ্রাম নেয় রাত্রির আবরণে, দুপুরের অলস মুহূর্তে। কিন্তু এই পাষাণ পুরী? এর ঘুম নেই। গদা গদা লোহার শিকগুলো, শান্ত্রীর চাবির গুচ্ছের ঝন্‌ঝনি, বুটের খটাখট আওয়াজ, ঢং ঢং ঘন্টা পেটার ধ্বনি, সর্দার আর মেটের ফাইল ও এক দুই গুণতির স্বর-ধ্বনি, সার্চলাইটের ঘুর্ণী, জমাদার বাবুর হাঁক-ডাক; সব মিলে চরকীর মত ঘুর্‌ঘুর্‌ অবিশ্রান্ত ঘুরছে জেলরাজ্য। মেয়েদের ওয়ার্ড থেকে অহরহ ভেসে আসছে চুল টানাটানি, থালা-বাটি নিয়ে তরি-তরকারীর কাড়াকাড়ির সোরগোল।

"Oh lif me as a wave, as a leaf, as a cloud,
I fall upon the thorns of life, I bleed."

—কবি কীটসের ODE TO THE WEST WIND কবিতার আবৃত্তি করে যাচ্ছেন প্রদীপ বাবু। ঠিক ইংল্যাণ্ডের জাতকবির কণ্ঠস্বরের মত তার কণ্ঠটি! তিনি ভদ্রপাগল। জোরজুলুম কারো 'পরে করেন না। শুধু বিড়বিড় করেন। কখনওবা ইংরেজী গানের সুরে Shelley, Keats, Shakespeare কে আবৃত্তি করে যাচ্ছেন আপন মনে। ওদের কবিতার রাজ্যে প্রদীপবাবু ডুবে থাকেন দিন রাত। ১নং ওয়ার্ডটা তার class room; এর বাসিন্দারা তাঁর ইংরেজী ক্লাসের ছাত্র। মাঝে মাঝে হাসপাতালের মেট অবিনাশ আসে তার সেবার শুশ্রূষার জন্যে। ছোট শিশুটির মত নাস্তা খাইয়ে যায়। কাপড় পালটিয়ে সাজিয়ে তোলে প্রদীপ বাবুকে।

—স্যার, এই ধরুন। দুধটুকু খেয়ে নিন।

—No, no. It can't be, She is my love, I am for thee Binu.

প্রদীপ বাবু নতুন এসেছেন ১নং ওয়ার্ডে। লেখাপড়ায় এম.এ. ইংরেজীতে। পেশায় অধ্যাপক। বছর দুয়েক হল মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। মা-বাবা বাড়ীতে আর কন্ট্রোল করতে পারছেন না বলে অবশেষে আমাদের ওয়ার্ডে পাঠান।

মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ সম্পর্কে সর্দার সিরাজ ভাই থেকে যে তথ্যটুকু পাওয়া যায় তা প্রণয় ঘটিত। জাতের বৈষম্যে প্রদীপ বাবু বিনু মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারেননি। বিনু কায়স্থ বংশোদ্ভুদা। প্রদীপ বাবু দাস শ্রেণীভুক্ত। ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাস করা সত্ত্বেও জাতের কলংক তিনি অপনোদন করতে পারেন নি। রাষ্ট্রীয়ভাবে তথা সংবিধানে হিন্দুস্থান ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও প্রদীপ বাবুর প্রণয়কে সার্থক রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত সরকার জাত অনিরপেক্ষতার কারণে।

www.pathagar.com

ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে প্রদীপ বাবু তুখোড় ছিলেন। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন ফাইনালে। মনের মুকুরে বিনাসেনের ছায়াপাত না ঘটলে হয়ত ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতেন তিনি। প্রদীপের বাবার রটনা এটা। 'ঘটনা' হিসেবে এটা কতটুকু সত্য বলা মুস্কিল। লোকে বলে ঃ বিনু জাত খুঁইয়ে বিয়ে করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সমাজ তা হতে দেয়নি। প্রদীপ বাবু রিস্ক নিতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছেন চরমভাবে সমাজপতিদের কাছে। এই আঘাত এবং বিনু-বিচ্ছেদের শোকে তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।

বাবা চোখে শর্ষেফুল দেখেন। তার এম. এ. পাস ছেলে এখন বদ্ধ উন্মাদ, পাগল প্রায়। এক পয়সাও মূল্য নেই এখন তার সন্তানের। কত আশা ছিল সুশিক্ষিত সন্তানকে বিয়েথা করিয়ে বিরাট অংকের পণ আদায় করবেন। বেহাইএর বাড়ী থেকে। এখন সেটা থাক দূরের কথা, নিজের গাঁটের পয়সা দেদার খরচ হচ্ছে "নয়ন মনির" জীবন প্রদীপ টিকিয়ে রাখতে।

টাইটা কালো, ফুল সার্টটা বাদামী। ফুল প্যান্ট ফ্যাকাসে খয়রী রং এর। ফিতাওয়ালা কালো জুতো পরিধেয় প্রদীপ বাবু দিনরাত বিড় বিড় করে ধীরপদে বেড়ান ওয়ার্ডের এমাথা ওমাথা। সবাই তাকে সমীহ করে।

মাস্টার ডিগ্রী লব্ধ প্রদীপ বাবু অবুঝ, অক্রিয়াশীল। তার ২৫/৩০ বছরের উজ্জ্বল কান্তি 'মাদা' হয়ে গেছে। চোখ দুটোতে কালো ছায়া, গণ্ডদ্বয় ফ্যাকাশে। লম্বায় তিনি সাড়ে চার ফুটের মত। অনিয়ম ও অনাহারে নুব্জ হয়ে পড়েছে শিরদাঁড়া। বড্ড মায়া জাগে তাকে দেখলে। প্রদীপ বাবু হার্মলেছ ইনসেইনঃ বিপদমুক্ত উন্মাদ। তাই তাকে ভালবাসে সবাই।

"Then dearest maiden move along this shade with gentle hand touch, for there is a spirit in the wood". William Wordswarth এর Nutting কবিতা আওড়ান। কখনও বা P. B. Shelly-এর নিম্ন চরণ কয়টি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করেন সুললিত তথা—melodious tune-এ

—We look before and after
And pine for what is not,
Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought.

বিনাসেনের বিচ্ছেদ-জ্বালায় লালচে তাপ ফুটে উঠে তার উজ্জ্বল রং-এর চেহারায়। প্রদীপ বাবুর মামা-মা আসেন জেল গেটে। সুস্বাদু খাবার, ফল-মূল, সাবান, তৈল দিয়ে যান সন্তানের জন্যে। কার জিনিষ কে ভোগ করে! প্রদীপ বাবু এসব খানা খান না, প্রসাধনী ব্যবহার করেন না। এ সবের সদ্ব্যবহার করে জেলের কর্মচারীবৃন্দ। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। Man proposes, God disposes : মানুষভাবে এক, ভগবান করেন আর; প্রদীপ বাবু এর জ্যান্ত দৃষ্টান্ত।

বাবা-মা কত কষ্ট করে এম. এ পাস করালেন প্রফেসারীর উদ্দেশ্যে, মান-মর্যাদার মর্গে আরোহণের জন্যে। সেই প্রফেসার ছেলে কলেজে অধ্যাপনা করলেন বটে, তবে এহেন উন্নতির জন্যে? বিনাসেনের মায়াময়ী চোখ, তরবারি মত বিজলী হাসি আর কোকিল কণ্ঠী সুরালাপে প্রদীপ বাবু প্রেমদেবতা 'কিউপিডের' শরবিদ্ধ হলেন। আপন ছাত্রীর প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে অধ্যাপনা হারালেন কলেজে, জাত হারালেন সমাজে।

www.pathagar.com

সচেতনতা হারিয়ে আবাস গাড়লেন ১ নং ওয়ার্ডে। একেই বলে বিধাতার লীলা! কো-এডুকেশনের জগতে, এমনটি ঘটাই ত স্বাভাবিক, প্রকৃতিজাত!

প্রদীপ বাবু, আবার ডুব দেন কবিতার রাজ্যে, বিনা-সেনের কাব্য জগতে। বিনা-সেন অতুল বাবুর মেয়ে। অপরূপা সুন্দরী। হরিণ চোখ, আর্যনাক, একহারা চেহারা, ঠোঁট দুটো কমলাকোষ সদৃশ। কাঁচা হলুদের তনুশ্রী রং। বহু যুবক বহু কসরত করেছে প্রেম নিবেদন করতে; কিন্তু 'কিউপিড' শেষ পর্যন্ত প্রসন্ন হল প্রদীপ বাবুর প্রতি। Prince like চেহারা, English-এ এম.এ. পাস, ফার্স্ট ক্লাস অনার্স সহ। অতুল সেনের অহংকারী সুন্দরী মেয়ে মিস বিনা-সেন, ওরফে মায়া প্রদীপ বাবুর কাব্য-ক্লাসের ফাঁদে আটকা পড়ে।

প্রদীপ বাবু সেক্সপীয়ারের Tempest নাটকের Miranda কে খুঁজে পান Blueish ocean deep মায়াদেবীর হরিণ চোখে। বিনা-সেন ওরফে মায়ারাণী তাঁর "সেক্সপীয়ার" পড়ানোর আর্টের মধ্যে খুঁজে পায় Ferdinand কে। সেক্সপীয়র জীবন-ধর্মী নাট্যকার। তাঁর অষ্টাদশ শতকের Tempest পুণর্জন্ম লাভ করে প্রদীপ আর মায়ার যুগ্মজীবন মঞ্চে। বাঁধ ঠেকল সমাজ। প্রদীপ বাবু দাস বংশের আর বিনোদিনী কায়স্থ। মনের মিল হলে হবে কি? জাতের মিল যে নেই ? Nationality শুধু ভাষা, ভুগোল বা ধর্মেই নয়, প্রেমেও এর অস্তিত্ব রয়ে গেছে। জাতীয়তার হলাহলে আজ মানব জাতির প্রতিটা মানুষই যেন একখণ্ড দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে জাতীয়তার বিষ বাষ্পে; হিংসা-বিদ্বেষের কীট যন্ত্রণায়।

প্রদীপ বাবু মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেছেন বটে; কিন্তু সমাজকে আজও তিনি পরিশোধিত করতে পারেননি caste system এর অভিশাপ থেকে। তাঁর মাস্টার ডিগ্রী আজ তাঁর জীবনে ডেকে এনেছে Insanity-একটি মতিভ্রম অভিশাপ। অনিল বাবু দেহের রক্ত পানি করে ছেলেটিকে M.A পাস করালেন সত্যিই; কিন্তু তবু কুল্ থেকে জাতে উঠতে পারেননি, বরং ছেলেটি আজ পাগল। অনিল বাবু স্বাস্থ্য, জাত-মান ও আদুরে মানিক সবই হারালেন। এম.এ. পাস ছেলে তাঁর এখন জেলে থাকে। সারা জীবনের হিসাব কষে অনিল বাবু দেখেন-তিনি Debit side এ আছেন। তিনি খাতক, তিনি ভদ্র সমাজের ঋণাত্মক জীব। সাহস পেলাম মনে। প্রদীপ বাবুর জীবনের চেয়ে আমার জীবন ঢের ঢের ভাল। কৃতজ্ঞতায় আমার শির নত হয় বিধাতার সম্মুখে।

সারমন

রবিবার। দুপুর দুটো। এক নং ওয়ার্ডের গেট খুলে দেয় শান্ত্রী দা। সিরাজ ভাই ও মহেন্দ্র দা হুংকার দিয়ে উঠল ঃ

—তোরা বারান্দায় বেরিয়ে আয় সব। এহন ধর্মের কতা অই বো।

গিনিপিগের মত সুড় সুড় করে সবাই বেরিয়ে গেল। জমায়েত হল ১নং ওয়ার্ডের বারান্দায়। একটা চেয়ার পাতা মাঝখানে।

—এই চুপ। কতা বন্দ কর। নইলে দেখছছ্ত হাতের লাডীডা। বাইরাইয়্যা ফিডের ছাল তুইল্লাফালামু। হারাজনম ত কত পাপ করছছ্। এহন একটু দর্মের কতা হুন। ভগবানের কিরপায় মানুষ অইতি পারবি।

সিরাজ ভাই হাতের রোলার দিয়ে তাড়া করে সবাইকে সুশৃঙ্খলভাবে বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পিন্ পতন স্তব্ধতায় ছেয়ে গেল গোটা পরিবেশটা।

www.pathagar.com

—হরি বল্। জয় মা কালি। জয়-জয়-জয়। উচ্চ স্বরে জপনাম করতে করতে এক সাধুবাবা মিনিট দুয়েক পর আসরে আসলেন। শূন্য চেয়ারটা ভরাট করে বসলেন তিনি।

গায়ে গেরুয়া বসন, কণ্ঠে কাঠের জপমালা। বাম হাতে ত্রিশূল আর ডান হাতে গীতা তার। বপুদেহ। তেল চক্‌চক্ করে উঠছে তার উজ্জ্বল দেহকান্তিতে। কপোল ও নাসিকার উপরি ভাগে চন্দনের রেখা। খাদ্য প্রপীড়িত অর্ধাহারক্লিষ্ট ১নং বাসিন্দাদের ভীড়ের মাঝে 'সাধু বাবা'কে মনে হচ্ছিল একজন খাসা 'ক্যাপিটেলিস্ট' তার দেহের পরিপুষ্টি আর লাবণ্যের মহিমায়।

—তোমরা সবাই ধর্মের বাণী মনোযোগ দিয়ে শুন আর কৃত পাপকর্মের জন্যে অনুতাপ করতে শিখ। ভগবান খুব দয়ালু পাপীষ্ঠদের প্রতি, যদি ওরা অনুশোচনার অনলে নিজের দেহ-মনকে জ্বালিয়ে পাপ-মুক্ত করতে পারে। সাবলীল গতিতে মধুর কণ্ঠে সাধুবাবা কথাগুলো বললেন। তারপর গীতা পাঠ ও তার অনুবাদে স্বর্গীয় অনুভূতি পাপীষ্ঠদের মনে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পান। দু'ঘন্টা চল্‌ল ধর্মের উপদেশের মহড়া। দুঃখ-কষ্ট মানুষের নিত্য সহচর, রাবন-সীতার বিষাদময় কাহিনী, স্বল্প খাদ্য গ্রহণে সংযম স্বভাব রচনা, আত্মার উন্নতির জন্যে দৈহিক রিপু দমন ও ত্যাগ ছিল উপদেশ-মালার বিষয় বস্তু।

মন্দ লাগলোনা আজকের এ পরিবেশটি আমরা পাকিস্তানী বন্দীদের নিকট। জেলখানাতেও ধর্ম শিক্ষা এযেন নূতন আবিষ্কার নরপিশাচদের রাজত্বে। নরকেও তাহলে দেবদূতের আগমন ঘটে?

বড়ই তৃপ্তি পেলাম। মনে পড়ে জীবনের কত কথা, কত কাহিনী। তন্ময় হয়ে যাই। ইলেকশনের সময় প্রিজাইডিং অফিসার হয়েছি একটি ভোট-কেন্দ্রের। মেয়ে-পুরুষ, যুবা-যুবতী ছোটারদের ভীষণ ভিড়। গাদাগাদি আর ঠেলাঠেলি লেগেছে ভোট কেন্দ্রে। জাল ভোটের হিড়িক পড়ে গেছে খুউব। চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নাজেহাল আর গালিগালাজের জের চলছে। হঠাৎ এক অশীতিপর হিন্দু বৃদ্ধাকে নিয়ে এল দুজন মুসলিম যুবক। ওদের একজন বলল ঃ

—স্যার, এ বৃদ্ধামহিলা চোখে কিছু দেখে না। তার ভোটটা নিয়ে দেন।

আমি বৃদ্ধাকে সন্তর্পণে ধরে নির্জন ভোট কক্ষে ব্যালট পেপার আর সীলসহ নিয়ে যাই। বুড়ি চীৎকার করে বলে উঠে ঃ

—অ সাব, সাব, আমার ভোটটা নৌকায় দিমু, নৌকায়।

—আস্তে কথা বল বুড়ি। জোরে বললে ভোটের গোপনীয়তা নষ্ট হবে। এভাবে নষ্ট হলে ভোট তোমার বাদ হয়ে যাবে।

—সাব, আমার ভোটটা নৌকায় দেওয়নের লাইগ্যা না আইছি। এতে আমার কি দোষ অয়? আম চোখে দেখি না। আমার ভোটটা নষ্ট অইলে বাল অইব না কইলাম?

উত্তেজিত স্বরে বুড়ি বক্ বক্ করতে থাকে।

—বুড়ি, তুমি যে মার্কায় দেবে সে মার্কায় সীল আমি তোমার হাত ধরে বসিয়ে দেব। তুমি কোন চিন্তা করো না। এভাবে ভোট নেয়া হল।

ব্যালট পেপার বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে বুড়ি আমার সাহায্যে বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণপর খুব হৈ-হাঁঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। "জ্বালো, জ্বালো, ভোটের বাক্সে আগুন জ্বালো", "ভোট কেন্দ্র উড়িয়ে দাও ভেংগে দাও",—ইত্যাদি শ্লোগানসহ

www.pathagar.com

উত্তেজিত জনতা ইট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগল ভোট কেন্দ্রে। কেন্দ্রের দরজা-জানালা ভেংগে প্রবেশ করার জন্যে ভীমমূর্ত্তি জনতা আক্রমণের চেষ্টা চালাল আমার এবং সাথি চারজন পুলিং অফিসারের উপর। ভয়ে চোখ-মুখ-কণ্ঠ শুকিয়ে গেল সবার। ব্যাপার কি কিছুই অনুমান করতে পারছিলাম না।

হঠাৎ এলাকার মাতবর সাহেবকে দেখা গেল। তিনি জানালা দিয়া চীৎকার করে বলে উঠলেন ঃ

—মাস্টার সাব, অ-মাস্টার সাব দরজাটা খুলুন। উত্তেজিত জনতাকে তিনি লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তোমরা চুপ কর, আমি নিজে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করব।"

ক্রুদ্ধ জনতার উত্তেজনা প্রশমিত হল। আমি দরজা খুলে দিলাম। মাতবর সাহেব ঘরে ঢুকেন। প্রশ্ন করেন ঃ

—মাস্টার সাব, একটু আগে যে অন্ধ বুড়িটা ভোট দিয়ে গেছে, তার ভোট কে গ্রহণ করেছে?

—কেন, কি হয়েছে? আমি নিজেই ত তার ভোট নিয়েছি। Disabled অথবা Mutilated Voter এর ভোট স্বয়ং প্রিজাইডিং অফিসার ছাড়া ত আর কেহ নিতে পারে না। কি ব্যাপার হয়েছে বলুন ত!

—দেখেন মাস্টার সাব। বুড়ি গিয়ে সবাইকে বলেছে যে, সে নৌকায় ভোট দিতে চেয়েছিল অথচ চোখে দেখেনা বলে তার ভোট ফাঁকি দিয়ে পাল্লায় দেওয়া হয়েছে। সে এটার বিচার চায়। যত কানা-খোঁড়া-ল্যাংগরা আছে এগুলো সব সমাজের আপদ। যাক, পাবলিক এখন খুব উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। একটা কাজ করুন, আপনার নিরাপত্তা বাহিনীর একজন আনসারকে এক্ষুনি থানায় পাঠিয়ে দিন 'ফোর্স' নিয়ে আসতে, নইলে আপনারা কেহই জান নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন বলে মনে হয় না!

প্রাণটা বুঝি এবার গেল! ভীষণ ভয় পেলাম। বলির পাঁঠার মত পুলিং অফিসাররা কাঁপতে থাকে। নাক-কপালে ওদের ফিন ফিনে ঘাম আত্ম-প্রকাশ করছে। ঐদিকে আমি পেছনের দরজা দিয়ে একজন আনসারকে পাঠিয়ে থানায় খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম।

—স্যার, আমি বেরুলে এক্ষুনি বেটারা আমাকে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলবে। আমায় মাফ করেন।

—মিয়া, তুমি যদি মাফই চাও তবে 'সিকিউরিটি ফোর্সে" কি চেহারা দেখাতে যোগ দিয়েছ? না, ওসব কথায় চলবে না, তোমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। নইলে কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমি রিপোর্ট করব।

—আমারে ত স্যার তারা পুলিশের লোক বলে চিনে ফেলবে? কি করি স্যার?

আমার সমস্ত দেহ-মন কাঁপতে শুরু করে মাঘ মাসের শীতের কম্পনের মত। ঐদিকে উত্তেজিত জনতা দরজা-জানালা ভেংগে প্রবেশ করার জন্য রড, ইট দিয়ে এলোপাথাড়ি আক্রমণ শুরু করেছে। ওরা ঢুকতে পারলে আমার ও আমার সঙ্গীদেরকে মরিচ-পেষা করে ফেলবে।

—তুমি একটা কাজ কর। গায়ের জামাকাপড় খুলে শ্রেফ তোমার হাতকাটা গেঞ্জিটা আর লুংগি পরে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও।

আনসার লোকটা এভাবে বেরিয়ে যায় নিরাপদে।

তুলকামাল কাণ্ড ঘটতে লাগল পুলিং-বুতে। মারপিট, হৈ-হল্লা আর ইট পাটকেলের শিলাবৃষ্টি চলল তুমুলভাবে। আমরা সবাই দরজাগুলোতে টুল-বেঞ্চ-টেবিল

www.pathagar.com

ঠেস দিয়ে আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম এমন করুন ভাবে যে, এতে নিষ্প্রান পাথরও প্রাণবন্ত হয়ে আশ্রুসিক্ত হতো বোধ হয়।

মাতবর সাহেব ভিতরে ছিলেন এতক্ষণ। তিনি অবস্থা বড় ঘোরতর দেখে অন্য একটা দরজা দিয়ে বের হয়ে উন্মত্ত জনতাকে আহ্বান করলেন একটি উঁচু টুলের উপর দাঁড়িয়ে ঃ

—ভাইসব, শান্ত হউন। আমি এর বিচার করব। ভোট নেওয়ার কাজ শেষ হলে পরে ভোট গণনার সময় ঐ বুড়ির ভোটার নম্বরসহ বেলট পেপার পরীক্ষা করে দেখব, প্রিজাইডিং অপিসার কোন জালিয়াতি করেছে কি-না। আপনারা ধৈর্য ধরুন। দরজা-জানালা ভেংগে স্কুলটির ক্ষতি সাধন করে ত কোন সমাধান হবে না; বরং এতে এ ব্যালট পেপারটা খোয়া গেলে প্রমাণের আর কোন পথই থাকবে না!

উন্মত্ত ও উগ্র জনতা নিমেষে পানির মত শীতল হয়ে পড়ে।

সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ শেষে রাত ৯টায় ঐ বুড়ির ভোটার নাম্বারসহ ব্যালট পেপারটি খুঁজে বের করে দেখা যায়, বুড়ির ব্যালট পেপারে নৌকার সীলমোহর দেয়া আছে। জনতা শান্ত হয়। আরও দেখা যায় নৌকা এ কেন্দ্রে তিনশত চৌদ্দ ভোট বেশি পেযে "পাল্লা'কে পরাজিত করে আমি হতভাগা প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রাণে বাঁচার কৃপা দান করেছে। আনসার লোকটাও ফিরে এসেছিল যথাসময়ে। সে 'কনটিনজেন্ট ফোর্স' আনার পরিবর্তে সংবাদ আনল ঃ

—স্যার থানায় শুধু দারোগা সাহেব আছেন। আর কোন পুলিশ বা আনসার নাই। ওরা সব ডিউটিতে চলে গেছে। এর মানি বুঝলেন না স্যার?

এক এক জন নানা রকমের পোশাক পাল্টিয়ে কমপক্ষে ২০/৩০ খানা ভোট আদায় করছে। এবার আমাদের পাশ। স্বয়ং আল্লাহও ঠেকাতে পারবে না।

প্রমাদ গুণছিলাম। ভাগ্যিস, মাতবর সাহেব ছিলেন বলে বাঁচার উছিলাটা হয়েছে আমাদের। 'কনটিনজেন্ট ফোর্স' নাই। গণতন্ত্র পূজারী ভোটারদের কিল ঘুষি খেয়ে আজই প্রাণ পাখী উড়ে যাওয়ার কথা ছিল। থুর-থুরে বুড়ী বোমা ফাটার মত আতংক সৃষ্টি করেছিল ব্যালট গুজব রটিয়ে। শেষান্তে প্রমাণ পাওয়া গেল যে ইহা নিছক একটি চাল। যার জন্যে পরবর্তী প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিনে আমার প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্বটি আর থাকল না। কেন্দ্রে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছি—এই অভিযোগে জাতির খেদমতের এই সুযোগটি হারালাম। কী চমৎকার বিচার সরকারের, কী অপূর্ব তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা! সাধের গণতন্ত্র পরিবেশ একেই বলে!

সাধুবাবার ধর্মোপদেশ এ 'কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি। জেলারবাবু সাধু বাবাকে পাঠিয়েছেন অপরাধীদেরকে "দেবতা" বানাতে।!

—মা দুর্গা, দূর্গা, প্রণাম তোমার চরণে।

সাধু বাবার 'সারমন" শেষ হয়ে যায়। আমি-ও নিজেকে ফের আবিষ্কার করি ১নং ওয়ার্ডের বারান্দায় পাপিষ্ঠদের জপনাম জলসাতে।

জুম্মা নামাজ কায়েম

–সুলেমান ভাই, একটা কথা মনে পড়ল। রোজ রবিবার যদি হিন্দুদের ধর্ম-সভা হতে পারে; রোজ শুক্রবারও ত আমাদের জুম্মার নামাজ হতে পারে, কি বলেন?

সুলেমান ভাইয়ের হৃদয়ে কথাটা বড় ভাল লাগল বলে মনে হলো।

www.pathagar.com

—চল, আজ সন্ধ্যায় সিরাজভাইরে গিয়া ধরমু। আমার ত মনে হয় একথা হুনলে খুশী অইয়্যাই রাজী হইব।

সন্ধ্যায় সিরাজভাই লক-আপে ঢোকার সাথে সাথে সুলেমান, তালেব আলি ও আমি বিনীতভাবে এ সদিচ্ছার কথাটা জানাই তাকে।

সিরাজ ভাই খানিকটা গম্ভীর হয়ে যায় প্রথম। পরে গোঁফে পাক দিতে দিতে বলে ঃ

দুপুরে ত লক-আপ খুলেনারে। রবিবার পারমিশ্যেন আছে বলে ধর্ম-সভা অইয়া আইতেছে। কিন্তু শুক্রবারে আবার...

সিরাজ ভাই থেমে যায়, চিন্তিত মুখ তার।

—হিন্দুরা যদি রবিবারে ধর্মের লাইগ্যা দুপুর দুই/আড়াই ঘন্টা লক-আপের বাইরে গিয়া সাধুর কতাবার্ত্তা হোনতে পারে, তবে আমরা মুসলমানরা কি অপরাধ করলাম যে জুম্মার নামাজটা পড়তে চাইলে পারমিশন পামু না? আমনে (আপনি) ছাড়া এডার কোন বিহিত কেহ করতে পারত না, সিরাজ ভাই।

সুলেমান ভাইয়ের কথায় সিরাজ ভাই চাংগা হয়ে ওঠে।

—আজ কি বাররে?

—রবিবার।

—সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, আর চারদিন আছে মাঝে শুক্রবারের, না-রে? যা আগামী শুক্রবার থাইক্যা তোরাও জুম্মার নামাজ পড়বি। আমি সিরাজ বাইচ্যা থাকতে দেহি কি করণ যায়? জেলার বাবুর লগে কাইল পারমিশনের লাইগ্যা দেহা করুম। যদি পারমিশন না দেয় ত আর একটা খুন করুম। বড় জোর আরও ছ-মাস নইলে জেল খাটতে অইব। যা শ্যালায়, আল্লার কামের লাইগ্যা জেল খাটলে পিছলা গোনাওত মাফ অইতে পারে।

সত্যি, সেই বহু প্রত্যাশিত শুক্রবার এলো। দুপুর দেড়টায় শাস্ত্রীদা দরজা খুলে দিলেন। একবুক আনন্দ নিয়ে আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম ওয়ার্ড থেকে। হাউজে সবাই অজু করতে বসে গেলাম। ঢাকার চকবাজার মসজিদে শুক্রবারের জুম্মা পড়ার সৌন্দর্য যেন ঠিকড়িয়ে পড়ছে আগরতলা জেলখানাতে।

আনন্দধাম।

কয়েদীদের গান-বাজনার হলগৃহ। ভাংগা তবলা, বেহালা ও ঢাক-ঢোল ইত্যাদিতে কক্ষটির এক কোণ ঠাঁসা। ধুলো-বালি ও মাকড়সার জালে সমস্ত ঘরটি বিশ্রী ও দুর্গন্ধযুক্ত। বছর খানেক ধরে এ কক্ষটি ব্যবহার হয়নি বলে মনে হল।

তালেব আলি, সুলেমান, ইমামদ্দিন সবাই বাটি-বাটি পানি ছিটিয়ে সমস্ত ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলে। কি আনন্দ আজ আমাদের! আনন্দ ধাম আজ থেকে জুম্মার ঘরে রূপ নিচ্ছে! সমস্ত পরিবেশটা যেন হাসি খুশিতে ঈদের চেহারা নিল।

—ইমামদ্দিন, আজ আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে আজান দাও, প্রকম্পিত করে তোলো হিন্দুস্তান জেলের আবদ্ধ পরিবেশকে। আমাদের কথায় ইমামদ্দিন হেঁসে উঠে। নির্মল মাসুম শিশুর হাসি যেন। পাক পবিত্রতা উপছিয়ে পড়ছে সে হাসিতে।

এই শুভ মুহূর্তে ভুলে যাই জেলজীবনের আবদ্ধতা। মনের আয়নায় ফুটে উঠে দেশের সাথী মুসল্লীদের চেহারাসমূহ। হাজার হাজার উজ্জ্বল হাসি মাখা চেহারাগুলো ফুটন্ত পদ্মের অজস্র পাঁপড়িরমত ধরা দেয় আমার স্মৃতির নোনা সরোবরে। হাজী সিদ্দিকুর রহমান সাহেব, নান্নু মিয়া, মজু ভাই, আইয়ুব ভাই, খখরু ভাই, মাওলানা শামসুল হক, কসবার আড়াই বাড়ীর পীর ছাহেব, নাছির, সিরাজুল করিম সাহেব,

www.pathagar.com

খালেক ভাই, জামাত নেতা প্রফেসর গোলাম আযম ও মাওলানা আবদুর রহিম সাহেব—কত মুখ কত মায়া, কত আপন ওরা সবাই। ওদেরকে নিয়ে মুক্ত পৃথিবীতে আগে নামাজ পড়েছি। মনটা নেঁচে উঠল ময়ূরের মত!

আজ শুক্রবার। আজ ওরাও ত টুপি মাথায়, পাঞ্জাবী-পাজামা পরে কেহবা নাখালপাড়া জামে মসজিদে, কেহবা দেবগ্রাম মসজিদে নামাজ আদায় করতে যাচ্ছে। মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, মুক্ত জমিনে ওদের নামাজ-দোয়া কত সুন্দরই না! আর আব্বা? আব্বা নিশ্চয়ই মিছওয়াক দিয়ে দাঁত ঘঁষতে ঘঁষতে, কোমড়ে বা মাথায় গামছাটা জড়িয়ে খালি পায়ে দোয়া পড়তে পড়তে যাচ্ছেন সাভার মসজিদের পানে, দ্রুত গতিতে। প্রথম কাতারে ইমামের পেছনের স্থান তাঁর চাই-ই-চাই। প্রথম কাতারের মুসল্লিদের সওয়াব সত্তর গুণ বেশী।

—আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ অতি মহান, মহাপরাক্রমশালী, অদ্বিতীয়। ইমামদ্দিনের সুমধুরকণ্ঠ নিঃসৃত আওয়াজ হিন্দুস্তানের গোটা জেলখানাকে "বেহেস্তি" পরিবেশ দান করেছেন। জেলখানার ২০ হাত উঁচু দেয়াল টপকিয়ে এ আওয়াজ মুক্ত পৃথিবীর বায়ুর পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়ে অনন্ততা লাভ করেছে, অদৃশ্য হয়ে মিশে গেছে সৌরজগতের আলো-কণিকায়!

৪নং, ৫নং, ৬নং ও ২০নং ওয়ার্ডের হাজতী কয়েদীরাও ছুটি পেল জুম্মার নামাজ আদায় করার জন্যে! ওরা অধিকাংশ পাকিস্তানী। আড়াই বাড়ীর জনৈক মাওলানা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার চশমা বিক্রেতা, কুমিল্লার জনৈক বি.ডি. মেম্বর, এরা অধিকাংশই আমার পরিচিত। ওরা সবাই 'ইন্‌ডকট্রিনেটেড্‌দের' জবানীতে দালাল।

ঈদের নামাজ শেষে যেরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ আলিংগন, ঠিক অনুরূপ আলিংগনের দৃশ্যের অবতারনা হল আনন্দধামে। 'মোসাফা' এবং 'কেমন আছেন', "আল্লাহর রহমতে ভাল"—এটুকুন 'মাইক্রো' কথোপকথনের মৃদু গুঞ্জরনের মাধ্যমে অশ্রুসিক্ত নয়নে সবাই পরিচিত হলাম। আনন্দধাম মিষ্টি মধুর বেদনা-বিধৃত অশ্রুতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। বেদনাবারি সৃষ্ট প্রশান্ত মহাসাগরের মত গম্ভীর রূপ নিল গোটা পরিবেশ।

ছুন্নত শেষে খোৎবা। খোৎবার বই নেই। তাই প্রথম দিন খোৎবা পাঠের পরিবর্তে বাস্তব খুৎবাত্ (বকতৃতা) করতে হল আমাকে। দুঃখকষ্টে সাহাবাগন কি ধরনের ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন, কি ধরনের যাতনা সহ্য করে হজরত বেলাল, খাব্বাব (রাঃ) ইসলামের সৌন্দর্য ও সৌম্য মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, ইত্যাদি ছিল খুৎবাতের বিষয়-বস্তু। সবাই তন্ময় হয়ে শুনল আমার জুম্মা ভাষণ। উপলব্ধি করলাম জামা'তে ইসলামীর নিঃস্বার্থ কর্মী হওয়ার উপকারিতা ও এর ফজিলত। গভীরভাবে বিনম্র চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানালাম আল্লাহর দরবারে।

রমেশ দা, রঘুনাথ, সুমন্ত ও আরো দু'চারজন কয়েদী জুম্মার নামাজের সময় দাঁড়িয়েছিল। ওরা সবাই আমার বকতৃতা অভিনবেশ সহকারে শুনছিল। উদ্দেশ্য ঃ কোন রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক সলাপরামর্শ আমরা পাকিস্তানীরা করছি কি না! মনে খুব তৃপ্তি পেলাম এই ভেবেঃ রাষ্ট্রদ্রোহী বকতৃতা করছি কি-না এর পাহারাদারীর ফলে 'রমেশদারা' ত ইসলামের কথা শোনার সুযোগ গ্রহণে বাধ্য হচ্ছেন! কত মুশরেক ত এভাবেই হয় ইসলামে দীক্ষিত, না হয় এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন।

সবাই নামাজ শেষে দরূদ পাঠ করল। এরপর দুই হাত শূন্যে তুলে আখেরী মোনাজাত করল সবাই। আড়াইবাড়ীর পীর ছাহেবের শিষ্য নামাজ পড়িয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মোনাজাতও করালেন তিনি। সে কি এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য! শুধু আল্লাহ ও মুসল্লী-এ দুয়ের মাঝে আর কেহ ছিল না তখন। দুনিয়ার কোন মায়া, কোন বাঁধন ছিল না বলে মোনজাতের দৃশ্যটি অদ্বিতীয় ও অনুপম হয়েছিল নিঃসন্দেহ। এ ধরনের এবাদত ও মোনাজাত জেলের বাইরে তথা সংসারের পংকিল আবর্তে থেকেও যারা করতে পারেন বস্তুত তারাই ত আল্লাহর প্রকৃত পূজারী!

রবীন্দ্রজয়ন্তী

সময়ের চাকা ঘুরে হাজির হয় রবীন্দ্রজয়ন্তী ওয়ার্ডের আঙ্গিনায়। রংবেরং এর লতাপাতা, কাগজ দিয়ে সাজান হয় একটি মঞ্চ। উপরে রংগীন সামিয়ানা। স্টীলের ফোল্ডিং চেয়ার এবং সোফাসেট পাতা হল মঞ্চের পশ্চিম পাশে। পূর্বদিকে আর্টিষ্টদের স্থান। মাইক বসান হল জমকালো ভাবে।

জেলার মধু বাবু, জমাদার বাবু ও জেল-সুপার সপরিবারে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। ঠিক ১১ টার ঘন্টি পড়ার সাথে সাথেই প্রোগ্রাম চালু করা হল। বাইরের জগতে যাই থাক না কেন, জেলজগতে কিন্তু ঘড়ির গোলামী কাঁটায় কাঁটায় না করলেই নয়।

"বন্দে মাতরম ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে" জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে ২৫ শে বৈশাখ মূর্তমান হয়ে উঠল। মঞ্চের একপাশে কবিবর ও মহাত্মাজীর আবক্ষ ছবি দু'টো টাংগানো। ছবিগুলোর পাদমূলে রয়েছে রং-বেরং-এর অজস্র তাজা ফুলের পাঁপড়ি। এই দুই মহাপুরুষের ছবি দুটো সোনালি আর রূপালি কাগজের ঝিলমিল মালা দিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলেছে ভক্তের দলেরা।

বিভিন্ন বক্তা রবীন্দ্রদর্শনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরলেন। জেলসুপার মহেশ বাবু তুলে ধরলেন কবিবরের "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দেহে" এর মর্মবাণী। কয়েদী জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে মহেশ বাবু হিতোপদেশ দিলেন পাপিষ্ঠ বন্দীদেরকে। রবিবাবু অন্যায়ের প্রতি আপোসহীন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ন্যায় ও সত্যের পূজারী ছিলেন তিনি। 'শিব-সত্য-মঙ্গল' এদর্শনই ছিল রবি সাহিত্যের মূল মন্ত্র। মহেশ বাবুর বক্তব্য অত্যন্ত উঁচু ধরনের ছিল। ভাষা ও বাচনভংগী ছিল সাহিত্য-দুরস্ত। বাইরের ডজন খানেক অতিথি আর জেলখানার দুই পার্সেন্ট উচ্চ শিক্ষিত পাপিষ্ঠ ছাড়া বাকী সবাই তার বক্তব্যের মর্ম সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি। দশ পনরটা করতালির মাধ্যমে মহেশ বাবুর ভাষণের উপসংহার তা-ই বলে গেল। পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ন সবদেশে এমনি তরোই হয়। এর ব্যত্যয় এখানেও ঘটেনি।

"যদি তোর ডাক শুনে কেহ না আসে, তবে এলাক চলরে" কবিতাটি আবৃত্তি করল বহিরাগত এক কুমারী শিল্পী। মন্দ লাগল না আবৃত্তিটি। জেলের আবদ্ধ জীবনটা 'একলা চলরে'র তাৎপর্যই ফুটিয়ে তোলল আমাদের সামনে। যার যার থালাবাটি কম্বল তার তার হেফাজতে রাখতে হয়। যার অপরাধ হয় সে-ই শাস্তি পায়ঃ ডান্ডাবেরী, হাত-বেরী, 'কেন্টিনের' লোমহর্ষক নির্যাতন। কেহ এখানে কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে না, একজনের মুক্তিতে অন্যজন খালাস পায় না। এক জনের সাজায় অন্যজন দুঃখিত বা আনন্দিত হতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথে চলে। প্রত্যেকেই নিজ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। "চাচা আপন জান বাঁচা"-এর জগত এটা।

'হোলি খেলা,' 'বন্দীবীর', 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভংগ'-৫/৭টি কবিতাও আবৃত্তি করা হলো। ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্র সংগীতের ঘুম পাড়ানো সুর আর বক্তৃতা একঘেয়েমীর অভিশাপ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল শ্রোতা দর্শকদেরকে এসব আবৃত্তি।

www.pathagar.com

রবীন্দ্র জয়ন্তীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল দুটো নাচ আর বাহির থেকে আগত কতিপয় সুদর্শনা যুবতীশিল্পী। জেলখানার সবাই এ দুটো আইটেমকে মূল্য দিয়েছিল বেশী। বিবাহিত এবং অবিবাহিত তথা ব্যাচলার কয়েদীদের জগতে আচমকা মেয়েদের আগমন তেমন রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছিল যেমনটি সৃষ্টি হয়েছিল "আদমের" "ঈভ" কে পেয়ে। "এ বিশ্বে যত কিছু মহান, মহীয়ান আর চির কল্যাণকর অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।" পুরুষ কয়েদীরা আজ সে আমেজ ও সে পূর্ণত্ব অনুভব করল মনের রাজ্যে; ষোল কলায়, ষোল আনায়।

"খর বায়ু বয় বেগে চারি দিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে নাও খানি বাই-ও"

এবং

"বইল প্রাণের দখিন হাওয়া আগুণ জ্বালা
বসন্ত ফুল গাঁথলো আমার জয়ের মালা...."

এ দুটো নৃত্যসংগীত যৌবনের রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছিল সবার দেহ-মনে। নৃত্যশিল্পী ছিল তিন জন। ফিন ফিনে শাড়ী পড়েছিল ওরা পীনোন্নত বক্ষ প্রদর্শন করে। স্বয়ং ক্লিয়োপেট্রার আবির্ভাব হয়েছে যেন আজ যৌনতৃষিত ১নং ওয়ার্ডের রাজ্যে। ওদের বিরাট খোঁপাগুলো তাজা বেলী ফুলের মালা দিয়ে সুসজ্জিত। নাক-কপালে চন্দনের ফোঁটা, চোখে কাজলের ছোঁপ, ঠোঁটে লিপস্টিকের লাল রং। স্বর্গের অপ্সরীদের অবতরণ ঘটেছে আজ 'লুসিফারের' রাজ্যে! সত্যি, ফাইন আর্ট একেই বলে। গ্রীণরুম এবং মেক-আপ এদুটোর উপরে যদি আমার ডকটোরেট ডিগ্রী দেয়ার ক্ষমতা থাকতো, অবশ্যিই আজ আমি তা ওদেরকে দিয়ে দিতাম বৈ কি!

"দেখছছনি মহেন্দ্র, বাম পাশের মাগীটার কোমর ঘুরানী আর বুক নাচুনী। কলিজা ঠাণ্ডা অইয়্যা গেছেরে আইজকার নাইচ দেইখ্যা। শ্যালার এমন দুই-চারডা নাইচ মাসে হইলে জেল জীবনে আর দুঃখ কিয়ের!"

কৈলাশ, বাদল, চান্দু-সবাই গোগ্রাসে নৃত্যপটিয়সীদের উগ্র যৌনসৌন্দর্য ভোগ করছিল কল্পনা আর অনুভূতির রং চড়ায়ে। মাঝে মাঝে চাপা অশ্লীল মন্তব্য আর কুৎসিত ইশারার গুঞ্জরন সৃষ্টি হয়েছিল মহেন্দ্র, গেঁদা আর কৈলাশদের অবস্থানের কোণাটাতে। খেয়ালী পোলাও খাওয়ার মত ওরাও মশগুল ফাইন আর্টের স্বাদ গ্রহণে। রবীন্দ্র জয়ন্তী যৌন উম্মাদনা আর যৌন তাড়নার ঢেউ জাগিয়ে তোলল ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মানস সরোবরে।

রবীন্দ্র জয়ন্তী শেষ হল, পেছনে রেখে গেল গুটি কয়েক কুমরীর যৌন উম্মাদনার প্রতিচ্ছবি ওয়ার্ডের মনসপটে। লিটারেচার, আর্ট ও কালচার এর পোশাকে কবিবর অনুপ্রবেশ করেছিলেন জেলজগতে। তাঁর সাহিত্য-শিল্প-কলার অনুষ্ঠানসূচী লৌহ কপাটবদ্ধ জীবন-মরুতে ফ্রয়েডীয়ান রস আর স্বাদের উদ্রেন করেছিল, সেদিন চাংগা করে তুলেছিল কয়েদীদেরকে যৌনরসের মাদকতায়।

Life is an art, Life is a beauty, Life is a mirth, Life is a duty! জেল খাট দিন রাত, মাস-বছর, যুগ-যুগ ধরে। সাবধান, অবসন্ন হয়ে পড়ো না, কারণ সর্বক্ষণই লাইফকে সজীব ও সুস্বাদু রাখতে হবে। আর এ রাখার ফলশ্রুতিতেই তো আর্ট এর জন্ম। ইউলিসিসের মত জীবনটাকে পান করতে হবে ঃ "I will drink life to the lese, I will drink the delight of battle."

www.pathagar.com

জীবন যুদ্ধের মদিরা পান করেই 'টেনিসন' লর্ডটেনিসন হয়েছেন, যৌবনকে আপাদ-মস্তক সম্ভোগ করেই 'বায়রন' পেয়েছেন তার কবি প্রতিভার উন্মেষ!

সিরাজ ভাই, মহেন্দ্র দা, গেদু, কৈলাশ-ওরাও মানুষ। রক্ত মাংসের মানুষ। বায়রণ-টেনিসন এর মত ওদেরও তো অধিকার আছে আর্ট ও কালচার এর স্বাদ গ্রহণে। ওরা 'কবি' না হতে পারে, তবে সমঝদার হতে আপত্তি কি!

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১নং ওয়ার্ডে সংস্কৃতির পরশ লাগিয়ে গেলেন। আচমকা উন্মোচিত করে গেলেন দাম্পত্য জীবনের তীব্র বিচ্ছদ-বেদনা, পারিবারিক জীবনের অনুপস্থিতিতে মানসিক যাতনা, আত্মার মুকক্রন্দন প্রিয়জনদের বিরহ বিচ্ছেদে!

'জয়, রবীন্দ্র জয়ন্তী কি জয়'! বছর বছর তুমি আবার ঘুরে আস আমাদের আংগিনায়—কয়েদী জীবনের বদ্ধ ভূমিতে। তোমায় প্রণাম জানায় বন্দীরা সবাই, জানায় আশীর্বাদ। ওরা কামনা করে তোমার দীর্ঘায়ু জীবনের।

শিখারনীর বলয়

মাস দেড়েক পর পাকআর্মী আখাউড়া ও ব্রহ্মণবাড়ীয়া মুক্তিযোদ্ধাদের কব্জা থেকে মুক্ত করেছে। জয়-বাংলার নিশান নামিয়ে পাকিস্তানীকেতন উড়িয়েছে। পাক আর্মীর ভয়ে বহু আওয়ামীলীগার প্রাণের মায়ায় দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে শরণার্থী হয়েছে বন্ধুরাষ্ট্র হিন্দুস্থানের আগরতলায়। মূল্যবান জিনিসপত্র, বেডিং সুটকেস আর ক্যাশ টাকা শরণার্থীদের সম্বল। আবদুল ওয়াহেদ ও তার ছোট ভাই মবিন সস্ত্রীক আগরতলায় শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নেন এমনি ভাবে।

দুদিন হল ওয়াহেদ সাহেব ও মবিন ১নং ওয়ার্ডে তশরীফ এনেছেন। ভাগ্যদেবী তাদের প্রতি অপ্রসন্ন। শিখারানীর বলয়ে আবদ্ধ হয়ে তারা আজ আগরতলার সেন্ট্রাল জেলের বিশিষ্ট মেহমান।

শিখারানীর বাড়ী ব্রহ্মণবাড়ীয়ায়। বাবা থাকেন আগরতলায়। '৬৫তে মা, শিখারানী আর তার ছোট ভাই দেশের মায়া ছিন্ন করে হিন্দুস্তান আসেননি। শিখারানী গান গায়, নাঁচে। সে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সংস্কৃতি-অংগনের মধ্যমণি, নয়ন-তারা, গলার হার, স্বপ্নরাজ্যের সম্রাজ্ঞী।

পাঞ্জাবীদের আগমনে শিখারানী দেশ ছেড়েছে। ওয়াহেদ সাহেবের পরিবারের সাথে সেও আগরতলার শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়।

শিখারানীর বুড়ো বাবা এ সংবাদ পেয়ে আগারতলার থানায় এজহার দেয় অনেকটা নিম্নরূপে ঃ

"আমার মেয়ে শিখারানীকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ওয়াপদা অফিসের ওয়াহেদ সাহেব জোড়পূর্বক তার গৃহে আটকিয়ে রাখে। আজ ৬/৭ বছর পর ওয়াহেদ মিয়ার সাথে শিখা আগরতলায় ফিরে এসেছে। এখন শিখাকে উদ্ধারের জন্যে আর্জি পেশ করছি", ইত্যাদি।

বেচু রামের কাছ থেকে আমি এ বর্ণনা শুনি। বেচু রাম চোর। সে স্বর্ণ চুরি করছিল তার মনিবের গৃহ থেকে। চারআনি একটি স্বর্ণের অলংকার গিলে ফেলেছিল। থানায় বেদম প্রহারের পরও স্বীকার যায়নি। মনিবের বহুপীড়াপীড়ির পর সিভিল সার্জনকে দিয়ে তার পেটের এক্সরে করা হয়। ধরা পড়ে, বেচুরামের অন্ননালীর একস্থানে স্বর্ণটুকু দব্যি আরামে রয়েছে। পায়খানার রাস্তায় চুস দিয়ে এই অলংকার

www.pathagar.com

অবশেষে উদ্ধার করা হয়। বেচুরামএর জেরার সময় শিখারানীর বুড়ো বাপও উপস্থিত ছিল। শিখারানীর বাপ তখন এজহার প্রদানে রত।

জনাব ওয়াহেদের সাথে মিতালী পাতালাম। তিনি কিন্তু ঘটনাটা অন্যভাবে বিশ্লেষণ করেন।

১৯৭১ সনের জুন মাস। পাঞ্জাবীরা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহর "ক্যাপচার" করলে পরে ওয়াহেদ সাহেব তার ছোট ভাই মবিনকে নিয়ে সস্ত্রীক আগরতলায় পাড়ি জমান। এখানে এসে ত্রাণ শিবিরে নাম লিখিয়ে একটি ছাপরায় বসবাস করতে থাকেন। কিছুদিন পর হঠাৎ শিখারানী আর তার বাবা ওয়হিদ সাহেবের শিবিরে উপস্থিত হন। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। কোলাহলপূর্ণ শিবির ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম খোঁজছিল রাত্রির কোলে। শিখারনীর বাবা ওয়াহেদ সাহেবকে অনুনয়ের স্বরে বললেন ঃ দাদা, শিখারানীও ত আপনাদের দেশেরই লোক। আপনি ত তাকে জানেন শুনেন। দয়া করে আজকের রাত্রিটিতে তাকে আশ্রয় দিলে আমি বড় ধন্য হব। চির কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে। তাছাড়া আপনি বিবাহিত আছেন বলেই আমার মেয়েকে আপনার নিকট রাখাটা নিরাপদ মনে করি। আগরতলা খুব খারাপ জায়গা। আমার ষোড়শী মেয়ে নিয়ে আমি কোথাও একাকী থাকার ভরসা পাচ্ছি না।

শিখারানী সুন্দরী যুবতী। সোনারং তনু, উগ্রবসনা যুবতী। আসলেই সে সুইট সিক্সটিন "ব্লন্ডি"।

—ঠিক আছে। এক রাত্রির ব্যাপার যখন আমার আপত্তি নেই। তাছাড়া যে পরিবেশ এখন, আপন-পর সবাই একে অপরকে সাহায্য করা ছাড়া জীবন বাঁচানোই মুস্কিল।

—দাদা, ভগবান আপনার ভাল করুন।

ওয়াহেদ সাহেব শিখারানীকে ঘরে নিয়ে যান। নিজের স্ত্রীকে সঁপে দিয়ে বলেন ঃ ধর, এদুর্দিনে তুমি আর একটি বোন পেলে, এক রাত্রির মেহমান সে। এরপরই বুড়ো চলে যায়। থানায় খবর দেয়। ঘন্টা দুয়েক পর পুলিশ এসে ঘেরাও করে ওয়াহেদ সাহেবের শিবির।

—ক্যাম্পে কে আছেন?

ওয়াহিদ সাহেব বেরিয়ে আসেন।

—আপনি না-কি একটি হিন্দু মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছেন, মেয়েটি কোথায়? জবাবে ওয়াহেদ সাহেব সম্মতি জানান। শিখারানীকে ঘর থেকে ডেকে আনেন তিনি।

—আপনারা দুজনই এরেষ্ট। থানায় চলুন। মুসলমান হয়ে হিন্দু মেয়ের লোভ, তা-ও আবার হিন্দুস্থানের মাটিতে? কর্কশ কণ্ঠে পুলিশ একথাগুলো বলে ওদের দুজনকে থানায় নিয়ে যায়। ওয়াহেদ সাহেবকে ধরে আনার কিছুক্ষণ পর তার ভাই মবিনকেও পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। শিখার শ্লীলতাহানি করেছে, এই অভিযোগে মবিনও কারাবাসী হয়।

বেশ কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে ওয়াহেদ সাহেব আর মবিনকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ১নং ওয়ার্ডে। ওয়াহেদ সাহেব কাঁদেন, অঝোর কান্না। দেশ গেল, বৌ-ঝি গেল, সবশেষে শিখারানীর জন্যে মনুষত্বও গেল তার!

ওয়াহেদ সাহেব মাত্র পাঁচ দিন ছিলেন জেলে। তার স্ত্রী টেলিভিশন সেট, সিংগার মেশিন আর গয়না দিয়ে মুক্ত করে নিয়েছেন হতভাগা স্বামী আর দেবর ভাইটিকে। দেবর ভাইটি কলেজে পড়ত। আই.এ. প্রথম বর্ষের ছাত্র সে।

www.pathagar.com

কত বিচিত্র মানুষ, কত বিচিত্র তার মন। এরও চেয়ে বিচিত্র মানুষের ভাগ্যলীলা। মানুষ নিষ্পাপ থাকে, মানুষই আবার পাপ করে। নিষ্পাপের-ও রকমভেদ কত রকমের। মিথ্যা এবং পাপেরও চেহারা কত রংবেরং-এর। 'জয় বাংলার' যুদ্ধ শুরু হল আর এরই ফজিলতে মানুষের কত বিচিত্র রূপ আর বিভীষীকা ফুটে উঠল ১নং ওয়ার্ডের রংগমঞ্চে।

মিথাংদের কথা

কিছুদিন হল সত্তর জন মনিপুরীকে চালান দিয়েছে ইম্ফল জেল থেকে। এরা সবাই যুবা, প্রায় সমবয়সের। সমপরিমাপের। দেখলেই মনে হয় এদেরকে বাছাই করে একটি সুসংহত সুশৃঙ্খল দল গঠন করা হয়েছে। এদের প্যান্ট, সার্ট ও জুতো এক রকমের। এদেরকে আর্মী বললে অত্যুক্তি হবে না।

চীনাদের মত এরা কথা বলে। চিংতাংতু, থু-অ ফু-ও ত-এই ধরনের শব্দ ও উচ্চারণগুলোই বেশী বেশী বলে মনে হয়। এদের ভাষা কিছুই বুঝে আসে না। ১নং ওয়ার্ডে এদের আগমন জাতি, বর্ণ ও ভাষাগত দিক দিয়ে বিশেষ এক বৈচিত্রের রচনা করেছে। এরা নিরিবিলি দিন কাটায়, বই পড়ে, না হয় ষোল গুটির ঘর এঁকে খেলে। এরা দাবা খেলাতেও বেশ পটু। টুয়েন্টি নাইন, ব্রীজ, ব্রে, পেসেন্ট গেইম-এসব খেলেও এরা সময় কাটায়।

এদের বেশ ভাল লাগে আমার। কারণ এদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রকৃতি ও প্রকাশ রয়েছে। গায়ের রং উজ্জ্বল, চোখ-মুখ-নাকে ব্যক্তিত্বের স্বচ্ছ ছাপ। গোলগাল চেহারা। শক্ত বাঁধুনির স্বাস্থ্য। এরা শিক্ষিত, ভদ্র ও সুরুচিপূর্ণ। এরা জেল কর্তৃপক্ষের সাথে ইংরেজীতে কথা বলে। একবার জেলার মধুবাবু এদের একজনকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন ঃ

—Last warning to you Mithung. If you do so once again, I will transfer you to Delhi jail with R.I. Do you understand?

—Yes Sir. I beg your generousity in this respect and also wish to bring to your kind notice that all the complaints that you have had against me deserve fair inquiry and justice.

মিথাং হাসি-মুখে আঞ্চলিক উচ্চরণে বলে চলছিল ইংরেজী। "ট"-কে "থ", যেমন জেনরসিথী, রেসপেক্ত এবং টু-কে থু বলার সমার বেশ কৌতুক বোধ হচ্ছিল আমার। ওরা যেন আমার মনের মানুষ। জমাদার বাবু এবং ক্ষীতিশ ও ছিলেন জেলার বাবুর সাথে। জেলার বাবু চলে যাওয়ার সময় জমাদার বাবু অগোচরে মিথাংকে রাংগা চোখ আর হাতের রুলার দেখিয়ে ইশারায় ভয় দেখিয়ে গেলেন। ভাবটাঃ আর একবার রিপোর্ট হলে তোমার হাড্ডি গুড়ো করে দেব শ্যালা।

মিথাংএর সাথে সদ্ভাব জমিয়ে তোললাম। মিথাংও আমাকে আপন করে নেয়। কত সরল, কত মিষ্টি, কত মিশুক মিথাং!

"How shall you spend your days," "Buddhism", "The way to India", "International Affairs"-ইত্যাদি বই সে চুপি চুপি আমাকে পড়তে দেয়। আমি বেশ আনন্দ পাই। আমার জেল জীবনের বেদনাযুক্ত মুহূর্তগুলো নতুন আনন্দ আর বিচিত্রজ্ঞানে সুস্থ ও পুষ্ট হয়ে উঠে।

মিথ্যাং আমায় দাবা খেলা শিখিয়েছে। বেশ অদ্ভুত খেলাত! পূর্বে দাবার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল। এতে সময় নষ্ট হয়, বাজে নেশা ভূতের মত চেপে বসে

www.pathagar.com

মনমগজে। কিন্তু এখন আর এসব বদ ধারণা দাবা সম্বন্ধে নেই। জেলের একঘেয়েমী জীবনের অসুস্থ সময় অপহরণ করার জন্যে দাবাই উৎকৃষ্ট খেলা।

দু'রাজ্যের সংঘর্ষ, সাদা ফৌজ আর কালো ফৌজের যুদ্ধ। সাদা সৈন্য এগিয়ে চলল হাতী ঘোড়া নৌকার বুহ্য রচনা করে। কালো সৈন্যও দিল ছুট। হাতী কোণাকোণি, ঘোড়া আড়াই লাফে, নৌকা সোজা পথে ভীষণ আক্রমণ চালাল। মিথাং হাতি দিয়ে চেক দিয়েছে আবার ধবল রাজাকে। এখন উপায় নেই। মাত্র আড়াই লাফে দিল আমার মন্ত্রীকে সাবার করে। উত্তেজিত হয়ে পড়ি। ইচ্ছে হয় মিথ্যাংকে এক ঘুষি মেরে মন্ত্রীটা আবার তুলে নেই সুবিধাজনক স্থানে। কিন্তু এ ত আর সম্ভব নয়, প্রথম চালেই ত বিরাট ভুল করে ফেলেছি। পদাতিক সৈন্যদেরকে লাগামহীনভাবে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে শক্তিশালী ঘোড়া ও নৌকা পদাতিক সৈন্যের ছত্রছায়া হারিয়ে শক্তি প্রয়োগের সুযোগ হারিয়েছে। যুদ্ধে বাজীমাৎ করার সুযোগ ত পেলই না; বরং ঠুটো জগন্নাথের মত মারা পড়ে কলংক রচনা করল জাতির ইতিহাসে। ভয় পেয়ে গেলাম। মনটা আশংকায় দুলে উঠে। কালো সৈন্যগুলো যদি ইন্ডিয়া হয়, আর সাদা সৈন্য আমাদের দেশ? ওয়্যার হিস্টিরিয়া ত একেই বলে! যুদ্ধ ময়দানের চেহারা বদলে গেলে মন মানসিকতারও বৈকল্য এমনি ভাবে ঘটে! কত হিটলার, কত নেপোলিয়ানকে যে এটি কাবু করছে তা আজ সম্যক হৃদয়ংগম করার সৌভাগ্য জুটল।

মিথাং মনের কথা খোলে বলে।

সে ও তার দেশবাসী ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। চাকুরী-বাকুরী, কল-কারখানায়, খেত-খামারে, শিক্ষা-দীক্ষায় ওদের মনিপুরী অঞ্চলকে দাবিয়ে রেখেছে "হিন্দু সরকার"। ওরা ভারতীয় হিন্দুদেরকে হিংসুটে, লোভী ও ক্ষমতা লিপ্সু হিসাবে ঘৃণা করে। হিন্দুরা মনিপুরের "কি পোস্ট" গুলো দখল করে রেখেছে। মনিপুরের লোকদের জন্যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলতে শুধু পাঁচটি প্রাইমারী স্কুল আর দুটি হাইস্কুল থাকায় শিক্ষিতের হার মাত্র ৫% জন। মনিপুরীরা এখনও মেডিয়্যাভেল এজ-এ বসবাস করছে। এখানকার জনসাধারণ গো-পূজা, পাথর পূজা, কদাচিৎ মনুষ্যও বলী দিয়ে থাকে। ওদের বাড়ীঘর এখনও শণ, গোলপাতা আর কাঠ দিয়ে তৈরী। বিয়েশাদী জোর জবরদস্তী ও বংশ অহংকারে হয়ে থাকে। খুন-খারাবি, রাহাজানি হরহামেশা সংঘঠিত হচ্ছে ওদের দেশে। সাপ, ব্যাং, তেলেপোকা, ষুটকী আজও ওদের খাদ্য মেনু। মিথাং আই.এ. পাস করেছে। 'ও' সমাজের এ দূরবস্থা দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর। দেশের যুবসম্প্রদায় মিথাং-এর নেতৃত্বে আজ সংঘবদ্ধ ভাবে সজাগ, জীবনবাজ। ওরা মুক্তি চায়, ওরা অটোনমি আদায় করতে সংকল্পবদ্ধ।

মনিপুরী বন্দীরা বেশ কর্মঠ। এক মুঠো ভাত, চার রুটি খেয়েও এরা স্বাস্থ্যের সক্ষমতা বজায় রাখার প্রয়াস পায়। ঘুম থেকে উঠেই সাত সকালে ও সন্ধ্যায় খালি হাতে ব্যায়াম করে। বুকডন, বটনী, মাথাটা নীচে দিয়ে পাদুটো উপরে তুলে রাখে। শবাসন, পদ্মাসন, ধণুরাসন ইত্যাদি সব আসনই ওরা চর্চা করে। বেশ সুন্দর দেখায় তখন ১নং ওয়ার্ডটিকে। এ ওয়ার্ডটিকে এরা আদর্শ শরীর চর্চা কেন্দ্র বানিয়ে ফেলেছে।

আমারও চেতনায় আসে ব্যায়াম করতে হবে। নইলে হাতপাগুলো বাতে ধরবে দিনের পর দিন বসে বসে খেলে। শুরু করে দিলাম শরীর চর্চার কসরৎ। সুলেমান ভাই, তালেব আলী টিপ্পনী দেয় ঃ

www.pathagar.com

— দুই রুটি খাইয়াও এত জোর তোমার!

—পঁচা তরকারী আর বালি কংকরে মিশ্রিত ভাত রুটি খেয়ে পাকস্থলীতে আদবা ময়লা জমে গেছে। এসব ময়লা পরিষ্কারের জন্যেই না একটু আধটু ব্যায়াম করছি, বুঝলেননা।

সত্যি, সকাল বিকাল হাসপাতালে যেতে হয় অধিকাংশ কয়েদী হাজতীকে। পেটে অসুখ, আমাশয়, ক্রিমি, চুকো ঢেকুর, ইত্যাদি রোগ হরদম লেগেই আছে ওয়ার্ডে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে। ব্যায়ামটা বড্ড উপকারী পেটের জন্যে। বিশেষ করে আসনসমূহ আশ্চর্যজনক সুফল সৃষ্টি করেছে আমার পেটের রাজ্যে।

মিথাং খুব ভাল। এর জন্যে আমি জেলখানায় ব্যায়াম করতে শিখেছি। দেহ-মন সতেজ রাখতে পেরেছি। শুধু দেহমন কেন, অবসর সময় বিনোদনের কলাকৌশল, বই পড়া, তাস খেলা, দাবাও শিখেছি। মিথাং এর সাথে পরিচয় হওয়ায় মিথাং এবং ওর সাথীরাও আমায় ভালবেসেছে।

ওরা বলে ঃ

Muslims are the decendents of Badshas. We like them, love them, adore them, because they are the men of royal taste and culture. They have the mentality of righteous rulers, not that of the mean slavery.

টি-স্টেট ম্যানেজারের করুণ কাহিনী

দুয়েক দিনের মধ্যে বাঁধ ভাংগা জোয়ারের মত সারি বেঁধে পাকিস্তানী বন্দীরা এসে ১নং ওয়ার্ড গিজগিজ করে তোলল। এই জোয়ারের টানে সিলেটের এক টি-গার্ডেন স্টেট ম্যানেজার রাজ্জাক সাহেবও পৌঁছলেন ১নং ওয়ার্ডে। ভদ্দ লোক ননবেঙ্গলী। সংগে তিনটি ছেলে রয়েছে ৫, ৭ ও ৯ বছর হবে। ভদ্দ লোকের স্ত্রী ও দু বছরের একটি মেয়ে সন্তান রয়েছে ফিমেল ওয়ার্ডে। প্রথম ২/৩ দিন কোলের মেয়েটি ফিমেল ওয়ার্ডে কেঁদেছিল বাবার জন্যে। ৫ বছরের ছেলেটি ১নং সেলে কেঁদে ছিল মায়ের জন্যে। ওদের কান্নার সুর আর রাজ্জাক সাহেবের সংযত আনন ও সোহাগ দেখে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। এ করুন দৃশ্যে বুক হিম হয়ে যায়। রাজ্জাক সাহেবের কাছে ত্বরিত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। তিনি ইংরেজী ও উর্দু মিশিয়ে নিজের বর্তমান অবস্থার কথাচিত্র তুলে ধরেন নিষ্পাপ শিশুর মত অনাবিল জবানীতে ঃ

পাক বাহিনী চা-বাগানে পৌঁছার পূর্বে মুক্তিরা হিন্দুস্তান থেকে গোলাবারুদ কামান নিয়ে চা-বাগান আক্রমণ করতে আসে। ওদের অস্ত্র-শস্ত্র দেখে স্থানীয় সবাই পালিয়ে যায়—কেহ কেহ হিন্দুস্তানে, কেহবা পূর্ব-পাকিস্তানের অভ্যন্তরে। রাজ্জাক সাহেব বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করেননি। ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্যে মুক্তিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এরা সীমান্ত পার করে আফগানিস্তান পাঠিয়ে দেবে শর্তে ত্রিশ হাজার টাকা তার কাছ থেকে আদায় করে। রাজ্জাক সাহেব সপরিবারে নিজের জীপে উঠেন। সংগে কিছু কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র-রেকর্ড প্লেয়ার, সিংগার মেশিন, ইলেকট্রিক ইস্তারী, গহনাপত্র ও সুটকেস বেডিং নিয়ে নেন।

মুক্তিরা তার জীপ চালিয়ে আগরতলার থানায় এনে তাকে সপরিবার হাওলা করে দেয়। ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে কোর্ট দারোগা রাজ্জাক সাহেব, তার স্ত্রী ও তিন ছেলেকে

www.pathagar.com

জেল কাস্টডিতে পাঠান, কিন্তু দু বছরের মেয়েটি সম্পর্কে কোর্ট থেকে কোন নির্দেশ না থাকায় জেলার বাবু মেয়ে-শিশুটিকে মায়ের সাথে জেল কম্পাউন্ডে ঢুকতে দেননি। জেলার বাবুর যুক্তি হচ্ছে ঃ

—শিশু মেয়েটিকে বিনা নির্দেশে আমি জেলখানায় যদি থাকতে দেই তবে ওর বেবী ফুড, খাদ্র-সামগ্রী ও পোশাক কে দেবে, কিভাবে দেবে? তাছাড়া শিশুটির যদি কোন কারণে কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা মৃত্যু হয় তবে এর জন্য কে দায়ী হবে?

এতদসত্তে-ও জেল সুপার মানবতার খাতিরে শিশুটিকে মায়ের সাথে ফিমেল ওয়ার্ডে পাঠানোর অনুরোধ জানান। তখন জেলার বাবু বলে উঠেন ঃ

—স্যার, তাহলে আপনি লিখিত অর্ডার দিন।

—লিখিত অর্ডার দেয়ার মালিক ত আমি নই, ও ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। কাল এ অর্ডার আনিয়ে দেব।

—না স্যার, আমায় পীড়াপীড়ি করবেন না। কারণ যদি আজ রাত্রেই এই শিশুটির কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তবে?

এভাবে যুক্তির যুদ্ধে শিশুটির ভাগ্যের পরাজয় হল। সেদিন মা-বাবা থেকে পৃথক করে এই ছোট মেয়েটিকে জেলখানার বাইরে রাখা হল। পরের দিন দুপুর ১২টার পর যথাযথ অনুমতি পাওয়ায় নিষ্পাপ শিশুটি তার মা'র কোল ফিরে পেল জেলখানার চৌহদ্দীতে।

রাজ্জাক সাহেব আরও বললেন, সেদিন জেলখানার বাহিরে তার শিশুটির বুক-ফাটা কান্নায় তার স্ত্রী মোট নয় বার চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আগরতলা জেলের দিনগুলোর মধ্যে ঐ রাতটাই ছিল তার জীবনের জন্য জঘন্য "কাল" রাত্রি।

রাজ্জাক সাহেব এক মাস দশ দিন ছিলেন ১ নং ওয়ার্ডে। প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও শেষ রবিবার ১নং ওয়ার্ডের সবুজ চত্তরে চিত্ত বিনোদনের জন্যে সিনেমা দেখান হত জেলখানার সমস্ত কয়েদী হাজতীদিগকে। ব্যতিক্রম ছিল "টেরোরিস্ট" বা "এক্সট্রিমিষ্ট" বন্দী। এ সময় রাজ্জাক সাহেব ছেলেদেরসহ স্ত্রীর সাথে দেখা করতেন। সিনেমা দেখার পরিবর্তে সুখ-দুঃখের বাক্য বিনিময় করতেন স্ত্রীর সাথে পাশে বসে। আমি তাদেরকে প্রশান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য করতাম। একদিকে রাজ্জাক সাহেবের জীবন-ধর্মী অভিনয় অপর দিকে সামনে টাংগানো রূপালি পর্দার সিনেমা-দুটোই উপভোগ করছিলাম দুদিকে তাকিয়ে। অশোক কুমার অভিনীত "আঁধেরী মে রৌশনী", জহর গাংগুলী অভিনীত "বাবলা", নূরজাহানের "পুকার" দেখেছি এমনিভাবে। নিজের পরিবার পরিজন ও স্ত্রী-পুত্রের স্মৃতি দাহনে তখন জ্বলেপুড়ে মরেছি। রাজ্জাক সাহেবের স্ত্রীর মত যদি আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে জেলে থাকত তাহলে কি মজাই না হত। অসহায় বিচ্ছেদ যাতনা থেকে পরিত্রাণের জন্যে সিদ্ধান্ত নিলাম সিনেমা আর দেখবো না। কারাগারে সিনেমা উপভোগ জেলা জীবনকে আরো বিষয়ময়ও ব্যথাতুর করে তোলে। এটা বিনোদনের ব্যবস্থা মোড়কে মানসিক শাস্তি বৃদ্ধির আর একটি টেকনিক বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল।

রাজ্জাক সাহেবও একদিন ১ নং ওয়ার্ড থেকে ছাড়া পেলেন সাত ভরি স্বর্ণ ও নগদ পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে। সপরিবারে মুক্ত পৃথিবী ফিরে পেলেন আবার। আল্লাহর দরবারে হাজার শোকরিয়া জানাই রাজ্জাক সাহেবের মুক্তিতে। পরিবারসহ তার বন্দী জীবনটা আমার বন্দী জীবন থেকেও অত্যন্ত দুঃসহ মনে হতো। রাজ্জাক সাহেবের পারিবারিক জীবনের বিয়োগ-বিধুর অংকের ইতিতে আমি নিজের পারিবারিক

www.pathagar.com

জীবনেরই যেন তৃপ্তি পেলাম ঐশী ভাবে। যাওয়ার সময় নিজের ব্যবহৃত গোলাপী টাওয়েলটা তিনি আমাকে স্মৃতি-নির্দশন হিসেবে দিয়ে যান। টাওয়েলটায় মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম সেদিন, অনুভব করেছিলাম সেদিন আমার পুঞ্জীভূত অনেক অব্যক্ত বেদনার প্রশমন আর হৃদয়ের সুস্থতা।

আব্দুর রহমানের খালাস

কাক ডাকা দুপুর। ১নং ওয়ার্ডের কয়েদী-হাজতীরা ঝিমুচ্ছিল। কেউ বা কালো কম্বলের আবরণে এপাশ-ওপাশ করছিল হয়ত মানসিক অস্থিরতায়; নয়তোবা একটু আরামের নাগাল পাবার জন্যে। ওদের কালো কম্বলে মোড়া দেহের দিকে তাকালে মনে হয় ঃ কিছু মহিশ বুঝি "সান বাথ্" করছে ওয়ার্ডের ভেতরে।

"নতুন বৌ কাঁন্দেরে সোয়ামীরও লাগিয়া,
সোয়ামী তার গেছে বিদেশে নকরী লইয়া।"

ধোপাঘর থেকে মধুর সুর ভেসে এল ১নং ওয়ার্ডের রাজ্যে। গরুচোর আবদুর রহমান। কোকিল কালো রহমানের কণ্ঠস্বর কোকিলের মতই মধুর লাগল। খেমটা দুপুর বধূয়ার কাহিনীতে যেন গলে গিয়ে মোলায়েম ঠেকল।

—রহমাইন্যারে, আমার কাপড়গুলির ইস্তারী অইছে?

—জ্বী হুজুর, হবে সারলাম, আমি আনবার লাগছি এহনি। রহমান কাপড়গুলো তা করে দৌড়ে পৌঁছে জমাদার বাবুর কাছে। জমাদার বাবু তখন গালগল্প করছিলেন হাসপাতালের মেট অবিনাশের সাথে।

রহমান ফিরে এসে আবার ইস্তেরীতে লেগে যায়। এবার আর ঐ পুরানো গানটা ধরে না। নতুন সুর তুলে ঃ ..."ফাঁন্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে, বগীরও লাগিয়া...।" কী অর্থপূর্ণই না এ'গানটি আজ রহমানের জীবনে! ফাঁন্দে আটকানো রহমান আপনার মনের মাধুরী মিশিয়েই সুর ধরছিল; সুরের বিরহ রাগিনীতে বোধ হয় ভেসে উঠছিল আব্দুর রহমানের স্ত্রীর বিচ্ছেদ-বেদনা।

আব্দুর রহমানের স্ত্রী এই মুহূর্তে সম্ভবত উস্কুখুস্কু চুল ছড়িয়ে বোবা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চেয়ে আছে অনন্ত আকাশের দিকে। বসে বসে ভাবছে তার কিসমতের কথা। নতুন বৌ ঘরে আসতে না আসতেই সোয়ামী তার হারিয়ে গেছে হিন্দুস্তানের জেলখানায়। হয়ত বা সে আর ফিরবে না। যাবজ্জীবন জেল হলে ত সব ল্যাঠা চুকেই গেল ওর। আর যদি বা কোন কারণে ছাড়াও পায় তবে কি সে আবার দেশে ফিরবে? যদিই বা ফিরল, তাকে কি রহমান সেই পূর্বের মায়া-মমতা দিয়ে আলিংগন করবে; না তালাক দিয়ে অন্য একটি টুকটুকে মেয়ে নিয়ে তার দাম্পত্য জীবনের শূন্যতা পূরণ করবে? গোটা সংসারটাই ত যোগ-বিয়োগ-পূরণের পালা! বিয়েতে যোগ, মৃত্যুতে বিয়োগ, মীরাছে পুরণ-ভাগ। এটাই জীবন, এটাই ত প্রকৃতি রাজ্যের অনুশাসন। মানুষের জীবনটাই ত অংক শাস্ত্র!

হয়ত এমনও ত হতে পারে যে রহমানের বৌ "করমচা"র বিয়ে অন্যত্র হয়ে যেতে পারে। বাপ-মা বোধ হয় প্রায়ই শাসাচ্ছে ঃ দেখ্, তোর সোয়ামী আর দেশে ফিরছে না। সে ভিন্‌দেশে চলে গেছে। পুরুষের মন বড়ই দুর্বল রে; যখন সে বিদেশে চলে যায় তখন তার কত ভাব-ভাবনা জাগে মনে। বিদেশী মেয়েরা ওর সুকণ্ঠের টের পেলে 'লাইন' লাগাবে, এতে সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

—না, না, তা হতে পারে না। আমার মন সাক্ষী দিচ্ছে, সে আমাকে ভুলবেনা। আমার বয়স এখনও কুড়ি পার হয়নি, ওর-ও তেমনটি বয়স নয়। নব-জীবনের দাম্পত্য সুখ সে কিছুতেই ছিঁড়বে না। চার বছর গেছে, আরও চার বছর যাক তারপর না এলে বুঝবো, সো আর জীবন নেই আমার জন্যে। তখন দেখা যাবে কি করা যায়?

"ফাঁন্দে পড়িয়া বগায় কাঁন্দেরে"—আহঃকী মধুর সুর, কী নিরেট সত্য এই কলিটুকু! রহমানের দাম্পত্য জীবনের কল্পনা করে আমি নিজের সংসারটাকেও যেন হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি লৌহ প্রাচীরের প্রকোষ্ঠে।

বছর পাঁচেক আগে রহমানকে গরু চুরির অভিযোগে জেলখানায় ঢোকানো হয়। এ পর্যন্ত ৫/৭ বার সে কোর্টে হাজিরা দিয়েছে। বিচারের তারিখ পড়ে শুধু, বিচার বা শুনানী হয় না। তদবীর করার মতও কেহ নেই। বাড়ী পূর্ব-পাকিস্তান বর্ডারের কাছে সোনামুড়ায়। বিয়ে করেছিল জেলখানায় আসার মাস কয়েক আগে। নতুন বৌএর চেহারাটা আজ তার তেমন মনে নেই। তবে তার কোমল পরশটার স্মৃতি মাঝে মাঝে তাকে বিষণ্ন করে তোলে।

পাঁচ বছর গত হল নতুন বৌ রেখে এসেছে বাড়ীতে। ধীরেন শুধায় ঃ

—কিরে রহমাইন্যা, তোর বউ কি এখনও তোর জন্য বইয়্যা আছে?

—অই শ্যালা চুপ থাক্। আগে একটুহানি ঘুমইয়্যা লই। ঐ মাগীর কথা আর কইছনা। ৫ বছর ধইরা আমার খবর নাই তার কাছে। আমিও জানিনা "মাগী" কি এখনও আছে না অন্য বেডার কাছে "হাংগা বইছে। আসলে বড় দুঃখ হয়রে হেতীর (ওর) লইগ্যা। মাঝে মাঝে মনটা মোচড় দিয়ে ওডেরে। এইসব কতা আর তুলিছনা। রহমান দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ওয়ার্ডের ছাদে মাকড়াসার জালটার দিকে তাকিয়ে গুনগুনিয়ে সুর তুলে ঃ

"ফাঁন্দে পরিয়া বগা কাঁন্দেরে বগীর-ও লাগিয়া...."

খুব করুন সুর। এতে সাক্ষাত বিচ্ছেদের বেদনা স্পর্শ রয়েছে। রয়েছে রহমানের স্ত্রীর তরে ধিকি ধিকি বিরহ জ্বালা।

১নং ওয়ার্ডের কালো কম্বল মোড়া অধিবাসীদের ঘুমের চেষ্টায় এপাশ ওপাশ এর দৃশ্যটা মনে হচ্ছিল এক পাল মহিষ যেন কাদামাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

হঠাৎ বিকালে আবদুর রহমানের ডাক পড়ল জেল গেট থেকে। জমাদার বাবু এলেন ঃ রহমাইন্যা তোর "খালাসের" অর্ডার অইছে। বাইর‍্যা শ্যালা।

আবদুর রহমান হাসে। রান্না ঘরের চুলায় কাজ করে তার ঈষৎ কৃষ্ণ দেহ তামাটে হয়ে গেছে। সারা দেহ তেল-তেলে। কুচকুচে বিরাট খণ্ডত বৎ গোঁফের নীচে বড় বড় শুভ্র দাঁতগুলো ভেসে উঠে কালোমেঘ ভেদকরা বিদ্যুতের চমক সদৃশ।

আমি ও আমার মত অন্য সবাই চেয়ে আছি তার দিকে....

গরুচোর আবদুর রহমান চলে যাচ্ছে। জমাদার বাবু বললেন ঃ যা শ্যালা, তোর মা-বৌ এর সাথে দেখা কইরা বুকের জ্বালা মিটা গিয়া।

৫ বছর জেল খাটা শেষে আবদুর রহমানের রায় হয়েছিল ঃ সে গরু চুরি করে নাই। তাই তাকে বেকসুর খালাস দেয়া গেল। সেদিন এই আবদুর রহমানই আমাকে সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে প্রহার করেছিল। সিরাজ ভাই এসেপড়ায় বেঁচে যাই তার রোষ থেকে। আবদুর রহমানের খালাস আমার মনে বেচইন ভাব রচনা করেছিল তাঁর নিরপরাধ ৫ বছর সাজার চিন্তায়।

www.pathagar.com

পুরস্কার এই বেহেস্ত

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টে যেসব প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে পাকিস্তনের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, ১৯৭১ সালের ৩ রা মার্চের পর থেকেই সেসব প্রতিশ্রুতির প্রতি কৃতগাদ্দারীর পরিণামে পাকিস্তানের বৈকল্য ও বিকালাংগ ঘটেছে; এর পূর্বাঞ্চল পূর্বপাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য সংগ্রাম মুখর হয়ে উঠে।

হিন্দু-মুসলিম দু'জাতঃ কী শিক্ষা, কী সংস্কৃতি, ধর্ম বা সামাজিকতার মৌলিকত্বে। সদ্যপ্রসূত শিশুর জন্ম থেকেই এর জন্ম শুরু, এবং মৃত্যুতেই এর পরিসমাপ্তি। উত্তরাধিকার সূত্রে এ প্রবাহ অদ্যাবধি প্রবাহমান, অনির্দিষ্টকালেও এর জের থাক্‌ছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে বলাটা ঠিক নয়। কারণ আমার ঈমান অনুযায়ী ঈসা (আঃ) যখন দুনিয়ায় তাশরীফ আনবেন তখন গোটা মানব জাতিই ইসলাম গ্রহণ করবে। সেসময়ে অন্য কোন জাতি থাকবে না।

হিন্দুসন্তানের নাম জগদীশ্বর, নারায়নপাল, মধুসূদন ইতাদি। মুসলিম সন্তানের নাম আব্দুল্লাহ্, নূর মোহাম্মদ, শাফয়াত হোসেন এবং এ জাতীয়। জন্মের পর-পর নাম রাখা থেকেই হিন্দু-মুসলমানের সৃষ্টিগত পার্থক্য সূচিত হয় কী জ্ঞাত, কী অজ্ঞাত; কী ধর্মীয় গোড়ামী, কী রছম তথা লৌকিকতায়। কূটতর্ক অথবা প্রতিহিংসার স্বাদ মেটানোর জেদ্ ব্যতীত এ-নিয়ে কোন সংঘর্ষ বা সমস্যার সৃষ্টি হয় না, হতে পারে না। হওয়াটা স্বাভাবিকও নয়। এর ব্যত্যয় যারা করে এরা হয়ত মতলববাজ, নয়ত নরবেশী দুষ্কৃতিকারী।

এমনিভাবে সম্ভ্রান্ত ধর্মপরায়ণ হিন্দু পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা জীবন শুরু হয় শ্রী স্বরস্বতীর চরণ ছুঁয়ে, মুসলমানদের বেলায় পাক কোরআনের আয়াত পড়ে। বাল্মিকী রচিত রামায়নমহাভারত দিয়ে হিন্দুদেরকে ধর্মে দীক্ষিত হতে হয়, মুসলমানদের ইসলাম গ্রহণ করতে হয় হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ওহী-প্রাপ্ত আল কোরআন বরন করে। একজনের ধর্মের ভাষা সংস্কৃত, অন্যজনের আরবী। ধর্মানুশীল হিন্দুদের দিবা কর্মের শুরু হয় 'শঙ্খ' ফুঁকে, উপসংহার ঘটে আরতীর ঘন্টা বা ফের্ শঙ্খ ধ্বনি সৃষ্টিতে। মুসলমানদের দিবারম্ভ ও দিবাবসান তথা ফজর হতে এশা পর্যন্ত কর্মজীবনের শুরু-শেষ হয় আযান দিয়ে।

এমনিভাবে খাদ্যাখাদ্যের কতিপয় ক্ষেত্রও প্রচণ্ড পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন "গরু" ঃ দেবতা' হিন্দুদের, হালাল সুস্বাদু খাদ্য মুসলমানের। একজন পূজা করে, অপরজন এটাকে কোরবানী দেয়।

পানির বেলায়ও এ পার্থক্যটি লক্ষণীয়। বাংগালী মৌল হিন্দুরা এটাকে 'জল' বলে, সংস্কৃতিমনা মৌলবাদী মুসলমানেরা বলে 'পানি'। এ প্রসংগে কোর্ট দারোগা গৌরাঙ্গ বাবুর কথাটা মনে পড়ল। বৃটিশ জামানার দারোগা তিনি। চোর-ডাকাত-বদমায়েশ তথা ক্রিমিনালস্‌দের পরিবেশে চাকুরী করেও তিনি আপন সংস্কৃতি চেতনা হারাননি। আমি 'পানি' চেয়েছি তিনি তা দিতে অস্বীকার করলেন। "জল খেতে পার"—এই বলে তিনি 'পানি'কে আমার জবানীতে 'জল' বলিয়ে পানি পান করতে দিয়েছিলেন সেদিন।

অষ্টম শ্রেণী পাস 'দারোগা গৌরাঙ্গ বাবুর' চেয়ে 'সংস্কৃতিমনা গৌরাঙ্গ বাবুকে' বড়ই ভাল লাগছিল। তাঁকে সেদিন মনে মনে নির্মল শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম বৃটিশী আমলের

www.pathagar.com

পেশায় থেকেও তাঁর এহেন স্বীয় সংস্কৃতির প্রতি টনটনে নিষ্ঠা ও অভিব্যক্তির জন্যে। সেদিনই আমি হিসাব কষে উত্তর পেয়েছি ঃ ভারত বিভিন্ন জাত-পাতেরএত বিরাট দেশ হয়েও কেন বেশ শক্তিশালী। গাছ যেরূপ শিকড়ের জন্যে মজবুত থাকে, তেমনি একটা দেশ তথা জাতিও সংস্কৃতির কারণে শক্তিশালী হয়। গৌরাঙ্গবাবু এর প্রমাণ দিলেন।

সংস্কৃতি-সচেতন হিন্দুরা মাংস খায়, মুসলমানেরা গোস্ত। এমনিভাবে মা-বাবা-পিসীর সমান্তরাল আব্বা-আম্মা-খালার প্রচলন রয়েছে এখনও। ওরা বাবু-মশাই-ভদ্দলোক হিসেবে সম্বোধিত, এরা মিয়া-মোল্লা-মুন্সী অনেককে অ-সম্ভ্রান্ত হিন্দু লেখক তাচ্ছিল্যে যবন বলেন। যবন এর অর্থ আশুতোষ অভিধান দ্রষ্টব্য। এমনিভাবে অভিবাদনের শিল্পচর্চাতে 'আদাব-নমস্কারের' সমতায় 'আসসালাম' ইত্যাদি এ দুটো জাতিতে এ পর্যন্ত অভিজাত রেওয়াজ হিসেবে নমস্য ও স্বীকৃত।

সবশেষে মরদেহ বা লশের কথা। ওরা মরদেহ পুড়ে ছাই করে দেয়, এরা মাটি করে দেয় সমাধিস্থ করে। সুতরাং মৌলিক তথা Basically এ দু'জাতির সৌন্দর্য, শালীনতা ও স্বাতন্ত্র স্বাভাবিক ভাবেই বিরাজমান। পদ্মা-মেঘনার পানির মত উভয় কৃষ্টির স্বাতন্ত্রিক প্রবাহ সচল ও স্বীকৃত।

জীবানুমুক্ত পানির অপর নাম যেমন জীবন; তেমনি বীজানু সমৃদ্ধ পানির অপর নাম নির্ঘাত মৃত্যু। কৃষ্টির ক্ষেত্রেও তা-ই।

মুহাম্মদ-বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় থেকে শুরু করে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত অবিভক্ত ভারতের হিন্দু-মুসলিম কৃষ্টি পুরোপুরি জীবানুমুক্ত নাহলেও বীজানু সমৃদ্ধ ছিলনা। পলাশী যুদ্ধোত্তর ফিরিংগীবীজ এদেশের কৃষ্টি সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করল। ফিরিংগী তথা বেনিয়াইংরেজ 'শাসক' হিসেবে আবির্ভূত হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়কে দলে ভীড়াল।

মুসলমানদের শিক্ষা-চাকুরী, প্রশাসন, ধর্ম-সংস্কৃতি ইত্যাদিতে পঙ্গু ও অথর্ব করার জন্যে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নীতি," "অধীনতামূলক মিত্রতা' ইত্যাদি পলিসি জারী করল। ফার্সী-ভাষা উপড়িয়ে ইংরেজীভাষা শিক্ষা ও চাকুরী-বাকুরী, প্রশাসন এবং কোর্ট কাছারীর ভুবনে জারী করল। ফলে ফার্সী ভাষাভাষী সুশিক্ষিত, প্রভাবশালী বড় বড় পদাধিকারী ও অভিজাত মুসলমানদের মন-মগজ এবং মসী মুক ও অকেজো হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত, ওদের দোসর হিসাবে এবং ওদের উষ্ণ আনুকূল্য লাভের লোভে তদানীন্তন উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা নিজেদেরকে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানসে মুসলিম সংস্কৃতি বিধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। বালগংগাধর তিলকরে 'গো হত্যা নিবারণ আন্দোলন' থেকে শুরু করে মুসলিম বিদ্বেষী 'কংগ্রেস আন্দোলন' জোরদার করন, মিঃ জিন্নাহ্‌কে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার জন্য কংগ্রেস পার্টির মন্ত্রী পদ গ্রহণের টোপ প্রদান, ইত্যাদি কর্মকাণ্ড মুসলমানদেরকে অত্যন্ত শংকিত ও বিপর্যস্ত করে তোলল, বিশেষ করে রাজনীতি ও প্রশাসন ক্ষেত্রে।

সংস্কৃতপুষ্ট বাংলা ও ফিরিংগীসভ্যতা সমৃদ্ধ ইংরেজীশিক্ষা গ্রহণ করাটাকে মুসলমানগণ তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তথা কৃষ্টিগত সম্পদের জন্যে বিপজ্জনক মনে করল। ইত্যবসরে হিন্দুরা পাশ্চাত্য ও হিন্দুয়ানী শিক্ষা-দীক্ষা সোৎসাহে অর্জন করে প্রায় একচেটিয়া চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ক্ষমতাধর হয়ে

www.pathagar.com

উঠল। এরসাথে ভারতের মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা তাদেরকে আরো সুযোগ সৃষ্টি করে দিল এ্যাংলো-হিন্দু প্রতিপত্তি বাড়ানো ও খাটানোর। এভাবে ইংরেজ ও হিন্দুদের যুগ্ম কূটচাল ও চাপে মুসলমানদের মনমগজ ও আচরণ গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ করার রাজনৈতিক প্রয়াস প্রকট হয়ে উঠে।

উক্ত পটভূমির অংকে জন্ম নেয় পাকিস্তান-কনসেপ্ট ও কনভিকশন। 'লড়কে লেংগে পাকিস্তান' শ্লোগানের ক্ষুরধারে 'বঙ্গভঙ্গ রহিত পরিবেশ' ভণ্ডুল হয়ে যায়। তথাকথিত ভারত মাতা ১৯৪৭ সালে দ্বিখণ্ডিত হয়ে প্রসব করে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্টে হিন্দুস্তানের।

সোজা কথায় ঃ শ্রী বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম' আর সুবাস বসুর 'জয় হিন্দ' ও এর পরিণতিতে আবশ্যকীয়ভাবে সৃষ্ট 'লড়কে লেংগে পাকিস্তান' ও 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' এর হিন্দু-মুসলিম কৃষ্টিগত সংঘর্ষে জন্ম হল এ দুটি দেশের। এটি ইতিহাস ও প্রকৃতিজাত সত্য।

দীর্ঘ ২৫টি বছর পাকিস্তান টিকল দুনিয়ার বুকে এর দুটি পৃথক অংশ পূর্ব পাকিস্তান ও পাশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যভাগে বৈরী বিশাল ভারতকে মেনে নিয়ে। এঘটনা ও এবাস্তবতা অবশ্যিই একটি অলৌকিক তথা 'মিরাকল' বিশেষ। এই দু'পৃথক অংশের একক ও অদ্বিতীয় বন্ধন ছিল ইসলাম যা এবসট্রাক্ট, আর একারণে এটি ডিভাইন ও ডেলিকেট মুসলিম কাওম কায়মের জন্যে। প্রথম দশ বছর মুসলিম লীগের অনেকটা একটানা স্বৈর শাসনামলে কত দুর্ঘটনা ঘটে গেল এ অলৌকিক পাকিস্তানের জীবনে, যেমন ঃ ১৯৪৮ সালে প্রথম গভর্ণর কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জল্পনাযুক্ত আকস্মিক ওফাত, হিন্দুস্তানের চাণক্যচালে হায়দ্রাবাদ দখল ও কাশ্মীরের বৃহদাংশ কুক্ষিগত করার সামরিক চাপের সফল্য, লিয়াকত আলী খানের শাহাদাত বরণ, এসকান্দার মীর্জার প্রেসিডেন্ট পদ দখল ও পদচ্যুতি, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক তথা সামরিক শক্তির অবৈধ প্রয়োগে প্রেসিডেন্টের পদে সমাসীন হওয়া, ১৯৬৫ সালে ভারতের চাপান সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে পাকিস্তানের বিজয়াসন্ন মুহূর্তে বৃহৎ শক্তিগুলোর গাদ্দারী, ইত্যাদি এসব ঘাত-অপঘাতের আবর্তে দেশটির অস্তিত্ব জরাজীর্ণ হয়ে পড়ল। এর সহগ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতাপ ও বেইনসাফী গোটা পূর্ব পাকিস্তানের সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিরাট ধ্বস সৃষ্টি করে। অবশেষে এর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটল জনাব শেখ মুজিবের ৬ দফা আন্দোলনের অগ্নিমূর্তিতে ঃ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবী, প্যারা মিলিটারী স্থাপন, পৃথক মুদ্রা চালুকরণ, স্বায়ত্বশাসন, ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকারন্তরে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জোর দাবী উত্থাপনে।

পাশাপাশি তথাকথিত মেকী ইসলামদরদী প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় জুয়া, মদ্যপান, বেশ্যাবৃত্তি, চোরাকারবারী, ব্যবসা-চাকুরী ক্ষেত্রে স্বজন প্রীতি জেঁকে বসল গোটা দেশ জুড়ে। এদেশের অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনে 'স্যাকুলার' ও ইসলাম নামধারী রাজনৈতিক পার্টিগুলো সমাজে অনৈসলামী ও ইসলাম বিরোধী সুযুক্তি ও

www.pathagar.com

সঠিক জ্ঞান ভিত্তিক আচরণের পরিবর্তে অস্ত্রসদৃশ জবানের কটু প্রয়োগ ও বাস্তবতায় পেশী শক্তির লড়াইয়ে ময়দান দখলের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'আগে বাঙ্গালী, পরে পাকিস্তানী সবশেষে মুসলমান', না 'আগে মুসলমান পরে বাঙ্গালী ও সবশেষে পাকিস্তানী', ইত্যাদি কূটতর্কে মজে গিয়ে এদেশের বিদগ্ধ সমাজ (?) এক গান্ধা (Stale) পরিবেশের জন্ম দিল। 'কবি রবি ঠাকুর' বাঙ্গালীদের কবি না মুসলমানদের কবি, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের কবি না পাকিস্তানের জাতীয় কবি-এ ধরনের চুলকানিরোগ সাহিত্য-সংস্কৃতি অংগনে মহামাড়ীর মত ছড়িয়ে পড়ল। 'পৃথক নয় যুক্ত নির্বাচন চাই', আর এই চাওয়া অনুযায়ী পাওয়ার পথ নিশ্চিত করার জন্যে 'মুসলিম' পরিভাষাটির [Terminology হিসেবে] অস্ত্রোপচার করার মানসিকতা সৃষ্টি হল মশহুর শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অবয়বসদৃশ নামকরণে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারনের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা এবং প্রশাসনিক দুর্গতি মোচনের চেষ্টা তদবীরের পরিবর্তে উক্ত ধরনের খুজলীরোগ গণদেহে তৈরি করা হল স্বদল ও স্বজনের নাম ও স্বার্থ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এহেন আচরণে দেশপ্রেম ও জনসেবার ওজস্বীনি বকতৃতা চিত্রিত ক্যানভাসের মত আকর্ষণীয় বটে তবে এতে সহৃদয় ত্যাগের তাপ বা চাপ ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না।

লক্ষ্যনীয়, ১৯৪৮ সালে রেসকোর্স ময়দানে মিঃ জিন্নাহর 'বাংলাকে' বাদ দিয়ে গোটা পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দূকে Must করার ঘোষণা উক্ত দুষণীয় পরিবেশকে ক্রমান্বয়ে আরো মারাত্মক করে তুলেছিল। এভাবে নানা কুটিল ও কৃত্রিম অপকর্ম এবং অপরিণামদর্শীতার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে স্বাধীন বাংলার 'মুক্তি সংগ্রাম' অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। 'জয়বাংলা' ধ্বনি এর অনুকুলে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' এর সুরলহরীও এই জমিতে ধ্বনিত হয়ে উঠল 'মৌল ইসলাম' নয় স্যাকুলারের মহানুভবতা কীর্তনে।

এটাও সর্বজন স্বীকৃত, বিদেশী চর বা দুষমন ব্যতীত পাকিস্তান টুকরো হয়ে যাক এটা কেহ-ই চায়নি। বেইনসাফী ও বদআচরণে যেখানে স্বামী স্ত্রীর, মা-সন্তানের বিচ্ছেদ ঘটে অনুরূপ দেশের ক্ষেত্রেও তা ঘটে, ঘটতে পারে বৈ কি!

মুসলিম হিসেবে আমি অ-স্যাকুলার মনমগজী, 'জয় বাংলা' ধ্বনি বিমুখ সংস্কৃতিতে প্রত্যয়ী। এহেন ধারণা ও প্রত্যয়ের জন্যেই কি 'বেহেস্ত' হিসাবে লাভ করেছি '১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হওয়ার সৌভাগ্য'? গৌরাঙ্গ বাবুকে আমি যে কারণে শ্রদ্ধা জানিয়েছি সেকারণের মতো আমি কি বরিত নই?

রাত ৫টার ঘন্টি পড়েছে। ১নং ওয়ার্ডের একটি রাত এহেন ভাবনায় এমনিভাবে কেটে গেল!

সেই ঐতিহ্যের নবোদ্দাম

অবসর সময় বলতে বিকাল বেলায় রুটি খাওয়ার সময়টুকু। এ সময়টুকুতে হাজতীরা ১নং ওয়ার্ডের বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়। তখন প্রায়ই বসে বসে আলাপ হত আমাদের সুলেমানভাই, মহিবুর রহমান, তালেব আলী ও আরও অন্যান্য পাকিস্তানী। কেহ যদি কারো আগে বেরিয়ে যায়, তবে সে অন্যদেরকে মুক্ত করার জন্যে কি কি উপকার করবে তা নিয়েই আলোচনা থাকত সীমিত ও প্রাণবন্ত। দেশে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে খবর পাঠানোর ওয়াদাটা ছিল প্রত্যেকের উপর প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া যার দুটো করে লুংগী বা শার্ট আছে সে মুক্তি পাওয়ার সময় একটি অপর ভাইকে দান করে যাবে,

www.pathagar.com

অথবা দরিদ্র ভাইটির ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে নিজের ভাল জামা কাপড়গুলো দরিদ্র ভাইটিকে দিয়ে সে জেলখানা ত্যাগ করবে।

মদীনার আনসার আর মোহাজেরদের সোনালি ইতিহাস প্রত্যক্ষ হল যেন। সত্যিই একদিন এমনটি ঘটল। বিকাল বেলায় রুটি খেতে বসেছি সবাই। হঠাৎ জমাদারবাবু ক্ষীতিশ ডেকে উঠলেন ঃ

—মহিবুর রহমান কে রে? মুহিবুর ভাই দাঁড়িয়ে যায়।

—আমার নাম স্যার।

বেইলের কাগজের সাথে পিতা ও সাং যথাযথ পরীক্ষা করে মিলিয়ে ক্ষীতিশ বাবু বলে উঠলেন ঃ যা, যা, লক-আপএ যা, তোর জামা কাপড় নিয়ে বেরিয়ে যা শ্যালা। জেলখানার রুটি আর তোর কপালে নাই। মহিভাই খুশীতে বিমূঢ় হয়ে যান আচমকা মুক্তির খবর পেয়ে। রুটির থালাটা সুলেমান ভাই আর আমাকে দিয়ে বললেন ঃ তোমরা দুজনে এটা ভাগ করে খেয়ে নিও। আমি দেশে ফিরতে পারলে তোমাদের সংবাদ বাড়ীঘরে পৌঁছে দেব। মহিবুর ভাইয়ের চোখে পানি। মুক্তির আনন্দ আর বিচ্ছেদের প্রকাশ ঘটেছিল তার অশ্রুতে। সুলেমান ভাই ও আমি কেঁদে ফেলি নীরবে। লুংগীর এক কোনা দিয়ে চোখ মুখে ফেলি। জেলখানায় কাঁদা অপরাধ, অশ্রুপাত জঘন্য শাস্তির যোগ্য।

মহিবুর ভাই সেকেন্ড গেট পার হয়ে গেলেন। এখন তিনি বাইরের মুক্ত পরিবেশে পৌঁছে গেছেন। নিশ্চয়ই কোন আত্মীয় টাকা পয়সা খরচ করে মহি ভাইকে লৌহকপাট মুক্ত করেছেন। তার ছেলে, স্ত্রী অধীর আগ্রহে তার উপস্থিতির সোনালি মুহূর্তের প্রহরগুলো গুণছে।

রাত হয়ে গেছে। মহি ভাই নেই। মহি ভাইয়ের থালা-বাটি-কম্বল এখন কে একজন দখল করে নিয়েছে। আমার মনটা হো-হো করে কেঁদে উঠে। যাবার সময় মহিভাই তালেব ভাইকে তার গেঞ্জিটা দিয়ে গেছেন। তালেব ভাইয়ের গায়ে এই গেঞ্জি দেখে আমার মনটা হু-হু করে উঠল আরো প্রবলভাবে।

মুক্তিদের অপারেশন টেকনিক

দিনের আবর্তে আরও বন্দী আসতে শুরু করল। ওরা পাকিস্তানী দালাল নয়, বাঙ্গালী যোদ্ধা। অধিকাংশই ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের। আজাদী সংগ্রাম শুরু হওয়ার সাথে সাথে ওরা যুদ্ধে যোগদান করেছে দুটি কারণে।

প্রথমতঃ পাকিস্তানী সেনা বাহিনী বাংগালী যুবকদের ঘোর সন্দেহের চোখে দেখে। ওদের ধারণা অধিকাংশ বাঙ্গালী যুবকই পাঞ্জাবী বিদ্বেষী, তাই পাকিস্তানেরও দুশমন। পাকবাহিনীর এ সন্দেহ অমূলক ছিল না।

দ্বিতীয়ত ঃ যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে বাংগালী যুবকদের নিয়ে পাক সৈন্যরা বিভ্রাটের সম্মুখীন হয়। তারা দেখতে পায়, যেসব যুবক দাড়ি রেখেছে, মাথায় টুপি, নামাজ পড়ে, ওরা অধিকাংশই পাকিস্তানের পক্ষে। ওরা "ইসলামের জন্য" পাক আর্মীকে যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে সাহায্য পরামর্শ দিচ্ছে এবং উৎসর্গীকৃত প্রাণ ওদের। এদের বিশ্বাস পাকিস্তান টিক্‌লে ইসলাম টিকবে। অপর দিকে যাদের দাড়ি নেই, নিয়মিত নামাজী নয় অথচ ইসলামের কথাও মাঝে মাঝে বলে, তারা আবার "জয় বাংলা" ধ্বনিও দেয়; তারা সবাই আওয়ামী লীগার। তাই পাক বাহিনী স্বভাবতই দ্বিতীয়

www.pathagar.com

শ্রেণীর যুবসম্প্রদায়কে ধর-পাকড় শুরু করে দিল। ওদের অনেককে হাতে-নাতে ধরে প্রমাণও পেল, ওরা পাক বাহিনীর প্রাণ সংহারক। অনেক পাকসৈন্য এসব স্বাধীনতাপাগল জীবনবাজ যুবকের গেরিলা-আক্রমণে আচমকা প্রাণও হারিয়েছে দেখে পাকবাহিনী বহু যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। এছাড়া প্রথম-প্রথম নি-দাড়ি বিশিষ্ট যুবককে সন্দেহ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে দাড়িওয়ালা যুবকেরাও পাক বাহিনীর অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। কারণ মুক্তি যুবকেরা যখন টের পেল, দাড়ি রাখলে এবং নামাজ পড়লে পাঞ্জাবী [পাঞ্জাবী বলতে মুক্তিদের দৃষ্টিতে পাক বাহিনীর সবাই] সৈন্যরা সদ্ব্যবহার করে, বন্ধু হিসেবে মনে করে, তখন থেকে ওরাও নামাজ পড়া ও দাড়ি রাখর মাধ্যমে পাঞ্জাবী সৈন্যদেরকে জব্দ করতে শুরু করে। এমনকি 'তাবলীগ জমাতের' ছুরতে এরা অনেক হিন্দু যুবককে ভারতে পাঠিয়ে প্রাণে বাঁচায়। তাবলীগী চেহারায় গেরিলা যুদ্ধ ও এম্বুস আক্রমণ চালানো হয় প্রচণ্ডভাবে। বহু পাঞ্জাবীসৈন্য মুক্তিযোদ্ধাদের এহেন টেকটিক্সের ফলে বিনা যুদ্ধে মূর্খের মত প্রাণ হারাতে থাকে। ধর্ম আসলেই বর্ম সবার জন্যে। কী দোস্ত কী দুষমন সবাইকে চরম আপৎকালে এর আশ্রয় নিতেই হয়। চরিত্রে ধর্ম থাক বা না থাক, ধর্মের ছুরত ও লেবাসের সম্মান ও প্রভাব কত যে কার্যকরী তা দেদীপ্যমান হয় এ সময়টিতে।

পাক-বাহিনী আরও বিষম বিপদে পড়ে গেল যখন তারা দেখতে পেল যে একদল লোক বলছে, "ওঁয়" মুক্তিযোদ্ধা, তা-কে শাস্তি দেয়া হোক, অথচ যখন শাস্তি দেয়ার জন্যে তাকে বন্দী করা হল তখন আর এক দল এসে জানাল 'ওসকো' ছোড় দিজিয়ে, 'ওহ' বহুত আচ্ছা আদমী হ্যায়। ওহ সাচ্চা মুসলমান আওর পাকিস্তান বলকে "ইসলাম্‌কী ক্লাস ওয়ান দোস্ত হ্যায়"। একই ব্যক্তি কতিপয়ের কাছে দুশমন আবার কতিপয়ের কাছে দোস্ত-এই তাজ্জব ব্যাপার দেখে পাক বাহিনী কিংবর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। বিরক্ত হয়ে তারা তখন নির্বিচারে এলোপাথারী অপারেশন চালাতে শুরু করে। ফলে কি মুক্তি, কি পাকিস্তানী উভয় পক্ষের লোকক্ষয় ঘটে ভীষণভাবে। গৃহযুদ্ধের ষোলকলা পূর্ণতা পায় এই সময়টিতে।

পাক বাহিনীর পাইকারী আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ছাত্রেরা সদল বলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানকার শিখ ও গুজরাটি আর্মি তাদেরকে লুফে নেয়া এবং যুদ্ধবিদ্যা বিশেষ করে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিতে থাকে। পনর দিন থেকে শুরু করে উর্ধ্বে একটানা তিন মাস পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে ট্রেনিং প্রাপ্ত বঙ্গজননীর পূর্বাংশের যুবকেরা পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এসব মুক্তিপাগল স্বাধীনতা পিয়াসী যোদ্ধাদেরকে তিনটি স্তরে ভাগ করে পাঠানো হত।

প্রথম দল নিরস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করত। ওদের সবার নিকট ক্যামেরা, ছোট ট্রানজিস্টারসেট ও ওয়ারলেস সেট মওজুদ থাকত। তাদের অনেককে খাতা পেন্সিলও সংগে করে নিতে হত। এই প্রথম দলটির কাজ ছিল প্রাথমিক রিপোর্ট সংগ্রহ করা। প্রাথমিক রিপোর্ট বলতে বিশেষ করে বুঝাত ঃ

(১) পথ-ঘাটের মানচিত্র অংকন ও পথ-নির্দেশক তথ্য সন্নিবেশ করন

(২) গুরুত্বপূর্ণ রেল ও সড়ক পথের সেতু, মিলিটারী ক্যাম্প বা ঘাঁটি ও যুদ্ধ পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের ছবি গ্রহণ।

www.pathagar.com

(৩) পাক বাহিনীর দালালদের নাম-ধাম ও তাদের গতি বিধির পরিসংখ্যানমূলক তথ্য সংগ্রহকরণ।

দ্বিতীয় দলের কাজ ছিল প্রথম দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনা করা, সেতু উড়িয়ে দেওয়া ও ব্যারিকেড সৃষ্টি করে পাক বাহিনীর গতিপথ রুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা।

প্রথম ও দ্বিতীয় দলের রিপোর্ট তৃতীয় দলের গাইডলাইন। তৃতীয় দল জীবন উৎসর্গীকৃতদেরকে (সিউইসিডাল গ্রুপ) নিয়ে গঠিত। ওদের কাজটাই ছিল সবচেয়ে বেশী মারাত্মক ও বিভীষিকাপূর্ণ। স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য সাধন না করে কেহ প্রত্যাবর্তন করলে তাকে সুট করে মারা হত।

জয় বাংলার বাস্তব স্বপ্নে প্রত্যয়ী আমাদের তরুণ যুবকদের এই তিনটি দলই স্বার্থান্বেষী হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত। অপারেশনের বা ন্যাস্ত কাজের তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট প্রদান বা এর কৈফিয়ত তথা বিষদব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত না হলে, অথবা কোন রাইফেল বা অন্য কোন অস্ত্র অপারেশন শেষে ফিরে এসে জমা দিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট মুক্তিকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু পর্যন্ত উপহার দেয়া হত। কদাচিৎ জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হত পাক আর্মীর চর হিসেবে চিহ্নিত করে।

আগরতলার সেন্ট্রাল জেল এতদিন পাকিস্তানী দালালদের স্বাগতম জানানোর দ্বারা সম্মানিত হচ্ছিল, কিন্তু বিগত কয়েকদিন ধরে মুক্তি ফৌজের পদধূলি জমতে লাগল জেল আংগীনায়। ঠিক এমনিভাবেই কসবার সফিক, সিলেটের মাজু, চাঁটগায়ের করিম ও আরো অনেকের শুভাগমনে ১নং ওয়ার্ড জমজমাট হয়ে গেল। ওদের মধ্যে অনেকেই স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি পড় য়া। ওদের অনেকের নাদুসনুদুস চেহারা, তেলতেলে স্বাস্থ্য বিকৃত ও বিবর্ণ আকার ধারণ করেছে। জালী বেতের দাগ ওদের দেহে শুভ্র বর্ণবৈচিত্রের রূপ এঁকে দিয়েছে এমনভাবে যে বেতের দাগ আর দেহের রং এর মধ্যে 'কে কার অলংকার' তা 'বলা' বড় ভার। কিল ঘুষির প্রমাণও রয়েছে। কাহারো ফোলা চোখ-মুখ-ঠোঁট। অবাক হতাম মুক্তিদের এই দশা দেখে। দিব্যিজ্ঞান হল ঃ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা ত মানুষ নয়! সুলেমান ভাই ত এই অবস্থা দেখে শুধু খুশীই হয়নি বরং তার বুকের বলও এতে বেড়ে যায় তিনগুণ। আমায় উদ্দেশ্য করে বললে ঃ

—আলম, কয়েক মুক্তি শ্যালারে বানানোর এই-ই সময়। এগুলো আসল না, মেকী মুক্তিযোদ্ধা। এরা স্বার্থপর ও দাগাবাজ।

চেহারা দর্শনে অনেককে তা-ই মনে হতো। তবে এ ধরনের বাহ্যিক প্রতিবিম্ব অনেক সময় মারাত্মক বিপদও ডেকে আনে। 'মোনাফেক' আর 'মোমেনের' চেহারায় অনেক সময় সাদৃশ্য থাকে খুউব। এই জন্য সতর্কতা অপরিহার্য সন্দেহ নেই। এহেন পরিস্থিতি অবলোকনে ক্রুশবিদ্ধ ঈসা আর প্রকৃত ঈসা (আঃ) এর ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠে আমার হৃদয় কন্দরে।

গেঁদু, আবদুর রহমান, তালেব আলী ও আরও কয়েকজন কয়েদী এ ধরনের ভ্রান্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আচ্ছা করে কিমা বানাল কতিপয় মুক্তি যোদ্ধাকে।

গেঁদু বলল—এই শ্যালা, তুই জয় বাংলার লোক অইলে জেলে আইলী ক্যান। হিপ্পী মার্কা মাথার চুলের ঝুঁটি ধরে অব্যাহত গতিতে চালাল চর থাপ্পর। সংগে সংগে অন্য সবাই শেয়ার নিল। শিলাবৃষ্টি আর বৃষ্টি।

www.pathagar.com

কল্পনায় অবগাহন

দিন যায়, রাত আসে। শরত বিদায় নেয়, শীত দেখা দেয়। মিষ্টি কুমড়োর দিন গিয়ে পাতাকপি আর বাঁধাকপি দেয়া হয় কয়েদি-হাজতীদের হাতে-পাতে।

সূর্যমুখী ঝরে যায়, এর শুকিয়ে যাওয়া চাড়া উপড়িয়ে নতুন ফুল, অন্য ফুলের চারা রোপণ করে কয়েদীরা। মেঘ বৃষ্টি কেটে রোদ উঠে। জোৎস্না ডুবে অমনিশা আসে। কত পরিবর্তন ঘটছে বিশ্ব-আংগীনার রংগমঞ্চে। কিন্তু আমরা: তালেব আলী, সুলেমান ভাই, রবিউল্যা ভাই গংদের আবাস স্থানের তিল পরিমাণ পরিবর্ত্তন নেই। সেই সিরাজ ভাই, গেঁদুদের একঘেয়েমী কাজ, শান্ত্রীদাদের ১০টা ৫টার নিয়মিত পরিবর্ত্তনশীল ডিউটি, চাবির তোড়ায় ঝনঝনানী, বুটের খট্ খট্ আওয়াজ, সকাল-বিকাল ফাইল, অজিতের পাগলামী, প্রহর গুণার ঢং ঢং ঘন্টি, সব মিলে একঘেয়েমী একক দৃশ্য দেখে-শোনে চোখ কানগুলো অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। এক ধরনের ব্যঞ্জনাদি চেখে-চেখে জিহ্বা বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। আর ভালো লাগেনা এ আবদ্ধ আপরিবর্ত্তনীয় জীবন। বিষময় হয়ে উঠেছে দেহমন। ফাঁদে আটকা ঘুঘুর মত ছটফট করছে প্রাণ পাখী অনন্ত বৈচিত্র মাখা বিশ্বধরণীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগের তীব্র আকাংখায়!

রাত হয়ে যায়। পঁচিশ পাওয়ারের বাল্বটি জ্বলে উঠে ক্ষীণ আলোতে। ঝিমিয়ে পড়ে সমস্ত ওয়ার্ডটি। ঢুলু-ঢুলু ভাব ছাড়িয়ে গেল সমস্ত জায়গা জুড়ে। মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। স্মৃতির বেদনায় টন্ টন্ করে উঠে আমার শিরা-উপশিরা। আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার বিচ্ছেদ-ক্রিয়ায় তাদের ছাই মুখ ভেসে উঠে মনের রূপালী পর্দায়। পি.সি. সরকারের মত যদি যাদু জানতাম তা হলে এক্ষুনি অদৃশ্য হয়ে বাতাসের সাথে মিশে বের হয়ে পড়তাম জেলখানার প্রাচীর-বেষ্টনী থেকে। বাইরে গিয়ে ভিখারীর বেশে পথ অতিক্রান্ত করে পৌঁছে যেতাম আপন জনের রাজ্যে! চুমু খেতাম প্রাণ ভরে ছেলেমেয়ে প্রিয়জনদের; মনের ক্ষত শুকিয়ে ফেলতাম মায়ামমতার পরশে।

দেয়ালে টিক্‌টিকিটা লাফ দিয়ে উঠল; ডেকে উঠল টিট্ টিট্ করে। ঐযে মশাটা এক লাফে গিলে ফেলল্। মশাটা হারিয়ে গেল টিক্ টিকিটার উদর-গহ্বরের আঁধার রাজ্যে।

বাল্বটার আলোটাও যেন হারিয়ে যাবে আঁধারের উদরে। আশার আলোও কি এমনি ভাবে হারিয়ে যাবে নিরাশার সায়র-সাগরে? না-না, তা'তো পারেনা। সাজা হবে, হোক না! বড় জোর ১ বছর, নইলে দুই, তিন অথবা হলোই যাবত জীবনের জেল-১৪ বছর পর্যন্ত।

এখন আমার বয়স ৩১ বছর, ১৪ বছর জেল হলে বয়স দাঁড়াবে ৪৫ বছর মাত্র। ও কিছুনা। ফাঁসি না দিলেই বেঁচে যাবো, ফিরে পাবো আবার সবকিছু—স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন। ওরা চিনবে না আমাকে? নিশ্চয়ই চিনবে; শুধু পার্থক্য হবে চুল-দাঁড়িতে। এখন এগুলো কুঁচ কালো বরণের; তখন হয়ত সাদা দুধবরণ হবে। এতে কি আসে যায়?

দীর্ঘ বিরহের পর এই মিলনই ত হবে মধুমিলন, বাসর রাতের চেয়েও হবে এর মূল্য অপরিসীম! অজিতের মত আমিও অধীর হয়ে যাই ঃ শান্ত্রিদা আমি বাড়ী যাব, আমায় ছেড়ে দাও আপনজনের সাথে মিলিত হতে। যতসব ঐ লোহার গেট্‌টা। একটা করাত থাকলে ইঁদুরের মত সন্তর্পনে কুট-কুট করে কেটে কোন রকমে মাথাটা গলিয়ে বের হয়ে যেতাম, শান্ত্রীদাকে গলাচেপে মেরে পালিয়ে যেতাম দস্যু বাহরামের মত। তারপর হয়ত খবর হত, পাগলা ঘন্টি পড়ত ঢং ঢং ঢং করে। ঘোষণা করা হত ঃ

www.pathagar.com

—পাইখ্যা, পাকিস্তানী একটা পালিয়ে গেছে। এত টাকা পুরস্কার ধরে দিতে পারলে। পুলিশ, মিলিটারী, সেপাই-চৌকিদার, সি-আই-ডি সব বেরিয়ে যেত খোঁচা-খাওয়া ভীমরুলে মত। তখন? তখন পালিয়ে যেতাম ডোবায়, ঝোঁপ-ঝাড়ে, নয়ত কোন নারকেল-সুপারী গাছের মস্তকে, শাখার আবডালে। হন্যে হয়ে ঘুরত সব আমাকে ধরার জন্যে ব্যর্থ ভাবে। কিন্তু? কিন্তু এই সার্চ লাইটটা, ঐ সার্চ লাইটটাই ত যত আপদের কারণ। সূর্যের মত এর উজ্জ্বল ঠা-ঠা আলো উন্মুক্ত করে তোলে যদি আমার লুক্কায়িত স্থানকে, তখন? তখন লাফঝাপ দিয়ে চুকিয়ে দিতাম মুক্ত জীবনের আকাংখা চির জনমের মত!

রাতটা কাটল অনিদ্রায় আর কল্পনার সূতোদিয়ে মুক্তির জগত তৈরির স্বপ্নে। 'কল্পনা' তুমি বেঁচে থাকো; বন্দী জীবনের মুক্তি সনদ একমাত্র ত তুমিই। তুমি ঃ the balm of woe, the prisoner's release, the solace to the buring soul like me. মাথাটা আমার ঠিক আছে! না আবার অজিতের রূপ ধরেছে! পাগল হয়ে গেলে ত শান্ত্রীদের আর মহেন্দ্রদার লাঠি-পেটা খেতে হবে যে। তারপর হাউজে চুবিয়ে লাশ বানিয়ে পাঠাবে যমালয়ে-হাসপাতালে!

পাগল হওয়ার ভয়ে জানালার শিকগুলো (রড্) গুণতে লাগলাম।

—এক, দুই, তিন...সাত। গুণতি ঠিক হচ্ছে বলে বিশ্বাস হয় না! শয্যা ছেড়ে উঠি, হাত দিয়ে শিক ধরে ধরে গুণে দেখি। তারপর এক থেকে একশত পর্যন্ত হাতের কড়া গুণে দেখি শতকিয়া ঠিকমত পারছি কি-না, মাথাটা ত ঘুলিয়ে যায়নি? হাঁ, ঐত কোমল রোদ হেসে উঠেছে ১নং ওয়ার্ডের বারান্দায়, জবা ফুর গাছটা লাল রং এর। ঘুরে তাকাই ঃ পাশে শুয়ে আছে সুলেমান ভাই, তালেব আলী, রবিউল্যা ভাই।

নাঃ, না-না পাগল হয়নি এখনও, পাগল হলে চলবে না। মুক্তি পাবোনা কোন দিন। মতিভ্রম হলে সব হারাবো, বৌ-ঝি, বাপ-মা, এই সুন্দর দুনিয়া। স্বাভাবিক থাকতেই হবে, যে ভাবেই হোক, যে প্রকারেই হোক না কেন, যদিও পাগলের বিচার হবে না রোজ হাশরে; যদিও পাগল যাবে বেহেস্তে অনায়াসে!

—সুলেমান ভাই, একটা বিড়ি দেননা।

সুলেমান ভাই মুখ ফিরিয়ে তাকায় আমার দিকে। কী হইছে তোমার? চেহারা এইরূপ হইছে কেন? গতরাইত ঘুম হয়নি। মনের কথা মনেই চাপা রাখি। বিড়িটা ধরালাম শান্ত্রীর লাইটার দিয়ে। একরাশ ধুয়োয় কুয়াসাচ্ছন্ন করে ফেলি আমার দৃষ্টি-রাজ্য।

ইমামদ্দিন টা ভালোই ছিল এতদিন; কিন্তু আজ ২/৪ দিন ধরে আজান দেয়টেয়না, ঠিকমত নামাজও পড়েনা রীতিমত। জিজ্ঞেস করলে বলে "আজ শরীরটা ভাল নয়", নইলে "কাপড় নাপাক"। সেদিন সুলেমান ভাইয়ের কাছ থেকে জানলাম ইমামদ্দিন গাঁজা ধরেছে। সিরাজ ভাই তাকে খুব আদর করে। রাতে নিজের সাথে শুইয়ে রাখে, গা-হাত-পা টিপায়। চরিত্রহীন হয়ে গেছে ইমামদ্দিন। তাত হবেই! কত মোয়াজ্জিন ইমামদ্দিন, কত নিষ্পাপ ইমামদ্দিন কত সিরাজ-মহেন্দ্রের সহবতে গোল্লায় যাচ্ছে—তার কি ডায়রী আছে জেলে? না, জেলত এজন্যে নয়। জেল হচ্ছে অমানুষ তৈরীর কারখানা!

সিরাজ ভাইয়ের মত ঈমানী-চেতনা ও জজ্বার মত লোক "জুম্মার নামাজ" প্রচলিত করিয়েও এ পাপাচারে লিপ্ত? কেন, কেন এমনিট হল খোদা? নানা জিজ্ঞাসায় মন আমার ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে উঠে। ভাবপ্রবনতায় ভাল কাজ করা সহজ বটে তবে এর স্থায়িত্ব নেই যদি না তা চরিত্রগত হয়, সিরাজ ভাই এটাই যেন জানান দিলেন।

www.pathagar.com

রিপোর্টের ক্রিয়া

পূর্বেই বলেছিলাম মিথাংদের কথা। মিথাং আর তার দেশী সবাই আমাকে নিয়মিত বই সরবরাহ করে। হিন্দুস্থান সরকার ওদেরকে ১৫ দিন অন্তর বই ইস্যু করে। প্রতিদিন দুটো করে দৈনিক পত্রিকাও পাঠায়, 'হিন্দুস্তান টাইমস আর 'অমৃত বাজার।' মহেন্দ্র দা পত্রিকা দুটো আনে রোজ সকালে। সেন্সরশিপ-এর অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে অর্থাৎ পোস্টমর্টম করার পর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কাগজগুলো পৌঁছে ১ নং ওয়ার্ডে।

—মাস্তর, নে, নে, ধর। কি লেখছে আইজ ছংবাদে?

—আমি পড়ে শুনাই। কখনও বা ইংরেজী সংবাদের তর্জমা করে বলি ঃ

পাক আর্মীর ১০ জন খতম হয়েছে মুক্তি সেনার হাতে। কসবা মুক্তিদের নিয়ন্ত্রণে, শিক্ষা মন্ত্রীর গাড়ী আক্রমণ, ৫০ জন দালালকে হত্যা, ইত্যাদি।

মহেন্দ্র দা খুব খুশী হয়। তার দেখাদেখি অন্যান্য কয়েদী, হাজতীরাও বসে যায় সংবাদ পরিবেশনের আসরে।

—ধর্, বিড়ি দুইটা তুই খাইছ। পত্রিকা পাঠ শেষে মহেন্দ্র যৌতুক হিসাবে বিড়ি, কখনও বা দুটো রুটি এবং কখনও বা এক টুকরা সাবান দিয়ে যায় আমাকে।

১নং ওয়ার্ড এভাবে বসতবাটি হয়ে গেল আমার কাছে। নূতন নূতন পাকিস্তানী বন্দীও আসতে থাকে। মাঝে মাঝে দুচার জন করে পুরাতন বন্দী হয় জামিনে, নয় মুক্তি পেয়ে নূতনদের আস্তানা রচনা করে দেয়।

সেদিন সকাল বেলায় হঠাৎ জেলার মধু বাবু এলেন। সিরাজ ভাইকে ইশারায় কি যেন বললেন। অমনি সিরাজ ভাইয়ের চোখ দুটো আগুনের ফুলকীর মত ঠিকরিয়ে উঠল। গর্জিয়ে উঠল সেঃ

—আলম, সুলেমান, তালেব আলী, আবুল খায়ের উঠ্ উঠ্। থালা বাটি, কম্বল লইয়া বাইর হ জলদী। এই আচমকা অর্ডারে সবাই ভয় পেয়ে যাই। আমাদের চোখ-মুখ নিমিষে শুকিয়ে যায় শুকনো চিড়ার মত। ফায়ারিং স্কোয়াডে কি পাঠাচ্ছে?

স্ব স্ব বেডিং নিয়ে আমরা বেরিয়ে আসি ১নং ওয়ার্ডের বারান্দায়। সিরাজ ভাইও আমাদের সংগে ছিল। নিজের থেকেই সে বলতে লাগল ঃ

—কোন শালায় তোরার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করছে। আমার কত আরাম লাগছিল তোরারে নিয়া থাকতে। আমার ১নং ওয়ার্ড নামাজ কালাম আর ভদ্রতায় সব ওয়ার্ডের উপরে আছিল রে। কিন্তু কি করুম আমার ক্ষমতা থাকলে আজই—

সিরাজ ভাইয়ের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে যায়। ডাকাতখুনী সিরাজ ভাই ত এ নয়, এ যেন মাটির মানুষ! মায়া মমতাসিক্ত মহাপুরুষ সিরাজ ভাই। দীর্ঘ তিনমাস কেটেছে তার সাথে, কিন্তু কোনদিন তাকে ত কেহ এমনিভাবে চোখের পানি মুছতে দেখনি। মানুষ যত কঠিন পাপই করুক না কেন, তার মনের আসল মানুষটি মানুষই থেকে যায়। এ মানুষটির সেবা কে করে?

হঠাৎ ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি হল কতক্ষণ। তাই সংগে সংগেই ১নং ওয়ার্ড ত্যাগ করতে পারিনি। ঐদিকে ওয়ার্ডের ভেতরে লোহার জানালা ধরে কফিলদ্দি মিয়া, ইমামদ্দিন, আবদুর রশীদ অঝোরে কাঁদছিল। ওদের কান্নামুখ আর কান্নার সুরে ভেংগে পড়লাম আমরা সবাই; সুলেমান ভাই, তালেব মিয়া, পীর আবুল খায়ের সাহেব ও আমি। সিরাজ ভাই এক ধমক দেয় ঃ

www.pathagar.com

—ধ্যাৎ স্যালারা। কাঁদছ যদি ত মাইর‍্যা খুন কইরাফালামু। কান্দে ত মাগিরা, মরদের জন্যেই ত জেলরে বেটারা!

আম্মাকে হারিয়েছি ছোট বেলায় ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময়। স্পষ্ট মনে নেই আম্মার চেহারাটা। বাবা, ছোট আম্মা (আপন মায়ের চেয়েও বেশী কম আদর করেন না), বৌ-ঝি-ছেলে, আত্মীয়স্বজন, সবাইকে ছেড়ে তিন মাস কাটিয়েছি ১নং ওয়ার্ডে, কিন্তু আজকের মত এত বড় বিয়োগ ব্যথা কোন দিনই ত অনুভব করিনি!

কিল-ঘুষি, চর-চাপড়, গালি-গালাজ, কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়ে আমরা কয়টি মানুষ এক হয়ে গিয়েছিলাম এই ওয়র্ডে। স্বার্থ, লোভ, হিংসা-দ্বেষ কিছুই ছিল না আমাদের এই ঐক্যসূত্রে। বিড়ি খাওয়া, গালগল্প করা, মিথ্যাংএর বন্ধুত্ব, সিরাজ ভাই এর সোহাগ, ক্ষীতিশ বাবুর চোখ রাংগানী আর কট্‌মট্ চাহনি ইত্যাদি উপকরণে রচিত ঐক্যের ভাংগন সইছে না কারো মনে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। ১নং ওয়ার্ডের সদ্য বৃষ্টিস্নাত কোমল ঘাসের আংগীনায় পা ফেলে আমরা রওয়ানা হলাম পশ্চিমে, ছোট দরজাটার দিকে। আহ! দীর্ঘ তিন মাস পর, তিন মাস নয় যেন তিন যুগ পর বৃষ্টি পানির পরশে হৃদয় মন অনাবিল শান্তি, তৃপ্তির আমেজে জুড়ে যায়। ফুলগুলোও-গোলাপ, জুই বেলী, গেন্দা কত সুন্দর ঠেকছে চোখে। পাপড়িতে জমান বৃষ্টির ফোটা এক এক টুকরো হীরক খণ্ডের মত বিকীর্ণ হচ্ছে রৌদ্রের কারোজ্জ্বলে। এক একটা ফুল রং-এর বাজার। এক ফোটা বৃষ্টি এক টুকরো হীরকখণ্ড ভেজা কচি ঘাসের মখমল সদৃশ রাজ্যে। করুণাময় বিধাতার কী অপরূপ সৃষ্টি! মহাশিল্পীর এসব উপহার মানব হৃদয়ে শিল্প চেতনা সৃষ্টির তরেই ত রচিত হয়েছে!

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২০ নং ওয়ার্ডের রাজ্য : নকসালীদের মগজ

আমাদের ওয়ার্ড বদল। ১নং থেকে ২০ নং ওয়ার্ডে।

২০ নং ওয়ার্ডটি ১০টা ছোট ছোট কামরায় বিভক্ত। ৫টা কামরা পূর্বদিকে, ৫টা কামরা পশ্চিমে মুখোমুখিভাবে রয়েছে। মাঝখানে সরু এক ফালি বারান্দা। জেলের পরিষাভায় এক একটি কামড়াকে সেল বলা হয়। প্রতিটি সেলের পরিমাণ পাশে ৪ হাত, লম্বায় ১০ হাত। উঁচু হবে হাত পাঁচেক। প্রতি সেলেই একটি সিঙ্গেল খাট সদৃশ উচু সিমেন্টের তৈরী শোবার ব্যবস্থা রয়েছে। পাক ছাফের জন্য রয়েছে অ্যাটাচট্ বাতরুম ও পায়খানা।

এইওয়ার্ড রাজ বন্দীদের জন্যে। Extremist বা Terrorist বন্দীদের জন্য ওয়ার্ড নং ৭। ঐ ওয়ার্ডের সেলগুলো ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেখানে দিবা-রাত্রি লাইট জ্বালিয়ে রাখা হয় ১০০ পাওয়ারের। দুটো কবরের সমষ্টিতে যেটুকু স্থান কল্পনা করা যায় প্রায় ততটুকু হল ঐসব সেলের আয়তন। ২০ নং ওয়ার্ডের ২নং সেলের রাজবন্দী অজিতের কাছ থেকে আমি এসব তথ্য অবগত হই। মনে মনে খুশী হই, কৃতজ্ঞতায় হিন্দুস্তান সরকারের প্রতি দেহ মন নুয়ে পড়ে এইভেবে যদি ৭নং ওয়ার্ডে আমাকে পাঠাত তাহলে কি অবস্থাটাই না হত আমার?

অজিত নক্সালী। তার সেলমেট সুধীরও। ওরা দুইজনই আগরতলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন জবরদস্ত কর্মচারীর ছেলে। ওদের বাবারা জেল সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের বাল্যবন্ধু। তাই ৭নং ওয়ার্ডের পরিবর্তে ২০ নং ওয়ার্ডের ২নং সেলে অজিত এবং সুধীর বন্দীদশা কাটাবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। ওদেরই নেতা বিমল চক্রবর্তী সপ্তাহদুয়েক আগে ধরা পরে ৭নং ওয়ার্ডের সেলে দিনগুজরান করছেন। বিমল চক্রবর্তী নাকি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে পরিচিত। তাই বিমল চক্রবর্তী নামটাও আসল নাম কিনা তাতে সন্দেহ হয় বলে অজিত আমাকে জানাল।

আসসালাতু খাইরুম মিনান্ নাউম

পীর সাহেব আবুল খায়ের ২০ নং ওয়ার্ডের ৫নং সেলে আমার সাথে থাকার সুযোগ পান। অজিত-ই দয়া করে এই সুযোগটুকু আমাকে দান করে। আমরা তিনজন ১নং ওয়ার্ডের মত আজান দিয়ে নামাজ পড়ার রেওয়াজ পুনরায় কায়েম করতে থাকি।

দুদিন পর সিরাজ ভাই এসে পীরসাহেব ও আমার সাথে সাক্ষাৎ করে।

—কি রে, তোরা কেমন আছছ?

টেক থেকে দুটো বিড়ি বের করে একটি নিজে ধরায়, অপরটি পীর সাহেবকে দেয়। পীর সাহেব তর্জনী আর মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়ে চেপে লম্বা একদম নিয়ে একরাশ ধূয়ো ছেড়ে বলেন ঃ

www.pathagar.com

—আপনাদের দোয়ায় ভালই আছি সিরাজ ভাই। তবে আমাদের সাথী সুলেমান ভাই আর তালেব আলীরা যে কোন্ ওয়ার্ডে আপনারা দিছেন এই ড্যা এখনও জানতে পারলাম না।

—ওরা দুইয়োডা ৬নং ওয়ার্ডে আছ। বাল আছে ঐখানে। আমি দেহা করছি তারার লগে। তোগো কথা হেরা জিগাইছে বইলাই ত আমি আইজ এইহানে আইছি, তোরার কোন সংবাদ থাকলে আমার কাছে ক।

—সিরাজ ভাই, একসাথে আমরা তিনডা মাস রইছি আপনের ওয়ার্ডে। মাইর মুর‍্যা, হাসি খুশী, নামাজ কালাম পইর‍্যা আমরা সব একটা পরিবারের মত হইয়া গেছিলাম। কিন্তু আজ হেই বাদন ডা আপনেরা ভাইংগা দিছেন। এর লইগ্যা মনডা কাইন্দা উডে।

—সব কপালের দোষরে খাইর‍্যা, সব কপালের দোষ। জেলেরা বাবুর কাছে রিপোর্ট গেছে তোরানাকি নামাজের নামে দল বাইন্ধ্যা জেলখানা ভাইংগা পলানের ষড়যন্ত্র করতাছছ। এর লাইগ্যা তোরার দলডা ভাইংগা দিছে।।

পীর ছাহেব, আমি ও শাহাদাত হোসেন এতক্ষণে গুমরটা বুঝি। বড় ভাল লাগে সিরাজ ভাইকে তার এই অকপট স্নেহমাখা কথায়। খুনী সিরাজ ভাইয়ের মধ্যে আমরা আমাদের মনের মানুষ খোঁজে পাই।

সিরাজ ভাই উঠি উঠি করছিল। পীর ছাহেব অমনি বলে উঠেন ঃ

—সিরাজ ভাই একটা অনুরোধ আপনে আমাগো দলের লোকেরা যে যে ওয়ার্ডে গেছে ওদের সবাইকে সেইসেই ওয়ার্ড থাইক্যা আজান দিয়া নামাজ পড়তে কইবেন। এতে আপনার দুনিয়া ও আখের দুই জগতেই ভাল হইব।

—যা যা, এইডা কইয়্যাদেমু। আর কোন কথা আছে নি ক।

আর কোন কথা নাই পীর সাহেবের। তাই সিরাজ ভাই উঠে গেল ১নং ওয়ার্ডের অভিমুখে। যাওয়ার সময় এক প্যাকেট বানর মার্কা বিড়ি দিয়ে গেল সবাইকে।

সত্যিই পরদিন ধল প্রহরে গোটা আগরতলার জেলখানা 'আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান্নাওম' ঃ নিদ্রা অপেক্ষা নামাজ উত্তমঃ মধুর ধ্বনিতে বিধৃত হয়ে গেল ১নং ওয়ার্ড, ৬নং ওয়ার্ড, ১৭ নং ওয়ার্ড ও ২০ নং ওয়ার্ড। ভোর পাঁচটা বাজার সাথে সাথে প্রায় একই সময়ে আজানের ধ্বনিতে সমস্ত জেলখানা মসজিদবহুল ঢাকা নগরীর রূপ নিল।

৫নং সেলটা ২০ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম সারির শেষে, উত্তর মাথায়। প্রকৃতি রাজ্যে তখন হেমন্তের প্রস্থান শেষে শীতের পয়গাম ঘোষিত হচ্ছিল। দিনের বেলায় সূর্য পূর্ব দক্ষিণ মুখী হেলান দিয়ে উদয়াস্ত হচ্ছে। ফলে ৫নং সেলটা প্রায়ই অন্ধকার থাকত। দিন ঠাওরে নিতে হত অন্ধ ব্যক্তির মত। চোখ খুললে, ঘুম ভাংগলে দিন আর ঝিমুলে অথবা নিদ্রা গেলে রাত্রি। আমি, পীর সাহেব এবং শাহাদাতের কাছে এই ওয়ার্ডের আহ্নিক গতির চক্র ঘটত এভাবে।

অজিতের দর্শন

অজিতের কথা আবার।

২০নং ওয়ার্ডের সর্দার সে। বয়স ২০/২২ হবে। আই কম ফেল মেরেছে নক্সালী রাজনীতি করে। দীর্ঘ দেহ, উন্নত নাসিকা, বড় বড় গোলাকৃতি চোখ তার। চুল উল্টিয়ে আঁচড়ান। হাত দুটো ঝামা ইটের মত শক্ত।

www.pathagar.com

—মাস্টার দা, এ হাতে কত বোমা বানিয়েছি, কত বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি, তা হিসেব করলে প্রায় তিনশ'র মত হবে।

—এত বোমা বানিয়ে কি করেছ তুমি?

কেন, তোমাদের দেশের লোকদেরকেই আমরা দিয়েছি প্রায় তিন হাজারের মত। মাস্টার দা, আমাদের সাহায্য না পেলে 'জয় বাংলা' দশ বছরেও পারবে না জয় করতে। পাঞ্জাবী সৈন্যরা অত্যন্ত হিংস্র ও ক্ষিপ্র। আমরা যদি মুক্তিদেরকে হাত বোমা, এবং গ্রেনেড না দিতাম তবে কবেই যে এ সংগ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে যেত তার কি খবর রাখ?

আঁচ করলাম এর আছর ও গুরুত্বটা। এজন্যেই ত আখাউড়ায় ছেলেদের হাতে কত বোমা দেখেছিলাম সেদিন। জিজ্ঞেস করলাম ঃ

—আচ্ছা অজিত দা তোমরা ত বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্যে বোমা তৈরী করছ, এতে ত হিন্দুস্তান সরকার খুশী হওয়ার কথা? তোমাকে বন্দী করল যে?

অজিত হেসে দেয়।

—আমাদের আক্রমণ এখন দ্বিমুখী। প্রথমত আমরা চাই হিন্দুস্তানের ভুড়িওয়ালাদের ভুড়ি কেটে তাদের পুঞ্জিভূত সম্পদ সর্বহারাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে, যাতে সর্বহারারা ও সমাজের মধ্যে কলকারখানা, ক্ষেত খামার তৈরী করে স্বাবলম্বী হতে পারে। দ্বিতীয়ত ঃ 'জয়বাংলা' আন্দোলনকে জোরদার করতে। কেন না 'জয়বাংলা' প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে বাংলাদেশেও আমাদের অনেক সর্বহারার আন্দোলন ও কর্মসংস্থানের বিশাল প্রান্তর উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

—এ ব্যাপারে সরকারের মত কি?

—সরকার 'জয়বাংলার" ক্ষেত্রে একদিকে আমাদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করে যাচ্ছে সত্যি, কিন্তু অপরদিকে আমাদের দেশের পুঁজিপতিদেরকেও উত্তরোত্তর শক্তিশালী করে তুলেছে।

—এর কারণ?

—কারণ সোজা, সুস্পষ্ট। বর্তমান কংগ্রেস সরকার পুঁজিপতিদের পুঁজির দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। হিন্দুস্তানের রাজনীতির চাবিকাঠী ভুড়িওয়ালা মারওয়ারীদের হাতে যে।

—জয়বাংলা স্বাধীন হলে এতে কি সুবিধা হবে?

—জয়বাংলা যদি কোন দিন স্বাধীন হয় তবে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বাংগালীরা মিলে একত্র হয়ে জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' আমরা গড়তে পারব। মারওয়ারীদের প্রভাব ক্ষুণ্ন করে আমরা বাংগালী হিসেবে একটি স্বতন্ত্র জাতিতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাব।

অজিত নক্সালী, লেলিন-মার্কসবাদী। আগরতলার জনৈক ভূপতির বাড়ীতে সদলবলে আক্রমণ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পরে। ওর সংগী একজন হাত বোমা ফাটাতে গিয়ে তিনটি হাতের আংগুল খুইয়েছে এই ঘটনায়। পুলিশ তাকে এখনও ধরতে পারেনি বলে অজিত গৌরব প্রকাশ করে।

দুই বিদ্রহী নেতা

কিছু দিন পর।

অজিতকে ধরে কয়ে ২ নং সেলে নিজে এসে পড়ি। ২নং সেলের বাসিন্দা এখন তিনজন। ২০নং ওয়ার্ড ১নং ওয়ার্ডের চেয়ে অনেক উন্নত। এখানকার বাসিন্দারা

www.pathagar.com

অনেকেই রাজবন্দী। পাকিস্তানের ই.পি.আর. (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) বাহিনীর আটককৃত ৮জন সৈনিক, মনিপুরের বিদ্রোহী নেতা উকিল বাবু ও আসামের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ী অঞ্চলের জনৈক বিদ্রোহী মিঃ র‍্যাংকেল গোমেস। উকিল বাবুর প্রকৃত নাম কি তা জানতে পারিনি। অন্য কেহও তা জানার ঔৎসুক্য বোধ করে না। আমাকে যেভাবে "মাস্টার দা" বলে ডাকে এবং এটাই ২০নং ওয়ার্ডের সবাই আমার আসল নাম বলে মনে করে, তেমনি উকিল বাবু নামটিই তার প্রকৃত নাম হিসেবে বহাল আছে।

উকিল বাবু মিথাংএর দলের লোক। তিনি বি.এ.বি.এল। পাঁচ বছর ধরে জেল ভোগছেন। প্রতি মাসে দু-একবার মিছেমিছি কোর্টে তাকে নেয়া হয়। ফলে আজ পর্যন্ত তার কোন বিচার হয়নি। কবে হবে তাও কেহ বলতে পারে না।

২০নং ওয়ার্ডে এসে সাহিত্য ও সংস্কৃতি রুচিসম্পন্ন বন্দীদেরকে পেয়ে বেশ আনন্দ পাই। এখানে পাকিস্তানী রাইফেলস বাহিনীর বন্দীরা ব্যতীত আর সবাই নিবিড় দুপুরে পত্র-পত্রিকা পড়ে। সাহিত্য, সভ্যতা ও রাজনীতি সম্বন্ধে গালগল্প করে সময় কাটায়। এতে আমি যথেষ্ট মানসিক সুস্থতা ফিরে পাই। দুপুর ও বিকালে খাওয়ার সময় যে তিন/চার ঘণ্টা লকআপের বাইরে থাকার সময়টুকু মেলে, এই সময়টুকুতে ওদের সাথে গল্প-সল্প করে বেশ আনন্দ পাই। নতুন নতুন সংবাদ সরবরাহ করি দেশের ও বাহিরের জগতের। জেল লাইব্রেরীর বই ধার নেই উকিল বাবু আর গোমেসের থেকে। এরা সবাই আমাকে ভালবাসে শিক্ষিত ও ধার্মিক হিসাবে।

রাজবন্দী হিসাবে শুধু উকিল বাবু ১০নং সেলে একাকী থাকেন। তাকে মশারী, লেপতোষক, বালিশ ও স্টীলের একটি ফোল্ডিং চেয়ার দেয়া হয়েছে। একটি 'মেট'ও তার জন্যে নিয়োজিত রয়েছে। উকিল বাবুর মত বন্দী হলে জেলখানায় আবার দুঃখ কিসের? উকিল বাবু সকাল-বিকাল খাওয়ার জন্যে দুটো করে বেশী রুটি, দুবাটি ডাল, এক বাটি এক্সট্রা ভাত পান। তাছাড়া প্রভাতী ও বৈকালিক চায়ের সাথে মাখন মাখা দু টুকরো রুটি আর এক জোড়া কলাও দেয়া হয় তাকে। শুধু যৌন সম্ভোগের ক্ষুধা ব্যতীত আর কোন অসুবিধাই নেই। 'শুধু খাওয়া ও আরামের জন্যে জীবন" ঃ উকিল বাবু এর চাক্ষুস দৃষ্টান্ত। অজিতসুরেশের মত লেনিনবাদী-মার্কসীয় কম্যুনিষ্টরাতো গোটা দুনিয়াকে উকিল বাবুর ১০নং সেলই বানাতে চাচ্ছে!

এ প্রসংঙ্গে র‍্যাংকেল গোমেস সম্পর্কে দুটো কথা। সেও একজন বিদ্রোহী। নিম্ন হিন্দু শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। বাবরী চুল, মোষের মোচএর মত সরু পাতলা মোচ আর বাদামী রংএর অ-ডাগর চোখ। তাকে দেখতে অনেকটা চ্যাংরা বয়সের সন্নাসী মনে হয়। বড়ই সদালাপী, নম্র মেজাজী আর দায়র্দ্র চিত্ত। ইম্ফল তার নিজের অঞ্চল। অত্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড, রাস্তা-ঘাট কাঁচা, অধিকাংশ মানুষই গণ্ড মূর্খ। ক্ষেত-খামারে গায়ে খেটে জীবীকা উপার্জন করে ওরা। দারিদ্রের মরণ কামড়ে জীবন ওষ্ঠাগত। তাই র‍্যাংকেল গোমেস ওদেরকে কনভার্ট করে ক্যাথলিক খ্রীস্টানে। তাদেরকে রিলিফের মাধ্যমে স্বচ্ছল ও শিক্ষিত করতে চায়। এলাকার মান্ধাতা রূপকে পাল্টিয়ে রূপান্তরিত করতে চায় ক্ষুদ্র ইংলেণ্ডে। এই চাওয়ার চেষ্টা আর পাওয়ার স্বপ্নই তাকে মিশনারী গ্রুপ গঠন করে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে অনুপ্রাণিত করেছে। পরিণামে আজ সে ২০ নং ওয়ার্ডের অতিথি। তিনি বছর কেটে গেছে তবু তিল পরিমাণও সে ভগ্নোৎসাহ হয়নি। তার সাথীরাও নয়। আজও তার সাথীরা সংগোপনে টাকা-পয়সা, জামা-কাপড়, ফল-মূল জেলখানায় পাচার করে ঘুষের ফোঁকড় দিয়ে।

www.pathagar.com

ই.পি.আর. জলিল সাহেব : রাজনীতি শূন্য মগজ

পাকিস্তানী ই.পি.আর. দের সাথের আমার উষ্ণ ও সুহৃদভাব জমে উঠে। আখাউড়ার ই.পি.আর. (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্) ক্যাম্পের জলির সাহেবের সাথে মাঝে মাঝে একটু আধটু কথা বার্তার সুযোগ মিলে। আত্মিক ঐক্য গড়ে উঠে।

—জলিল সাহেব, আপনি বন্দী হন কিভাবে?

—সে ত বহুত কথা। ২৭ শে মার্চ, শেখ ছাহেবের ভাষণের পর রাত দুটায় আমার বাংগালী বন্ধুরা ঘুমের মধ্যে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। হ্যামরা তখন ভাবতে পারিনি এ কি হচ্ছে!আমার সাথের চার ভাইকে গুমের মধ্যে ওরা (বাঙ্গালী ইপিআর) বেয়নেট খুচেঁ আক্রমণ করে। ওদের চেড়ে আগরতলা সীমান্তে চলে যাই। এরপর পাবলিক আমাকে তাড়া দেয়। ওদেরকে গুলি করতে দীলে বাজে আমার। তাই দৌড়িয়ে গিয়ে বি.এস.এফ. ক্যাম্পে চলে যায়। "ওহা" সারেন্ডার করে জেলে আছে। সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও চলন সই বাংলা তার দখল হয়েছে।

জলিল সাহেব কেঁদে দেন। নীচু গলায় বলেন ঃ

—মাস্টার ছাহেব, ১৯৬৫ সালে আমরা বাংগালী-পশ্চিম পাকিস্তানী ইপিআর বাহিনী শিয়ালকোট সেক্টেরে যুদ্ধ করেছে, এক বাসুনে বসে ভাই-ভাই হোয়ে খানা খেয়েছি, এক ছাথে রইফেল হিন্দুস্তানের দিকে নিশানা করে ফায়ার করিছি। সেই ভাই বেঈমানী করছে হামার সাথে, হামরা দুষমনদের সাথে মিলে। আল্লাহ কভী গাদ্দারকে মাফী না করে।

জলিল সাহেব আসল কারণ জানেন না। এই বেঈমানীর শিকড় মগডাল তথা ইসলামাবাদের প্রাসাদ কক্ষে রয়েছে! পাকিস্তানের পূর্ব এবং পশ্চিমের সাধারণ মানুষে ভেদাভেদ ছিল না কী মনে, কী ধনে। উপরতলার স্বার্থান্বেষীরা এই শোষণ, এই বৈষম্য ও বিদ্বেষ রচনা করেছে সেনা বাহিনী ও সাধারণ মানুষের মনমগজ ও আচরণে। মনযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম তার কথা, কিছু বলি না। কারণ অজিত আর সুধীরদেব সন্ধিগ্ধ দৃষ্টি প্রায়ই আমার প্রতি নিবদ্ধ থাকছে। মনে মনে ব্যথা পাই জলিল সাহেবের কথায় বিষয় বস্তু অপেক্ষা তার বেদনাসিক্ত কণ্ঠস্বর আর চেহারা দেখে। বেচারা আর্মীর লোক, মগজ আছে তবে তা রাজনীতি জ্ঞানশূন্য। দু-অংশের Disparilty জ্ঞান শূন্য।

জেলখানার খাদ্যের পুষ্টিহীনতা আর স্বল্প পরিমাণ আহার জলিল সাহেবের বিরাট স্বাস্থ্যটাকে নত করে রেখেছে। কিন্তু মনের তেজ আর চোখের জ্যোতিতে এখনও বীরত্বের জোশ উপছিয়ে পড়তে চায়। আদা শুকালেও এর ঝাল যায় না যে!

নকুলদাকে আর দেখিনি

সন্ধ্যা নামে ২০ নং ওয়ার্ডের সেলগুলোতে। প্রতি দিনকার মত কঠোর শৃঙ্খলা আর "ফাইলের" দাপট নিয়ে জেলার বাবু এলেন পরিদর্শনে।

—আদাব।

আমার সম্ভাষণের স্বরে জেলার বাবু দাঁড়িয়ে যান।

—স্যার আমার লুংগীটা ছিঁড়ে তেনা-তেনা হয়ে খসে পড়ার উপক্রম। দয়া করে একটা পেন্ট না দিলে....

www.pathagar.com

—ক্ষীতিশ, মাস্টার সাহেবকে কাল সকালে একটা প্যান্ট ইস্যু করে দিয়ো। কেমন লাগছে এখানে মাস্টার সাহেব?

—ভালই লাগছে স্যার। ২০ নং ওয়ার্ডে পাগল নাই বলে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে।

প্রত্যুত্তরে এক ঝলক নীরব হাসি উপহার দিয়ে জেলার বাবু ক্ষীতিশকে নিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় ক্ষীতিশ বাবু একটা কট্‌মটানী চাহনী আমাকে উপহার দিতে ভুলেননি।

রাত দশটায় নতুন শান্ত্রীর ডিউটি পড়ল। নকুল দা। মনিপুরী চেহারা কঠোরতায় পরিপূর্ণ। গোদা স্বাস্থ্য, গোদা চেহারা। দন্ত পাটি শুভ্র বটে তবে বেশ বড় ও প্রশস্ত। পুরু ওষ্ঠদ্বয় গজ্‌গজ্‌ করে।

—কেথারে? গোমছ উঠ্‌ত? কেথারে ঘুমায়? উথ, ধর ছ্যালা, বুথ (বুট) আর বিড়ি খা আর গল্প কর ছুনি। অত বড় লাইততা কাতামু কেমনে?

র‍্যাংকেল গোমেস ঘুম থেকে উঠে যায়। আমাকেও সে ডেকে তোলে। দুজনে মিলে ছোলা বুট খেতে শুরু করি। গোমেস বলতে থাকে সাপ মারার কাহিনী।

রাত দুটো বেজে গেল।

গোমেস ক্লান্ত হয়ে যায়। নকুল দা ধমক দেয়। পকেট থেকে ফের আরও কিছু বুট বের করে বলে ঃ

—উথ্‌ উথ্‌ ছ্যালা। ধর, এই বুত গুলা আবার খা, রাইত ত বেছি নাই ছ্যালা। আর তিন ঘন্তা পরে আমার দিউতি ছেছ অইব। তখন ছারাদিন ঘুমাইছ। রোজ ভোরে বুত আর বিড়ি দিবে, আর রাইতে দিউটি ছেষ করুম এমনে।

তিনটা বেজে যায়। নকুলদা ও ক্লান্ত হয়ে যায়। বারান্দায় সটান শুয়ে পড়ে পুলিশী টুপীটাকে বালিশ বানিয়ে। নকুর দা এভাবে ডিউটিতে আমাদের প্রতিদিন ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাত বটে, তবে বুট আর বিড়ি পেয়ে আমি আর গোমেস ঘুমের ব্যাঘাত ভুলে যেতাম। তৃপ্তি পেতামঃ বুট আর বিড়ি পেয়ে বিরট ধনী হয়ে গেছি!

আর একদিন এমনিভাবে গল্প বলে রাত তিনটা বেজে যায়। নকুলদা ঘুমে ঢুলে পড়ছিল।

—নে ছ্যালা, আইজ আর না, তোরা ঘুমা, আমিও ছ্যালার একটু ছোই গিঁয়ে।

নকুলদা ঘুমিয়ে যায়। নাক ডাকতে থাকে ভীষণ জোরে। নকুলদা আর ২০ নং ওয়ার্ডে নেই। চলে গেছে ঘুমপুরীর দেশে। তার নাক ডাকার পেশীজাত শব্দই ২০নং ওয়ার্ডের খবরদারীতে যথেষ্ট।

ভোর চারটার দিকে জেলার বাবু হঠাৎ পরিদর্শনে এলেন। নকুলদাকে মরার মত নিদ্রিত দেখে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। ঘুমের সুযোগে তিনি নকুলদার পুলিশী টুপীটা আর হাতের রুলার নিয়ে সড়ে পড়েন।

নিদ্রার জন্যে নকুলদার কৈফিয়ত তলব হল। সেদিনের পর থেকে নকুলদাকে কোন দিন ২০ নং ওয়ার্ডে দেখিনি।

এটা হিন্দুস্থান, বার মাসে তের পার্বনের দেশ। সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে। আগরতলা শহর গান-বাজনা, ঢাক-ঢোল আর হৈ হুল্লোরে সরগরম। জেলখানা থেকেও এ উৎসবের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। অন্যদিকে কামানের দ্রুম্‌ দ্রুম্‌ আওযাজ বাতাসে ভেসে আসছিল। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান সেনাবাহিনীদের কামান-যুদ্ধের ভয়ংকর শব্দ মাঝে মাঝে কাঁপিয়ে তুলছিল গোটা জেলখানাটিকে। মন্দ লাগছিল না অদ্ভুত ভাবনায় মজে যেতে। পাকিস্তানের একটা গোলা যদি আমাদের ওয়ার্ডটায় পড়ত তাহলে?

www.pathagar.com

তাহলে ভয়ে তখন সব শান্ত্রী-সেপাই, কয়েদী-রাজবন্দী পালাত দ্বিগবিদিক শূন্য হয়ে। আমিও এ সুযোগে তখন সড়ে পড়তাম আখাউড়ায়। অথবা এমন যদি হত যে কামানোর গোলায় সমস্ত জেলখানাই ছারখার হয়ে গেছে!

—মাস্টারদা, আজ থেকে আমাদের দুর্গা পূজা শুরু হয়েছে। কি আনন্দই না আমার বাবা-মা ভাই-বোনদের। আজ ওরা কেনা-কাটা করবে সবাই। আমি যদি বন্দী না হতাম তা হলে ত আমিও...।

আমার মুক্তির কি মজার কল্পনাটাই না নষ্ট করে দিল অজিত! গলা ভারী হয়ে যায় অজিতের চাপা কান্নার প্রভাবে। বাবা-মা দুর্গাপূজায় শরীক হয়েছেন বটে, কিন্তু নক্সালী ছেলেটির কথাত ভুলতে পারেননি! বিকালের দিকে অজিতের বাবা তালের পিঠা, শবরী কলা, নূতন শার্ট ও এক প্যাকেট নাবিস্কো বিস্কিট পাঠিয়ে দেন জেলখানায়।

—মাস্টারদা ধর, খাও দিকিন।

হিন্দু বাড়ীর রান্না, তাও আবার পূজার প্রসাদ। কিন্তু তালের পিঠার গন্ধটা বড় লোভনীয়, অমৃত যেন! মনের সংকোচ কাটিয়ে কলা, পিঠা, বিস্কিট খেলাম। বিস্কিটগুলো ত পূর্ব পাকিস্তানী। তাই বড় আনন্দ লাগল। বস্তাপঁচা আটার রুটি খেয়ে বিস্বাদগ্রস্ত জিহবাটা আজ নূতন স্বাদ পেয়েছে! বলি হরি! নকুলদা পূজোর সময়টাতে চাকুরীটা হারালো। এই বেচারার জন্য মনে বড্ড কষ্ট লাগল আজ। তার পরিবারের আজি কি দশা কে জানে? মা দূর্গা কী তার জন্যে কিছু করবে না?

জেলখানার পাথেয়

ফের সমর বর্মনের কথা। তার নাম পুনরায় স্মরণ করছি। প্রথম প্রথম তার বেডের সাথেই আমার বেড্ ছিল। তখন পাকিস্তানী বন্দীদের মধ্যে আমি আর রবিভাই ব্যতীত আর কারো আগমন ঘটেনি।

৭/৮ বছর ধরে সমর বর্মন জেল খাট্‌ছে। জেল খানা এখন তার আপন গৃহ, আপন ধন। তার অপরাধঃ সে স্বগোত্রীয়দেরকে স্বায়ত্তশাসন আদায় করিয়ে দেয়ার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিল। নিজের দলের "মীরজাফররা" তার আক্রমণ পরিচালনার স্ট্রাটেজী সরকারের নিকট ফাঁস করে দেয়। ফলে এক গভীর রাতে বর্মনের আস্তানায় হানা দিয়ে ২০/২৫ রাউন্ড গুলির বিনিময়ে সে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়। একদিন সে আমাকে বললঃ

আলম জেলে এসেছ খু-উ-ব ভাল হয়েছে। বিয়ের মত জেলের অভিজ্ঞতা না থাকলে মানবজীবনের বিরাট অংশই অজ্ঞাত থেকে যায়।

কেমন করে? শুধালাম। ধনুকের মত ঈষৎ বাঁকা হাসির মাধ্যমে উজ্জ্বল সুন্দর দন্তপাটি বিকশিত করলো। বলল ঃ দাদা, মানুষের নিরাভরণ রূপ ও প্রকৃতি-জ্ঞান অর্জনের প্রকৃষ্ট স্থান জেলখানা। এখানে তুমি নৃতত্বজ্ঞান যেটুকু অর্জন করতে পারবে তা তোমার ডকটরেট ডিগ্রী প্রাপ্তিতেও হবে না।

সমর বর্মনের এই মন্তব্য যথার্থ। ম্যারেজ লাইফে যেরূপ প্রত্যক্ষ সংসার জ্ঞান হয়, তেমনি জেল-লাইফে মনুষত্ব-জ্ঞানও যে অনুরূপ ঘটে তাতে সন্দেহ নেই।

সমর বর্মনের কাছে জেলখানার সম্বল তথা পাথেয় সম্পর্কেও সবিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছি। যেমন এক নম্বর ঃ তেতুলের টক!

www.pathagar.com

জেল জীবনে যৌনাবেগ সংযত ও স্তিমিত রাখার জন্য বন্দীদের তরকারীতে তেতুলের টক মিশিয়ে পাকশাক করা হয়। দুই নম্বর হচ্ছে থালার বিবিধ ব্যবহার।

থালা জেলীদের একটি মহামূল্যবান সম্পদ। এতে খাওয়া চলে। পানি ভর্তি থালা দর্পন হিসেবে ব্যবহার করে নিজের চেহারাটুকু অবলোকন করা যায়। Face is the index of mind-সে হিসেবে এভাবে চেহারা দর্শনে মনের খবরাখবরটি ও চক্ষুষ্মান হয় বৈকি!

এছাড়া উপুড় করা থালা বিছানো কম্বলের নীচে রেখে বালিশে ঘুমানোর স্বাদ ও তৃপ্তি মেলে। শুধু কি তাই? তবলা বা বাদ্য-যন্ত্র হিসেবেও এর শিল্প-কুশলী ব্যবহার রয়েছে। আপৎকালীন তথা ঝগড়া-ফ্যাসাদের বা মল্লযুদ্ধের সময় থালার বিশেষ ব্যবহারটিও লক্ষণীয়। আক্রমণের সময় "সমরাস্ত্র" আত্মরক্ষার সময় "ঢাল" হিসেবে এর ব্যবহার সমরবিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজনই বটে।

মাঝে মাঝে টেলিগ্রাফিক সংকেতের মত সংবাদ ব্যবহার প্রদানেও থালার চৌকস ব্যবহার রয়েছে। সমরদার কথায় ঃ বিপ্লবী বন্দীরা জেলখানায়ও "স্যাবোটেজিং" কর্মকাণ্ড এভাবে পরিচালনা করে। এমনিভাবে আমি একদিন পাশের সেলে সংকেত পাঠাতে গিয়ে বেদম ভাবে প্রহৃত হয়েছি।

সমরদা তার কয়েদী-ফতুয়াটি গুটিয়ে পিঠ দেখাল। ভয়ে আঁৎকিয়ে উঠি,—তার পিঠের একখণ্ড মাংস যথাস্থান হতে অপসারিত হয়ে "ক্যারব্যাংকলের" মত জমাট বেঁধে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম ঃ

দাদা তোমার পিঠের এ অবস্থা কেমন করে হল? জবাবে সমরদা বললে ঃ বুটের তলার পিনের ঘষা খেয়ে।

সমরদা থালার আর একটি বৈশিষ্ট্যও বলেছিল। তা হচ্ছে, থালার পিঠে ষোলগুটির ঘর এঁকে Indoor game খেলার স্বাদ মেটানো। চিকন অথচ মজবুত জামা ইটের কণা দিয়ে এতসুন্দরভাবে এঘর আঁকা যেন মনে হয় এক কুশলী শিল্পী এতে ভাস্বর হয়ে আছেন!

তৃতীয়টি হচ্ছে বাটি। এটি থালার ব্যবহারে ক্ষুদ্র সংস্করণ। স্নানের সময় এর ব্যবহার কত যে উপযোগী তা হাউজের পানি-ভোগের যুদ্ধের সময়টিতে প্রকট হয়ে উঠে।

কম্বল হচ্ছে আরেকটি সবিশেষ সম্বল। স্বাভাবিকভাবে তিনটি, ঘাট্‌তি বা শাস্তির সময় এক অথবা দুটি কম্বল কয়েদী-হাজতীকে দেয়া হয়।

লেপ-তোষক-বালিশ; কখনও বা পরিধেয় বস্তু হিসেবে এর ব্যবহার-বিধি রয়েছে। চান্ এর সময় অনেক কয়েদীকে উলংগ হয়ে ঝট্‌পট্ স্নান সেড়ে কম্বল দিয়ে গামছার প্রয়োজন মিটিয়ে পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। সর্দি-কাশি জ্বর, বিশেষ করে বাতের সময় কম্বলমুড়ি শুধু একটি চমৎকার প্রতিষেধকই নয়; বরং এটি একটি আরোগ্য লাভের ঔষধও বটে!

মুক্ত পৃথিবীতে সংসার বিরাগী সাধু-দরবেশদেরকে শুধু কম্বলেই জীবন কাটানোর তাৎপর্যটি এতদিন পর আমার নিকট স্পষ্ট হল।

স্বল্প জীবন সামগ্রী নিয়ে জীবন কাটানো; মহাপুরুষ গৌতম বৌদ্ধের মত জীবন পাতের আদর্শ তথা কৃচ্ছ সাধনে জীবন যাপনের বাস্তব ট্রেনিং সেন্টার হচ্ছে জেলখানা; সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

সমর বর্মন বৌদ্ধ। তার জেলদর্শন তার ধর্মের আলোকে আলোকিত ও উজ্জীবিত। সমর বর্মন কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট হবে; এ বিষয়ে জানার জন্যে প্রশ্ন করলে সে উত্তর এঁড়িয়ে যায়। যুব বয়সের হলেও কথা ও আচরণে বেশ প্রৌঢ় সে। সমর বর্মনকে আমার জেল জীবনের একটি পরম মানসিক খুঁটি হিসাবে পেয়ে বড়ই আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠি।

কানুদা পেটুক তবে কপট নন

নকুলদা ২০নং ওয়ার্ড ছাড়ার পর কানুদা এলো শান্ত্রী হয়ে। নকুলদা আমাদেরকে তার নিজ পয়সায় কেনা ছোলাবুট ও বিড়ি খাওয়াত, আর কানুদা উদয় পূর্তি করত কয়েদী হাজতীদের বরাদ্দকৃত খাদ্যে ভাগবসিয়ে। যেদিন ভাল মাছ—মাংশ বা ডিম পাকানো হত সেদিন কানুদার জন্যে স্পেশাল এক বাটি তরকারী ও চারটে রুটি রাখা চাই-ই। রাম-আ-রাম, হরে-হরে, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ উচ্চ স্বরে জপনাম করতে করতে কানুদা আসত রোজ সকাল সন্ধ্যায়। বিশেষ করে সন্ধ্যায় এসেই বলত ঃ

—কইরে অজিত বাবা, আমর বাটিটা দে ত।

—এই যে দাদা ধর।

লোহার দরজা ধড়াস করে একটানে খুলে কানুদা পরনের খাকী হাপপেন্টটায় হাত মুছে খাওয়ায় লেগে যায়, ভূখা মিসকীনের মতো।

—দেখরে অজিত, তোরা জেলখানায় দিব্যি আরামে দিনগুলি কাটাচ্ছিস। রুজি-রোজগারের চিন্তা নেই, তেল-নুন মরিচের ফুট-ফরমায়েস শুনতে হয় না, ছেলে-মেয়েদের ঘ্যানঘ্যানানী প্যানপ্যানানী নেই, অসুখে ডাক্তার ডাকার জন্যে গিন্নীর তাড়া খেতে হয় না। বড় বড় গ্রাস ধরে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে কানুদা। গাল চব্‌কায়ে চব্‌কায়ে খাওয়ার নমুনায় মনে হত কতদিন যেন এই সুস্বাদু খানা তার নাড়ে পড়েনি। জেলখানার অধিবাসীরা জেলে থাকে আধপেটা, কানুদা থাকে ঘর-বাড়ীতে। এই ধারণাটুকু সত্যি বলে প্রতিভাত হয়ে উঠে।

—মাস্টার, শুন। তোমরা জয়বাংলার লোক। কত স্বর্গসুখেই না আছো। ভগবান তোমাদের দেশকে সোনার দেশ করে বানিয়েছে। মাছ-মাংশ, দুধ ডিমের কোন অভাবই নেই তোমাদের। আর আমাদের অবস্থা কি জান? দু বছরেও একটা ইলিশ খাওয়ার ভাগ্য ঘটে না।

মাস্টার, তুমি ত জ্ঞানী মানুষ। ধার্মিকও। সত্যি করে বলত জয় বাংলাটা স্বাধীন হবে?

—চেষ্টা করলে কি না হয় দাদা। চেষ্টা ও শ্রমের অপর নামই ত সুখ।

—মাস্টার, জাননা ত, কত যে আরাধনা করছি জয় বাংলা স্বাধীন হওয়ার জন্যে। এই দেখ না, জয়বাংলার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে জেলখানায় প্রতিদিন মাত্র ৮ ঘণ্টা ডিউটি করতাম, কিন্তু এখন ইমারজেন্সী বলে ১৪ ঘণ্টা ডিউটি করতে হচ্ছে আমাদের সবাইকে। জয় বাংলা স্বাধীন হলে আবার তোমাদের সাথে মিলে মিশে আর যাই হোক খাওয়ার কষ্ট থেকে ত মুক্তি পাব!

কানুদার কথার মধ্যে প্রাণ ও সরলতা ফুটে উঠে। কানুদা পেটুক বটে তবে কপট নয়, বাচাল, তবে দেমাগী নয়; বরং দরদী। আর একদিন কানুদা ব্যথিত সুরে জিজ্ঞেস করে ঃ

—দেখ মাস্টার, পলিটিক্স কেন কর? আজ তোমার বাপ-মা, ছেলে-মেয়ে কোথায়, আর তুমিই বা কোথায়? আর যদিও বা পলিটিক্স করলে তবে আওয়ামী লীগ না করে জামাতে ইসলামী বা করতে গেলে কেন? ভারত মাতাকে বিভক্ত করেই সর্বনাশ করলে তোমরা।

www.pathagar.com

চুপটি মেরে শুনতে লাগলাম তার উচ্ছ্বাস মাখা বক্তব্য। মনে মনে ভাবি "কানুদা" কত অজ্ঞ ও মুর্খ ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে! ভারত যদি বিভক্ত না হতো তাহলে আজ হাজার হাজার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরত আগরতলা সেন্ট্রাল জেলের কয়েদীদের মত! তথাকথিত পাশ্চাত্যতন্ত্রের নিয়মে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের মেজরিটি ভোটে ভারতীয় মুসলমানদের দৈহিক দাসত্বই জুটতনা কপালে, বরং তার সাথে সাথে মুসলিম ও ইসলামী সংস্কৃতি লোপ পেত ব্রাহ্মণদের আর্থ ধর্মীয় সামাজিক ঠেংগানী আর প্রতিপত্তিতে। ভাবতে লাগলাম কি ভাবে কানুদার কথাগুলোর সদুত্তর দেয়া যায়।

—কানুদা, ভারত মাতাকে বিভক্ত ত আমাদের মত বয়সের লোকেরা করেনি। বরং আপনাদের ও আপনাদের বয়োজেষ্ঠ মুরুব্বীরাই এজন্যে সর্বপ্রথম দায়ী। মহত্মাগান্ধী আর পণ্ডিত জহরলার নেহেরুই সর্ব প্রথম কংগ্রেসী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছেন। মিঃ জিন্নাহর মত লোকই কংগ্রেসের পাল্টা "মুসলীমলীগ" দলকে শক্তিশালী করেছেন। ফলে ভারত মাতা হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানে বিভক্ত হয়ে যায়। আমরা জন্মিনিয়েই দেখতে পাই আমাদের দেশে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে আকাশ—বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে, পাশাপাশি আপনাদের ছেলে-মেয়েরা দেখতে পায় "জয় হিন্দ" এর জন্ম। সুতরাং ভারত মাতাকে বিভক্ত করার জন্যে দায়ী সর্বপ্রথম আপনার গান্ধিজী, পণ্ডিত নেহরু আর আমার জিন্নাহরা। আজ ত তাদেরই জেলখাটা উচিত, আমার নয়। কানুদা আমার কথায় হতভম্ব হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে চাপা দিয়ে অন্য প্রসংগের অবতারণা করে।

পাক বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটেছে। পাক বাহিনীকে সমুচিত শাস্তি দেয়ার জন্যে মুক্তিরা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ট্রেনিং নিচ্ছে। তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে প্যাটন ট্যাংক, বোমারু বিমান ও কামানের যথার্থ সমাবেশ করা হচ্ছে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে। এবার "জয় বাংলা" স্বাধীন হবেই—এ প্রত্যয় বাণী শুনিয়ে দেয় কানুদা আমাকে।

কানুদার কথাগুলো প্রায় সেন্ট পার্সেন্ট সত্য। জেলখানার বোধ হয় এটা এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। কারণ বাইরের জগতের খবরা খবর পোস্টমর্টম হয়ে যা জেলখানার রাজ্যে প্রবেশ করে তা 'সার' টুকুই। ফলে এটাই শেষ পর্যন্ত টিকে যেত। পরে প্রমাণ ও পেয়েছিলাম কানুদার এসব কথার পরিপূর্ণ সত্যতা। সেদিন কানুদা বলছিল ঃ

—মাস্টার, তোমাদের লীডার "মওদুদী"কে মেরে ফেলেছে মুক্তিরা। এতে আচমকা ভয় পেয়ে যাই। দুঃখে কাতর হয়ে পড়ি ভীষণ। ঠিক দুদিন পরে অমৃত বাজার পত্রিকায় দেখতে পাই "মুক্তিদের গুলিতে হোসাইন আহমেদ মদনী নিহত"। কানুদা এই মাওলানার খবরটিই দিয়েছ দুদিন আগে।

শুধু নামের বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে কানুদা মাওলানা মদনীর পরিবর্তে মাওলানা মওদুদী বলে। এটা তার ইচ্ছাকৃত ছিল না মোটেই। তাই কানুদার খবরটা শুধু "খাসা"—ই ছিল না বরং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় পূর্বেই সে-খবর ত্বরিত গতিতে সংগ্রহও করেছিল সে। টাটকা সংবাদ সরবরাহের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে আমরা তাকে মূল্য দিতে শিখি।

কানুদা মোটা-সোটা, দীর্ঘাকৃতির, খোশ মেজাজী ও কৌতুক প্রিয়। তার সংগ লাভে হৃদ্যতা ও সুখ ছিল বলে আমরা মানসিক দিক থেকে বড়ই স্বস্তি অনুভব করতাম।

www.pathagar.com

রবি ভাই-এর মুক্তি সন্দেশ

কয়েকদিন পর নুরুল ইসলাম নামে এক কিশোর ২০নং ওয়ার্ডে এল। কসবায় বাড়ী। রাইফেলের ব্যবহৃত গুলির খোসা এবং টোটা কুড়িয়ে আগরতলার বাজরে সে বিক্রী করত। প্রতি সের খালি টোটার দর ছিল ৩ থেকে ৫ টাকা। এ পয়সা দিয়েই সে তার বুড়ো বাবা মাকে ভরণপোষণ করত। কসবা সেক্টরে সপ্তাহখানেক আগে ভীষণ যুদ্ধ হয়। পাঞ্জাবীরা মুক্তিদেরকে পিছু হটিয়ে দিয়ে গংগাসাগর, ইমামবাড়ী ও কসবা দখল করে নেয়। প্রতিদিন হাজার রাউন্ড গুলি বিনিময় হয় এখানে, ফলে হাজার হাজার টোটার আবরণে এসব অঞ্চল তামাটে হয়ে যায়।

নুরুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করলাম কবে এবং কিভাবে সে আগরতলায় বন্দী হয়। উত্তরে জানায় ঃ

—মাস্টারদা, দুদিন আগে আমি বন্দী হই। অন্যান্য দিনের মত আগরতলার শহরে যখন টোটা বিক্রী করতে এসেছি তখন দুজন পুলিশ আমাকে পাকিস্তানের চর হিসেবে টোটাসহ থানায় চালান দেয়। বেদম মারধোর করে পাঠিয়ে দেয় জেলখানায়।

—এ দুদিন কোন ওয়ার্ডে ছিলে?

—১নং ওয়ার্ডে।

নুরুল ইসলাম থেকে খবর নেই ১নং ওয়ার্ডের রবিউল্যাহ ভাই ও অন্যান্যদের। সে জানায়, রবি ভাই তার হাতের আংটি ও নগদ ৬০ টাকা, যা জেল গেইটে জমা ছিল তা দিয়ে জামিন লাভ করে দেশে ফিরে গেছেন। রবিউল্যাহ ভাই ১নং ওয়ার্ডে আর নেই। মনটা বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমরা এক সাথে বন্দী হয়েছিলাম মুক্তিদের হাতে, অথচ আচ রবি ভাই দেশে ফিরে গেছেন আমাকে ফেলে? তা ত হবেই। সোনার আংটি আর টাকার মোহিনী শক্তিতে কি-না করা যায় এই দুনিয়াতে? আমার ত এসব কিছুই নেই, পরিধানের একমাত্র ছোঁড়া লুংগী আর গুটি বসন্তের মত অজস্র ফুটো বিশিষ্ট পুরাতন হাত কাটা গেঞ্জিটা ছাড়া। এ অবস্থায় মুক্তি পাওয়া থাক দূরের কথা, আব্রু বাঁচানোই দায় হয়ে উঠেছে।

সিধাই থানা, বটতলী ও ১নং ওয়ার্ডের ঘটনাগুলো ভেসে উঠে মনের দর্পণে। আপনি কেঁদে ফেলি বেখেয়ালে। চারটি মাস চলে গেল, কেহ থানায় খোঁজ নিচ্ছে না। আপনজনেরা ভেবেছে আমি আর বেঁচে নেই। যদি তা-ই সত্য হয় তবে এ জীবনে আর মুক্তির মুখ দেখবনা। আজীবন ২০নং ওয়ার্ডের ২নং সেলে মৃত্যুর প্রহর গুণতে হবে আমাকে। পলে পলে সোনার জীবন যৌবন ক্ষয় পেতে থাকবে গলা বরফের মত। আমার এম.এ. ডিগ্রী, বি,এড ডিগ্রী সবই পঁচনশীল! এত কষ্ট করে এত বিদ্যা অর্জন করে কি লাভ হল আমার! আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে কি পেলেন আমার বাবা-মা ও সমাজ? হায়, মানুষ মানুষকে বুঝি এমনিভাবে বন্দী করে অমূল্য জীবন-যৌবন, জ্ঞান-বিদ্যার ধ্বংস সাধন করে? এ অপচয় রোধের উপায় কি?

জেলখানায় শিক্ষকতা লাভ

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। ভাবি এক্ষুণি সেলের দেয়ালে অথবা লোহার শিকে মাথাটা আছড়িয়ে অপদার্থ জীবনের অপচয় রোধের ইতি করে দেই।

www.pathagar.com

কিন্তু জেলখানায় "আত্মহত্যার" চেষ্টা যে মারাত্মক অপরাধ! এ ধরনের চেষ্টায় ফলবতী নাহলে আরো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর আকাংখাকে আরও দীর্ঘ ও অসহনীয় করে তুলবে? আত্মহত্যায় মুসলমান ইহকাল পার হয় বটে তবে আখিরাতে সে চির জাহান্নামী হবে। বহু কষ্টে অন্যদিকে মন ঘুরিয়ে নেই। দেহ মন হাল্কা ও পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে অন্য চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার আপ্রাণ প্রয়াস পাই।

—মাস্টারদা, তুমি ত এম. এ. পাস। তাছাড়া স্কুলে মাস্টারী করেছে। আমাদেরকে পড়াতে পাড়বে? সুধীর আমাকে অনুরোধ জানায়। এতে বেশ খুশী হয়ে উঠি ঃ

—নিশ্চয়ই। আমি পড়াতে পারলে বাঁচি। এতে বাজে চিন্তা থেকে মনটা বেঁচে থাকে, অপরদিকে লেখাপড়ার চর্চাটাও টিকিয়ে রাখা যায়।

সুধীর ও অজিত বাড়ী থেকে ওদের বই-পত্র আনিয়ে নেয়। অজিত আই.কম. ফেল। আর সুধীর ছিল আই.এ ফেল। ওদেরকে ইংরেজী ও বাংলায় পড়াতে লেগে গেলাম। পারিশ্রমিক হিসেবে কেন্টিন থেকে রোজ বিকেলে চা, বিস্কিট আর হয়ত নাম্বার টেন, কখনওবা মিনারেট বা স্টার সিগারেট সেবনের সৌভাগ্যের দ্বার খুলে গেল আমার। গায়ের ঝাঁঝরা গেঞ্জিটা দেখে সুধীরের মনে বড্ড কষ্ট লাগে। একদিন সে তার একখানা পাঞ্জাবী আমাকে দান করে। "পাঞ্জাবীটা" পেয়ে খুব খুশী হই। এক রাজ্য আনন্দ পাওয়া যেন! কৃতজ্ঞতায় আনন্দাশ্রু বেয়ে পড়ে গণ্ডদেশে। নিজেকে উকিল বাবুর মতই একজন রাজবন্দী মনে হল। শুধু পার্থক্য এই যে উকিল বাবু মশারী টাংগীয় লেপতোষক-বালিশে ঘুমান। অবসর সময় বসে কাটান স্টীলের ফোল্ডিং চেয়ারটায়। আর আমি ঘুমাই ফ্লোরে কম্বল পেতে, রাত যাপন করি মশার ভন্ ভন্ মিউজিক শুনে, কখনও শ্যালকের মত কামড় খেয়ে এদের টিপ্পনীতে হাত-পা নেড়ে কৌতুক করি। দিনের বেলায় খালি মেঝেতে হাত-পা নেড়ে ক্লাসিকেল নৃত্য করি মাছির সাথে।

ডাল-গাল-ফ'াল

ঢং ঢং ঢং। ১১টা বাজল। শান্ত্রী এল। বিরাট বুপু, ইয়া গোঁফ, হাতে ডোড়া ব্যাটন। লাল চিক চিকে রংটা মলিন হয়ে গেছে ব্যাটনটার। চোর-ডাকাত মেরে-পিটে ঠাণ্ডা করা হয়েছে এটা দিয়ে গত তিন বছর ধরে। আঙ্গুলের ছাপ পড়ে গেছে ব্যাটনের হাতলটায়।

—বাইল, বাইল, বাইল। শান্ত্রী কর্কশ স্বরে হুংকার দিয়ে উঠল। বাইল। আসল উচ্চারণটা হচ্ছে "ফাইল"। দুজন করে জোড়া বেধে সারি হয়ে দাঁড়ান। এটা জেলখানার নিয়ম। ডাল-ফাল-গাল। এ তিনটি অনুশাসন মেনে চলতে হয় জেলখানার কয়েদী ও বিচারাধীন লোকদেরকে।

ডাল। এটি অত্যাবশ্যক খাদ্য। রুটি বা ভাত এ দুটোর কোন একটির সাথে ডাল অবশ্যই থাকবে। এর সথে এক ইঞ্চি বর্গাকৃতি পরিমাণ মাছ বা মাংশের টুকরো। বিশেষ করে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার একবেলা করে মধ্যাহ্ন ভোজে মাছ-মাংশ দেয়া হয়।

ডালের রংটা ইন্টারন্যাশনাল। এর রং কখনো সমুদ্রের পানির মত। কখনও বা পদ্মা বা মেঘনার মত ঘোলাটে বা নীল। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া ডালের অস্তিত্ব ঠাহর করা মুস্কিল, দূরবীক্ষণ-যন্ত্র ব্যতীত ডালের দর্শন মেলা ভার। বালতি ভরে ডাল আনা হয়।

www.pathagar.com

আধপোয়া পরিমাণ বাটি দিয়ে বাটি বাটি ঢেলে দেওয়া হয় পাতে-পাতে। খেতে বড় অদ্ভুত। কোনদিন সাগরের লোনা পানির স্বাদ, কখনও বা মনে হয় ম্যালেরিয়ার রোগীর মিশ্রিত স্রেফ আলুনি মিকচার।

খাওয়ার শেষ পর্বটুকু ডালের মহিমায় বিধৃত। "সোঁত, সোঁত" আওয়াজে জেলখানার পরিবেশ সংগীতময় হয়ে উঠে। বিশ্ব স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ "আদম" সন্তানের নিকৃষ্ট অধঃস্তনেরা খাওয়া-পর্বের যবনিকাপতা করছে সাধের ডালের তলানিটুকু চুমুক দিয়ে।

ফাইল। দুজন করে সারি বেঁধে দাঁড়াতে হয় সকাল-সন্ধ্যায়। গুণতি হয় ঘুম থেকে উঠলে পরে। ওয়ার্ডে সর্দার গুণতে থাকে—এক, দুই...চারশ, চারশ এক, দুই তিন করে। রাতে কেউ ভাগল কিনা, অথবা কেউ হাসপাতালে যাওয়ার ভাগ্য পেল কিনা, অথবা নতুন কতজন অতিথি আজ এল, কতজনই বা ছাড়পত্র পেয়ে আজাদী লাভ করল। ফাইল একটি কঠোর ডিসিপ্লিন। এর ব্যতিক্রম কেউ করলে তাকে জঘন্যভাবে বেত্রাঘাত করা হয়। এমনকি অনেক সময় ফাইল অমান্যকারীকে পিটিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ফাইল দর্পণ বিশেষ কয়েদী ও বিচারাধীন বন্দীদের নাম-ধাম, পাপ-অপরাধ, অন্য কথায় জেল বাসিন্দাদের পুংখানুপুংখ রেকর্ড তথা বায়োডাটা এরই মধ্যে প্রকাশ পায়।

খেতে যাও-ফাইল, গোসল কর—ফাইল, কোর্টে যাও—ফাইল, এমনিক পেশাব পায়খানা কর, তা-ও ফাইল।

সপ্তাহে প্রতি রোববার জেল অধিবাসীদের বিছানাপত্র রোদে শুকাতে হয়। থাকা-খাওয়া ও পায়খানা-প্রস্রাবের স্থান ওদের নিজেদেরই ধুয়ে মুছে দিতে হয়। 'প্রিজনারস বা আন্ডার ট্রায়েল প্রিজনারস' দের পরিচয়পত্র চেক করা হয়। এসব কিছুই ফাইলের নিগড়ে বাঁধা।

গা'ল। গাইল। মানে গালি-গালাজ। এ জেলখানার নিত্য নৈমিত্যিক ভাষা। শাসন-সোহাগ, ক্রীড়া-কৌতুক সর্বক্ষেত্রেই গালিগালাজ একমাত্র সম্পর্কের স্বর্ণসূত্র। হেড সুবেদার-জমাদার সাহেব থেকে এই গালিগালাজ শুরু। সাধু-সজ্জন ব্যক্তিকে মহামানব বা মহাপুরুষের শিক্ষা দিতে গেলে যেরূপ ঐশ্বরিক গ্রন্থের বাণী শোনানো হয় ঠিক তেমনি পাপী পথভ্রষ্টদের নিয়ন্ত্রণ এর জন্যে কঠোর শাসন নীতিমালা হিসেবে গালিগালাজ অমোঘ টনিক বিশেষ।

Profession moulds human character-পেশাই মানব চরিত্রের রূপকার। জেলখানায় বা পুলিশী চাকুরী যারা করেন তাদেরকে গালিগালাজ বিশারদ না-হলে বোধ হয় চলে না।

শান্ত্রী সাহেবের কথায় আবার ফিরে আসা যাক।

—এই ছালারা উথ, উথ। কোর্টের ছময় অইছে। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে শান্ত্রী বলে উঠল। পান চিবিয়ে দাঁতগুলো মরছে রং ধরেছে। সামনের উপর পাটির দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে ঐতিহাসিক জামানার পানের গাদ এঁটে রয়েছে। হাতের ব্যাটনটা ঘুরাচ্ছে মহরমের তাজিয়া খেলোয়ারদের মত। কোমরের বেল্টে ঝুলছে একগাছি চাবি, ওজন হবে পোয়া খানেকের মত।

ফাইল করে ছজন আসামী দাঁড়াল জেলখানার সেকেন্ড গেইটে। রমেশদা সেকেন্ড গেইটের প্রহরী। 'মোস্ট অবিডিয়ান্ট এন্ড এলার্ট'। অত্যন্ত খুঁত-খুঁতে। বয়স হবে নব্বই

www.pathagar.com

এর কাছাকাছি। কমপক্ষে বছর দশেক আগেই রিটায়ার্ড হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সার্টিফিকেটএর জোরে আরও তিন বছর চাকুরী করতে পারবেন তিনি।

—হরির পো, সামনে আয়।

সুবল সামনে এল। রমেশদা তাকে চেক করতে শুরু করলেন; কোমর, হাত, পা, পেট, বগল, উরু।

—হাঁ কর ছালা।

সুবল হাঁ করে।

এমনিভাবে পর পর বাকী পাঁচ জনের ও তল্লাশী শেষ হল।

সেকেন্ড গেইট উতরিয়ে ফার্স্ট গেইটে পৌঁছল আসামী ছজন।

লাল গাড়ীটা দাঁড়িয়ে। আসামীদের গাড়ীঃ প্রিজনারস্ ভ্যান।

আসামী ছজনকে তোলা হল লাল গাড়ীটায়।

সোঁ-সোঁ করে ছাড়ল গাড়ী। জালের জানালাগুলো দিয়ে দুজন আসামী তাকাচ্ছি বাইরের জগতের দিকে। কি বিচিত্র এই জগত। কত গাছ, লতা-পাতা, কত রকমের মানুষ, ছোট-বড়, ছেলে-মেয়ে, রং বেরং-এর জামা কাপড় পরে ঘুরছে। ওরা সবাই রংবেরং-এর প্রজাপতি। গোটা বিশ্বটা একটি বিচিত্র কানন। রিকসায়, বাসে, জীপে, ট্রাকে, কেউ বা হেঁটে চলছে নানা কাজে। নানা চিন্তা ওদের মন-মগজে। আনন্দ আর বৈচিত্রের এই জগত থেকে বঞ্চিত আমরা। হয়ত আমাদের আত্মীয়-স্বজনও এই বিশ্ব মেলায় মিশে গেছে, আর দোলা খাচ্ছে কর্মজীবনের ঘূর্ণি-চক্রে।

—আহ্ এমনটি যদি হত! একটা বিরাট ভূমিকম্প হয়ে এক্ষুণই গোটা দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যেত। কতই না মজা হত। কোথায় যেত ড্রাইভার আর কোথায় যেতো শান্ত্রীর দল। যার যার প্রাণ নিয়ে দেছুট্। আমরাও বেঁচে যেতাম জেলখানার অভিশাপ থেকে।

ভাবছিলাম কবে শেষ হবে আমার এ অভিশপ্ত দিনের। হঠাৎ গাড়ী থেমে গেল। সম্বিৎ ফিরে পেলাম, দেখলাম কোর্ট আংগীনায় পৌঁছেছি। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোর্ট হাজতে কাটালাম। এরপর ফের জেলখানায়। বিচারক অসুস্থ বলে সেদিন আমাদেরকে কোর্টে হাজির করা হয়নি।

আশুবাবুর খবর এল

চার দিন পর। কোর্ট থানায় হাজিরা দিয়ে এসে শাহাদাত হোসেন জানাল জনৈক আশু বাবু আমাকে তালাশ করছে। আশু বাবু শাহাদাতকে বলে দিয়েছেন, শাহাদাত যেন আমাকে জানিয়ে দেয় আমার মুক্তির জন্যে আশু বাবু চেষ্টা তদবীর চালিয়ে যাচ্ছেন?

কিছুতেই একথা আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বিদেশ-বিভূঁইয়ে এ আবার কোন আশুবাবু আমার মত অধমের জন্য তদবীর চালিয়ে যাচ্ছেন!

কয়েকদিন পর আমার কোর্ট হাজিরার তারিখ পড়ল। সত্যিই কোর্টে গিয়ে দেখলাম কথিত আশু বাবু এসেছেন আমার খোঁজে। কথা বলে জানতে পারলাম ঃ

আশু বাবুকে বর্ডার দিয়ে টাকা পাঠিয়েছেন আমার আব্বা ও আমার ভগ্নীপতি মাহবুবুর রহমান সাহেব। এঁরা কছম দিয়ে আশু বাবুকে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে ২/১ মাসের মাধ্যই যেন আমাকে খালাস করে পাঠিয়ে দেয় পাকিস্তানে, অর্থাৎ দেশের বাড়ীতে। এই সুযোগে আশু বাবুকে অনুরোধ জানালাম একটি গেঞ্জি ও একটি লুংগীর

www.pathagar.com

জন্য। তিনি তা কিনিয়ে আনলেন। টাকা দশটাও কেন্টিনে তার মাধ্যমে জমা করিয়ে রোজ চা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিলাম জেলখানাতে।

পরপর তিনটি কোর্টের তারিখ কেটে গেল। নানা করণে আমাকে কোর্টে হাজির করা হল না। আজ ম্যাজিস্ট্রেট নেই, কাল-চার্জশীট এখনও পৌঁছেনি, পরশু আচমকা ম্যাজিস্ট্রেট সহেব এজলাস ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন, ইত্যাদি। মনটা বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

উকিল বাবু একদিন জানালেন পাকিস্তানী প্রায় বন্দীরাই মুক্তি পেয়ে পুনরায় "মিসার" (Maintenance of Internal Security Act : MISA) ফাঁদে বন্দী হয়ে ৮নং ওয়ার্ডে দিনাতিপাত করছে। একথা শুনে মাথাটা আরও ঘুলিয়ে গেল। মনটা নেতিয়ে পড়ল ঃ মুক্তির মুখ বুঝি দেখবোনা আর। বাবা, মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে বোধ হয় এই ইহজীবনে আর দেখতে পাবো না।

শাহাদাত, পীর ছাহেব আর জলিল সাহেব-সবাই আমাকে সান্ত্বনা দেয়। "উকিল মুক্তার যখন তোমায় ঠিক হয়ে গেছে, তোমাকে আর বেশি দিন থাকতে হবে না। জেলখানার রুটি-ভাতের রেজেক যা তোমার জন্যে বরাদ্দ ছিল তা ফুরিয়ে উঠছে। দেশে গিয়ে আমাদের কথা ভুলে যেওনা। আমাদেরও খালাস করার ব্যবস্থাটা করো," ইত্যাদি কত কথা। ওরাও আমার আশু বাবুকে দিয়ে ওদের আশু মুক্তির সোনালী স্বপ্ন দেখছে। মনে মনে বিরক্ত হয়ে যাই। যেখানে কোর্টেই আমাকে হাজির করছেনা, আর ওরা বলে কি আমি পেয়ে যাব মুক্তি? আবার মুক্তি যদিও বা পেয়ে যাই তবে 'মিসাতে' পুনরায় বন্দী হয়ে গেলে কোর্টের তারিখই আর আসবে না জীবনে। অনির্দিষ্ট কাল ধরে পঁচতে হবে ৮নং ওয়ার্ডে। নিরাশার অন্ধকূপে ঘন ঘন হাবুডুবু খাচ্ছিলাম।

চরকির মত দিনক্ষণ ঘুরে কোর্টের হাজিরার তারিখ আবার আসে বন্দী জীবনে। সকাল সকাল চান-খাওয়া সেরে নূতন গেঞ্জি আর লুংগীটা পরে রওয়ানা হয়ে যাই আরও ছয় জন কয়েদী আসামীর সাথে। মনটা খুবই আন্‌চান্ করতে লাগল। আজ যদি কোর্টে না তোলা হয় তবে বোধ হয় আর বাঁচবো না। এতদিন-পাঁচ মাস একুশ দিন কাটিয়েছি আশায় আশায় বুক বেঁধে। আমার যা জ্ঞান ও চিন্তা, ধৈর্য ও দৃঢ়তা সঞ্চিত ছিল সবই নিঃশেষিত প্রায়...।

অধীত এবং অর্জিত জ্ঞান ও চিন্তা ক্ষয়ে গেছে। মনের বল ধরে রাখার কোন নূতন পথ জানা নাই আর। রোজকার রুটিন্‌ড ভাত-রুটির মত চর্বিত জ্ঞান মুক্তিপাগল হৃদয়ের ক্ষুধা আর মিটাতে পারছে না। পেটের জন্যে মানুষ কাজ করে, পেটের জন্যেই মানুষ চুরি ডাকাতিও করে আবার। যৌবনের জন্যে মানুষ বিয়েশাদী করে, এই যৌন ক্ষুধার তৃপ্তি না মেটাতে পারলেই মানুষ বলৎকার করে। জ্ঞানার্জনেই মানুষ মহৎ হয় আবার কুজ্ঞান বা আদর্শ জ্ঞানের অভাবেই মানুষ হয় কুৎসিত কদাকার। আগরতলার জেলখানা এই দর্শনই পরিস্ফুট করে ধরে আমার বন্দী জীবনের দৃশ্যপটে, আমার মানস চক্ষে দেদীপ্যমান ভাবে।

দ্বিতীয়টি ক্ষুধা। এ সমস্যাকে কেন্দ্র করেই সমাজবাদ তথা মার্কস-লেলিন বাদের জন্ম। যৌন ক্ষুধাকে কেন্দ্র করেই জন্ম হয়েছে ফ্রেয়েডীয়ান দর্শনের। উদরের ক্ষুধাকে পুঁজি করে জন্ম হয়েছে মার্কসবাদের। জ্ঞান রাজ্যের সঠিক পথের অভাবেই জন্ম

www.pathagar.com

নিয়েছে কত সংঘর্ষমুখী আদর্শবাদের। উকিল বাবু, অজিত, মহেন্দ্রদা, সিরাজ ভাই, ইমামদ্দিন, র‍্যাংকেল গোমেস-ওরা সবই ত এসব মতবাদের সৃষ্ট কীট। এরা ক্ষুধার রাজ্যের বিষাক্ত কীট যা মানব সমাজকে কুঁড়ে খাচ্ছে।

—ফাইল, ফাইল।

কোর্ট থানার শান্ত্রীর হুঙকারে আমার কল্পনামুখী মন জড় জগতে ফিরে আসে। আমি সহ ছয়জন ফাইল ধরে জোড় বন্ধনে রওয়ানা হই সেকেন্ড গেইটের দিকে। ২০ নং ওয়ার্ডের লোহাড় শিকগুলো ধরে চেয়ে থাকে পীর ছাহেব, শাহাদত ও জলিল সাহেব অশ্রু ভরা নয়নে। ওদের বিশ্বাস, আজ আর আমি ফিরে আসছি না। ওদের অশ্রুর আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে উঠে আমার বন্দী জীবনের কত ইতিহাস, কত শোক-গাঁথা। টা-টা জানানোর মত হাত নেড়ে বিদায় নেই আমি ওদের কাছ থেকে।

রমেশদা আমাদের সবাইকে হাজির করল কোর্ট দারোগা গৌরাঙ্গ বাবুর কাছে। গৌরাংগ বাবু কাগজে কি একটা লিখে রমেশদার হাতে দিয়ে বল্লেন ঃ

—রমেশ, যাও ওদেরকে আজ হাজির কর।

—কার কোর্টে স্যার?

—ডি.আর. চক্রবর্তীর। পেশকার বাবুকে বলবে যে পাকিস্তানী মাস্টারটার কেইছ কাবুলীওয়ালাদের কেইছ থেকে আলাদা করে নূতন করে সাজিয়ে নিতে।

আজ্ঞে স্যার।

শবনম, আর স্বপ্ন.হয়োনা

একগাছি মোটা দড়ি দিয়ে কোমর বেঁধে, হাত কড়া লাগিয়ে আমাদেরকে নিয়ে চলল রমেশদা ডি.আর. চক্রবর্তীর কোর্টের দিকে। হাটতে হাটতে রমেশদা বলতে লাগল ঃ

—মাস্টার তোর কপালটা ভাল। এতদিন তোর কেইছটা কাবুলীওয়ালাদের সাথে জড়িত ছিল। দারোগা বাবু তোকে কাবুলীওয়ালাদের সাথেই এক কেইছে কোর্টে তোলার ইচ্ছা রেখেছিল। আশু বাবু বহু টাকা পয়সা খরচ করে এখন তোর কেইছটা পাকিস্তানী হিসেবে আলাদা করিয়েছে।

—কাবুলীওয়ালাদের সাথে থাকলে আমার কি অসুবিধা হত রমেশদা?

রমেশদা হেসে ফেলে। পানের পিচকীতে রাংগা জীর্ণ দাঁতগুলো তার উঁকি মেরে উঠে মুখ-গহ্বর থেকে।

—আরে বোকা, তুই ব্যাপারটি বুঝলি না? কাবুলীওয়ালাদের সাথে কেইছটা থাকলে ত তুই কাবুলীওয়ালার সাথে কাবুলে চলে যেতি। আর বাংলাদেশের মুখ দেখতি না তখন, ওদের সাথেই তোর কপাল ঘুরত।

রমেশদার কথায় এডভ্যাঞ্চার অনুভব করলাম। কেইছটা ওদের সাথে থাকলে মন্দ হত না। কাবুল সরকারের খরচে আফগানিস্তান ঘুরে আসা যেত। দেশে না ফিরলেই বা কি হত আমার? ওখানেই বসবাস করতাম, জীবনটা কাটিয়ে দিতাম ন্যাচারালাইজড সিটিজেন হয়ে। এজন্যে প্রয়োজন হলে আফগান মহিলার পাণি গ্রহণেও অপ্রস্তুত হতাম না।

আফগানিস্তান খুব সুন্দর দেশ। খুরমা-আখরোট আর ন্যাসপাতি আংগুর খেয়ে দেহমনটা নাদুস নুদুস করা যেত জেলার বাবু মদুসুদন চক্রবর্তীর মত। ফলের রসে সোনা-রং ফুটত বদন জুড়ে!

www.pathagar.com

আফগানিস্তান সৈয়দ মুজতবা আলীর "শবনমের" দেশ। শবনম কত মিষ্টি নাম! কত মিষ্টি মেয়ে সে! বাংগালী প্রবাসীকেও গভীরভাবে ভালবাসে। এ ভালবাসায় খাদ নেই। এতটুকুন-ও। শবনমের মত একটি অপ্সরীর ভালবাসা পেলে অনায়াসে ভুলে যেতে পারবো নিজের স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের বিরহ ব্যথা, ওদেরকে চিরজনমের মত ডুবিয়ে দেব বিস্মৃতির অতল সাগরজলে।

সৈয়দ মুস্তবা আলীর "শবনম" এক হারানো স্মৃতি জাগ্রত করিয়ে দেয়। আমার যৌবন কালের একটুকুরো প্রণয় কাহিনীর। তখন বিয়ে করেনি। যুব বয়সের রংগীন স্বপ্নে ঘরে বেঁধেছিলাম কল্পনার রাজ্যে একটি কচি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে। সৈয়দ মুজতবা আলীর শবনম আর আমার আকাঙ্খিত মেয়েটির যেন হুবহু মিল ছিল। শবনম হাসলে তার গালে টোল পড়ত, ঐ মেয়েটিরও তাই হতো। সাড়ে তিন টাকা দিয়ে "শবনম" বইটি কিনে তাকে উপহার দিয়েছিলাম চুপি চুপি। এই প্রেমের বিরহ ছিল হৃদয়-পোড়া লায়লী-মজনুর মত এডভ্যাঞ্চারাস। অথবা 'রোমিও-জোলিও' সদৃশ।

দৈহিক ভোগ লালসার সত্বা ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়, অকল্পনীয়।

ছি, ছি, ছি, এসব কি কল্পনা আমার মাথায় আসছে, ফনা মেলছে? আমি ত বিবাহিত। আমার স্ত্রী আছে, সে ত অন্যজন, পরস্ত্রী। ওসব পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করা অনুচিত, অন্যায়। এ অন্যায় উভয় দিক দিয়েই; নিজের স্ত্রীর উপরও, আর ঐ মেয়েটির প্রতিও। ঐ মেয়েটি এখন পর, আমার নয়। আমি এখন স্বামী, পিতা, ছ'সন্তানের জনক। প্রেম করার তারুণ্য ও নেশা আর চলেনা! না, না, আমাকে মুক্তি পেতে হবে আমার সন্তান-সন্ততিদের মুখ দেখার জন্যে, ওদের জন্য সৃষ্ট এতিম-মুখে স্বর্গীয় হাসি ফোটাতে হবে পুনর্মিলনের পরশে। আফগানিস্তান তুমি গোল্লায় যাও। আমার মথাটা আর খেয়োনো। শবনম তুমি আর স্বপ্ন হয়োনা। লক্ষীটি বিদায়! বিদায়! বাস্তবজগতে ফিরে এলাম বহুকষ্টে; কল্পনার সূক্ষ্ম তার ছেদন করে।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
এজলাস

ডি.আর. চক্রবর্তীর কোর্ট। দরজার উপরের চৌকাঠে ফলক লাগানো রয়েছে ঃ

Mr. D.R. Chakrabarty,
1st Class Magistrate,
Deputy Collector, Agartala, Tippera.

রমেশদা আমাকে ও আমার সাথীদেরকে দড়ি ও হাতকড়া বন্ধন মুক্ত করে প্রবেশ করিয়ে দেয় কাঠগড়ার খুপড়ীতে।

লোকে লোকারণ্য চক্রবর্তী বাবুর কোর্ট। দরজা জানালায় শুধু মাথা আর মাথায় ঠাসাঠাসি, ঠেলাঠেলি। ওদের সবার দৃষ্টি আমার প্রতি। ওরা রায়ের দৃশ্য দেখতে এসেছে। ওদের কথার গুঞ্জরণ ভরাট করে রেখেছে গোটা কক্ষটি।

—ঐ যে, ঐ যে, দাড়িওয়ালা গেঞ্জী গায়ের লোকিট পাকিস্তানী। পাঞ্জাবীর চর, সেদিন বটতলীতে যে মার খেয়েছিল! শ্যালা বেঁচে রয়েছে এখনও। এই শ্যালার বোধ হয় ফাঁসী হবে রে? শ্যালা মুসলিম লীগার।

কে একজন বলছিল কথাগুলো পেছনের ভীড় থেকে। দাড়ি থাকলেই ওরা মনে করে মুসলিম লীগের লোক। রবীন্দ্রনাথেরও ত দাড়ি ছিল, মাইকেল মধূসুদন দত্তেরও। ওরা জাতে হিন্দু, জাতীয়তায় হিন্দুস্থানী। আবার বাংগালীও। তাই ওরা দাড়ি থাকা সত্ত্বেও মুসিলম লীগার নয়। মনে মনে হাসলাম।

মানুষ মানুষকে ডিফাইন করে চুল-দাড়ি দিয়ে। মানুষ মানুষকে 'জাজ্' করে ভাষা আর বর্ণ বিচারে। মানুষের মাপকাঠি আজ কর্ম ও চরিত্র নয়, বরং ভৌগোলিক পরিবেশ আর জিঘাংসার মনোবৃত্তি। দৈহিকভাবে আমি কোর্টের কাঠগড়ায় হাজির। কিন্তু মন ছুটাছুটি করছে।

বিচিত্র এদেশ। মনে পড়ল তিনটি বিচিত্র সৃষ্টির ঃ

Mind, wind and woman, এ তিনটির আকার নেই। তাই গোটা বিশ্বে এত রং-তামাশা! এত বৈচিত্র!

বিচারকের মেজাজ আশুবাবুর জবানীতে

—মাস্টার বাবু শুনেন। ম্যাজিস্ট্রেট এক্ষুণি এজলাসে বসবেন। আমি যা যা বলব আপনি ঠিক সেভাবেই উত্তর দেবেন। দেখবেন, যাতে কোন ভুল না হয়। চক্রবর্তী বাবু বড় একরোখা। কলম চালানোর সময় মনটা ভাল থাকলে সংগে সংগেই হয় বেইল না হয় খালাস করে দেন আসামীকে। আর যদি মনটা ভাল না থাকে, রক্ষে নেই, লম্বা তারিখ দেবেন আবার শুনানীর! অথবা ধরাস করে ২/৫/৭ বছরের জেল।

www.pathagar.com

আশুবাবু হঠাৎ হাজির হয়ে আমাকে একথাগুলো শুনিয়ে গেলেন। অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠে। এক সাহারা পিপাসা অনুভব করলাম বক্ষপ্রদেশে।

—মাস্টার বাবু, এই যে ইনি হচ্ছেন জগদীশ বাবু। আপনার কেইছের উকিল। খুব ভাল মানুষ। দীর্ঘ তিন মাস খেটেখুটে আমি আর জগদীশ বাবু আপনার মামলার ধারা পাসপোর্ট কেইছে রূপান্তরিত করেছি। আপনার উপর ৫টা মামলা-চরবৃত্তি, ওয়ারলেছ ব্যবহার, পাঞ্জাবী সৈন্যদের সাহায্যকারী, হিন্দুনিধনকারী আর হিন্দুস্তানের সার্বভৌমত্বের অস্তিত্ব বিনষ্টকারী দায়ের করা হয়েছে। আপনাদেরই গ্রামের কে এক ইছহাক, নাজির হোসেন মিয়া। এরাই এসব মামলা আপনার বিরুদ্ধে দায়ের করেছে। দেশের মানুষ বুঝি দেশের মানুষের প্রতি এত হীন শত্রুতাও করে? ছি, ছি! যাক আপনি কোন ডর-ভয় করবেন না। ঐ দেখুন কোর্ট ইন্সপেক্টর বাবু-ও বসে আছেন আপনার পক্ষে সুপারিশ করার জন্যে। বাকী ভগবানের ইচ্ছে!

কাঠগড়া থেকে জগদীশ বাবুকে আদাব জানালাম। বুড়ো বয়সের উকিল। ধুতি আর স্ট্যান্ড কালারের ফুলহাতা কালো কোট গায়ে তাঁর। বড়ই ঢিলে ঢালা চলনে-কথনে। আশু বাবু যেরূপ নিরামিষ মুহুরী, ঠিক তেমনি ধরনের তাঁর উকির বাবুটিও। জগদীশ বাবুর উকালতিতে নির্ভরশীলতার বিশেষ কোন আস্থা পাচ্ছিলাম না মনে।

—মাস্টার বাবু, ম্যাজিস্ট্রেট এখনই এসে পড়বেন। তবে শুনুন আপনাকে আমি যা ডিক্‌টেট করব তাই আপনি হুবহু বলে যাবেন। দেখেন আবার সাধু পুরুষের মত মহত হওয়ার জন্যে কোন বিভ্রাটই না লাগিয়ে বসেন। জীবনে কোনদিন সাক্ষী দিয়েছেন?

—জ্বী না।

—তা হলে সাবধান, এটা কোর্ট, কথার নড়-চড়ে ভাগ্যের নড়চড় সংগে সংগে হয়ে যাবে কিন্তু। হয়ত এতে সারা জনম জেলেই পঁচতে হবে। আমি যেভাবে বলি ঠিক সেভাবেই সব কথা বলতে পারলে আজই হয়ত মুক্তি পেয়ে যেতে পারেন।

এ পর্যন্ত মনটা প্রকৃতস্থই ছিল। নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক বল বেশ অনুভব করছিলাম। কিন্তু আশু বাবু এবং জগদীশ বাবুর হিতোপদেশ আর সতর্কতা নিমেষেই বালির বাঁধের মত ভেংগে দিল আমার কষ্টার্জিত মনের বাধঁন। চিন্তার সুসংহত খেই হারিয়ে ফেলি আবারো।

আচমকা গুঞ্জরন বন্ধ হয়ে গেল। মহাশূন্যের নীরবতা গিলে ফেলছিল সমস্ত কক্ষটা। ডি.আর. চক্রবর্তী এজলাসে উঠেছেন। নিজের আসনে উপবিষ্ট হলেন তিনি। হাতের ইশারায় বিজলী পাখাটা চালু করার নির্দেশ জানালেন। সংগে সংগে মন্থর গতিতে সাঁই-সাঁই আওয়াজ তুলে তিন ডানার পাখাটা ঘুরতে লাগল—নিরেট নীরবতা চৌচির করে।

পেশকার বাবু বিরাট একটা ফাইল চক্রবর্তী বাবুর সামনে পেশ করলেন। ফিস্‌ফিসিয়ে কি যেন বললেন পেশকার বাবু চক্রবর্তী বাবুকে। তারপর ফিরে এসে নিজের আসন গ্রহণ করলেন।

ফাইলের কাগজ একটু আধটু পড়ে পড়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলেন চক্রবর্তী বাবু। উল্টানোর ফর্ ফর্ আওয়াজ ভেসে বেড়াচ্ছিল ঘরজুড়ে। বুক দুরু দুরু। ঘুঘু ছানার মত ঝিরঝির কাঁপছিল আমার দেহ-তনু। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠতে লাগল

www.pathagar.com

কপোল আর নাসিকাগ্রে। কি জানি কি লেখা হয়েছে এসব কাগজে। এসব লেখাই ত আমার ভাগ্যের মানচিত্র! হাতের মুষ্টি শক্ত করে কাঠগড়ার উপরের সীমান্ত কাঠটিকে চেপে ধরে রাখি। জানিনা কি রায় দিয়ে বসেন একরোখা চক্রবর্ত্তী বাবু—ফাঁসি, না জেল? যা-ই দিক না কেন, অচেতন হলে চলবে না।

আল্লাহ্ জানেন কি রায় দেন

কাঠগড়া, তুমি মানব ভাগ্যের ইতিহাস লিপিকার। তুমি তদীয় জীবনের মুক্তি পয়গাম, তুমি আজরাইলের ম্যাসেঞ্জার। তুমি হাসি কান্নার কল্লোল, ন্যায়-অন্যায়ের প্রতিফলক। তোমার মাটি পাপী-তাপী, সাধু-মহাপুরুষের পদধূলিকণার সংরক্ষণাগার। "বারাব্বাসের" মত পাপিষ্ঠ মুক্তি পেয়েছে তোমার ক্রোড় হতে, "যীশুর" মত মহাপুরুষ পেয়েছে ক্রুসবিদ্ধের মৃত্যু যন্ত্রণা। আর আমি কি ছাই!

কল্পনায় হারিয়ে যাই ইতিহাসের অতীত রাজ্যে।

—আপনার নাম কি আলমগীর?

ডি. আর. চক্রবর্তী ভাবগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে চমক ভাংগেন কোর্টের বাকরুদ্ধ নীরবতার।

আশু বাবু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দাঁড়ান আমার কাছে। ফিসফিসিয়ে বলেন ঃ

—মাস্টার বাবু করজোড়ে দাঁড়ান। আর জবাব দেন।

—জ্বী স্যার, আমার নাম।

—ধ্যাম?

—আখাউড়া, দেবগ্রাম, কুমিল্লা জেলায়।

—পেশা?

—মাস্টারী

জগদীশ বাবুও মুখ খোলেন। নাকের ডগায় আটকানো চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বলেন ঃ

—মহামান্য বিচারক, বেচারা খুব গরীব, নিরীহ মাস্টার। ওর বাবা অসুখে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। সে-ই সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি, তাই দয়া করে...

—বুঝেছি।

জগদীশ বাবু আমার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন ঃ

—আপনি কি কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে আগরতলায় এসেছেন?

আশু বাবু তৎক্ষণাৎ বলে দেন আমাকে এর জবাবটা ঃ

—স্যার, পাঞ্জাবী সৈন্যদের অত্যাচারের ভয়ে পালিয়ে আসি হিন্দুস্তানে। বুড়ো ও অসুস্থ বাবাকে রেখে আসি মা ও আমার স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদের তত্ত্বাবধানে।

—হুঁ।

ডি. আর. চক্রবর্তী বাবু নিজের কলম দিয়ে লিখতে লাগলেন। তার কলমের খস্ খস্ আওয়াজ আমার কর্ণকুহরে ঋজু গতিতে প্রবেশ করছে। হৃদয় রাজ্যে জোয়াড় সৃষ্টি হচ্ছে নানা কল্পনার। কি জানি কি লিখছেন তিনি?

www.pathagar.com

দৃঢ় চিত্তে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম চক্রবর্তী বাবুকে। চক্রবর্তী বাবু টেবিল থেকে স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসটি নিয়ে এক ঢোকে পানি খেলেন। পানি নয় 'জল' খেলেন তিনি। মনে হল খুব পিপাসার্ত হয়ে পড়েছেন। আমার কাগজপত্র পড়ে মাথা তাঁর ঘুলিয়ে গেছে। কি রায় দেবেন এ চিন্তায় কলমের মুখ এবং চক্রবর্তী বাবুর মুখ একাকার।

সুন্দর সুগোল চেহারা তার। সোনালি ফ্রেম আঁটা চশমার আয়নায় মাঝে মাঝে তাঁর চোখ দুটো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। একটু লিখছেন, একটু থামছেন। মাথা উঁচু করে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। ডি. আর. চক্রবর্তী বাবুর এক চোখ সামান্য একটু ট্যারা। তাঁর দৃষ্টি কি প্রকৃত পক্ষে আমার প্রতি না সাথীদের প্রতি কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

—আপনি গত ৪ঠা এপ্রিল বিনা পাসপোর্টে ভারত সীমান্ত প্রবেশ করে অপরাধ করেছেন। আপনি কি আপনার অপরাধ স্বীকার করেন?

আবার আশু বাবুর শিখানো বুলি আবৃত্তি করে বলি ঃ

—জ্বী স্যার, আমি দোষী, আমি অপরাধ করেছি বিনা পাসপোর্টে ভারত সীমান্তে ঢুকে। প্রাণ বাঁচানোর দায়েই স্যার এরকম করেছিলাম। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

চক্রবর্তী বাবু আবার কি যেন লিখতে লাগলেন। দেয়ালের ঘড়িটার টিক টিক আওয়াজ এতক্ষণে আমার চেতনায় ধরা পড়ল। আবিষ্কার করলাম চক্রবর্তী বাবুর সম্মুখ বরাবর বাম পাশে পেণ্ডুলামের দেয়াল ঘড়িটি।

আবুল কালাম আজাদের 'জবান বন্দী পড়েছিলাম।' 'আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী' আমার মনে খোদাই করে দেয় কাঠগড়ার কত কথা।, এঁকে দেয় কত স্মৃতি। এই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কত লোক মৃত্যুর পরোয়ানা বয়ে নিয়েছে, কত নির্দোষ লোক লাভ করেছে যাবজ্জীবন জেল, কেহ বা ফাঁসির রায় শুনে পাগল হয়ে গেছে। অথবা চেতনা হারিয়ে হাসপাতালে নীত হয়েছে। ভয়ে আমার মুষড়িয়ে পড়ার অবস্থা। এসব চিন্তা করে কি লাভ?

আত্তাকদীরু লা ইয়ারুদ্দু ঃ বিধির বিধান অখণ্ডনীয়। নিজেকে পুনরায় সংযত করি। কল্পনার লাগামে টেনে মনের ঘোড়াকে বশে আনি। হিসাব কষি মনে মনে কোন্ কোন্ সুরা তেলাওয়াত করলে আল্লাহর রহমত হতে পারে আমার উপর। সুরা এখলাছ ও সুরা নাছ পড়তে থাকি। কারণ এসব সুরার বরকতে হৃদয় মন শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্ত থাকে। শুধু কি তাই? বরং এর বরকতে ডি. আর. চক্রবর্তীর মনও বোধ হয় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

কতকাল ধরে এ ঘড়িটি অবিরাম চলছে, পলে পলে মানব জীবনের মুহূর্তগুলো খসিয়ে নিচ্ছে আয়ুর রাজ্য থেকে!

Time is God. It shapes human destiny and wears out the longivity of life.

টিক্ টিক্ টিক্। তিনটা বেজে পাঁচ মিনিট।

—যেহেতু আপনি বিনা পাসপোর্টে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে অপরাধ স্বীকার করেছেন, সেইহেতু ভারতের পাসপোর্ট আইনের ধারা অনুযায়ী আপনাকে বিনাশ্রম দুদিন কারাদণ্ড অথবা পনর টাকা জরিমানা আদায়ে মুক্তি দানের রায় ঘোষণা করা হল।

www.pathagar.com

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট থেকে বিকেল ৩টা ৫মিনিট পর্যন্ত নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর ডি.আর. চক্রবর্তী রায় ঘোষণা করলেন। আমার পাঁচ মাস একুশ দিনের বন্দী জীবনের নিষ্পত্তি ঘটালেন তিনি দুদিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ১৫ টাকা জরিমানা আদায়ের মুক্তির সন্দেশ দানে।

আশু বাবু সংগে সংগে বুক পকেট থেকে ১৫ টাকা বের করে পেশকারের হাতে দিলেন। পেশকার বাবু আশু বাবুকে দিয়ে সাদা কাগজে আমার দস্তখত নিয়ে জমা রাখলেন।

আশু বাবু, জিজ্ঞেস করলেন। মাস্টার বাবুকে কি এখন কাঠগড়া থেকে বের করে আনতে পারি!

—হ্যাঁ। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এখন থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষ। এই বেয়াড়া, একটা চেয়ার দাও এখানে।

সংগে সংগে বেয়াড়া একটা চেয়ার পেতে দিল কোর্টের মেঝেতে। কোর্ট ইন্সপেক্টর বাবুর আসনটির সন্নিকটে। রমেশদা হাসি মুখে কাঠগড়ার গেইটটি খুলে দিলেন। আমি বেরিয়ে আসলাম, দেখলাম এ মুহূর্তের রমেশদা মাটির মানুষ, কত ভাল, কত আপন। দড়ি দিয়ে বেঁধে আনা রমেশদার চেহারা আর এ মুহূর্তের রমেশদার মধ্যে অমাবস্যা আর পূর্ণিমার তফাৎ!

আমার সাথীদের আজ আর শুনানী হল না। চক্রবর্তী বাবু এজলাস ছেড়ে চলে গেছেন। সাথীরা আমাকে হারিয়ে একাকী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। পুনরায় সেন্ট্রাল জেলে যাবার অনুমতির প্রতীক্ষায়। ওদের চোখে অশ্রু, চেহারায় বেদনার ছায়া, কণ্ঠ নির্বাক।

ওরা আজ ওদের সাথীকে হারালো। তিন ঘণ্টা আগে যে সাথী ওদের সাথে ছিল, তিন সেকেন্ডের মধ্যে সে আজ অন্যজগতে প্রস্থান করেছে। মুক্ত জগতে হারিয়ে যাচ্ছে সে। মাত্র দুহাত ব্যবধান ঃ রমেশদা আর কাঠগড়ার বেড়ী। অথচ এ দু'হাতই লক্ষ মাইল দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে আমার আর সাথীদের মধ্যে। কি আশ্চর্য, কি মহিমা এই আইন রাজ্যের! একটু মারপ্যাঁচে কি না হতে পারে। একটু আগেছিলাম কাঠগড়ায় জঘন্য আসামী, আর এক্ষুণি চেয়ারে বসে সম্মানিত মানুষ। দীর্ঘ পাঁচ মাস একুশদিন পর এত সম্মানিত হয়ে গেলাম পলকের মধ্যে। ভাবতে ভাবতে চোখে পানি এল। প্লাবিত হয়ে গেল সমস্ত কোর্ট কক্ষটি, যেন অশ্রু বন্যায় ডুবে গেছে সবাই, আশু বাবু জগদীশ বাবু, কোর্ট দরোগা, সাথীবর্গ ও রমেশদা। নিজেকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ উষ্ণ করস্পর্শে বাস্তবে ফিরে এলাম। কোর্ট ইন্সপেক্টর আমার কাঁধে হাত রেখে বলছেন ঃ কেঁদনা মাস্টার, যাও, দেশে ফিরে যাও। নিজের আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখে হৃদয় জুড়াও গিয়ে।

আশু বাবুর গৃহ-চিত্র

আশুবাবু আমায় কোর্টের বাহিরে নিয়ে এলেন। এক চায়ের দোকানে বসে দু'জনেই চা খেলাম। এমন সময় একটি লোক এল।

—দাদা, কই তোমার সে আসামীর জামিন বা খালাস কিছু হলো কি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইত তিনি। আমাকে দেখিয়ে দিলেন আশু বাবু।

—নমস্কার। প্রতি জবাবে আদাবের মত হাত তোললাম। জিজ্ঞেস করলাম ঃ

www.pathagar.com

—আশুদা, ইনি?

—ইনি আমার ছোট ভাই। আপনাকে এখন আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। সন্ধ্যায় কোর্ট থেকে ফিরে এসে আপনার দেশে যাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করব। আপনি এখন নিশুর সাথে চলে যান। 'নিশু শুন্, মাস্টার বাবু কোন সকালে খেয়েছে। তাই শীঘ্র করে দুটো ডাল ভাত রান্না করে খাওয়ায়ে দিস। আমি ঘণ্টা দুয়েক পরেই বাড়ী ফিরব, মাকে বলিস'।

জেল থেকে কোর্টএ আসার পথে লুংগীর নীচে জেলখানার হাফ প্যান্টটা পরিধানে ছিল। জলিল সাহেবের তোয়ালেটাও ছিল এর সাথে। এ দুটো জেল জীবনের স্মৃতি হিসেবে রাখার জন্যেই কাউকে দান করে আসিনি। তাছাড়া পথে চলার সময়ও কাজে লাগতে পারে এর ব্যবহার। আমার অনুমান ঠিকই প্রমাণিত হল।

আশু বাবু নিশুর সাথে আমাকে একটি রিক্সায় বসিয়ে দিলেন।

—মাস্টার বাবু, আপনি তোয়ালে দিয়ে শীঘ্রই দাড়িগুলো ঢেকে ফেলুন। নইলে পথে কোন বিপদ ঘটতে পারে। কারণ সমস্ত আখাউড়ার লোক পঁই পঁই করে আগরতলায় ঘুরে দিন কাটাচ্ছে। কখন কার চোখে পরে আবার কোন শনি লাগিয়ে বসে ওরা।

সুবোধ ছেলের মত যৎতৎক্ষণাত তোয়ালে দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলি। রিক্সা ছেড়ে দেয়। মুক্ত পৃথিবীর আলো বাতাসে অবগাহন করতে থাকে আমার অর্ধবছর হাজত খাটা দেহটা। আল্লাহ কত মেহেরবান! তার অফুরন্ত আলো বাতাস, ফুল-ফল, খাদ্য পানির অনন্ত সাগরে মানুষ কি সুখেই না দিন কাটাচ্ছে! এখানে সুরেশদা নেই, এখানে মহেন্দ্রদা নেই এসব সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে! নেই এখানে ক্যান্টিনের পৈশাচিক শাসন, মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার ন্যায্য স্বাধীনতা খর্ব করার কোন পুলিশী নির্যাতন। মানুষের চলার পথ অবরোধ করার প্রাচীরও নেই। নেই কোন লৌহ কপাটও! একেই ত বলে খোদার রাজ্য!

বট গাছের গোড়ায় থেমেছে রিক্সাটা। নিশু আমাকে নিয়ে উঁচু রাস্তার ঢালু বেয়ে নীচে নামে।

—দিদি, দিদি, দাদা বাবুর ঐ মাস্টার এই যে এসেছেন। দেখে যাও তোমরা। শীঘ্র করে এক ঘটি জল দাও, আর মাস্টার বাবুর খাওয়ার ব্যবস্থা কর।

ছোট-বড়, ছেলেমেয়ে-বুড়োবুড়ি নানা বয়সের অনেকেই বাঁধ ভাংগা জোয়ারের মত ছুটে এলো আমাকে এক পলক দেখার জন্যে।

—বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো, ভগবান তোমার দীর্ঘায়ু দান করুন। আমার ছেলেটি তিন তিনটে মাস নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে প্রায়, তোমার জন্যে। শুধু বলে ঃ মা, যে পর্যন্ত মাস্টার বাবুকে না ছুটাতে পারবো সে পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

—দিনের পর দিন গুণছি আর ভগবানকে ডাকছিঃ ভগবান আমার ছেলের চেষ্টায় তুমি সাফল্য দান করো। কোন এক মাস্টার, কোন্ বাপের আদুরে ছেলেটি আজ জেলে ভুগছে! ভগবান, তাকে দেখার সৌভাগ্য আমকে দান কর। ভগবান আমার ডাক শুনেছেন। এস বাবা, এস, ঘরে বোস।

মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেন তিনি। আশু বাবুর স্ত্রী, বোন, ছেলে-মেয়ে ও পাশের বাড়ীর সবাই তীব্র সাগ্রহে আমাকে নীরিক্ষণ করতে লাগল। তাহলে

www.pathagar.com

ঔৎসুক্য ও আনন্দে মনে হল আমি যেন নূতন "বর" এসেছি আশু বাবুর গৃহে! সবাই আত্মহারা আমাকে পেয়ে। আমি এদের সাত রাজার মানিক রতন!

আশু বাবুর মা কাঁসার থালায় ডাল ভাত আর নিরামিষ এনে দেন।

—দাদু, আমি এখন ভাত খাব না। খুশীতেই আমার দেহ মন ভরে গেছে। তাছাড়া আপনারা যে আদর করেছেন ও যে কষ্ট আমার জন্যে স্বীকার করেছেন তা ত আমি কোন দিন ভুলতে পারব না, কোনদিন এর প্রতিদানও দিতে পারব না। আপনারা আমাকে চিরজনমের মত ঋণী করে দিলেন।

আমার উদ্বেলিত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আশু বাবুর মায়ের চোখে পানি আসে। শাড়ীর আঁচল দিয়ে তা মুছে ফেলেন তিনি।

বহু পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও আমি ভাত খেতে পারলাম না। আশু বাবুর ঘরটিতে আমার ভাত খাওয়ার রুচি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে যায়। ঘরে দূর্গাদেবীর চক্‌চকে বিরাট প্রতিমা। এর সামনে পূজোর প্রসাদ স্তূপীকৃত হয়ে আছে। কাঁসার একটি কলসী রয়েছে সামনে। এর মুখটা রংবেরং-এর ফুল দিয়ে ঠাঁসা। দুর্গার তেলতেলে চাকচিক্য আর প্রসাদের রসাল গন্ধে সমস্ত ঘরটি বেশ ভারী বোধ হল। কিছুই না খেলে আশু বাবুর মা মনে হয়ত কষ্ট পাবেন। সৌজন্যের খাতিরে তাই এক কাপ চা পানের ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। সংগে সংগে চা-এর ব্যবস্থা করা হল। 'টা' হিসেবে চিনি সহযোগে ভাজা চিড়াও দেয়া হল। এসবই খেলাম রুচি ও তৃপ্তি সহকারে। আশু বাবু সন্ধ্যায় ফিরলেন,—মাস্টার বাবু, আপনি আর এক মিনিটও দেরী করবেন না। এক্ষুণি দেশের দিকে রওয়ানা হয়ে যান।

—কারণ কি আশু দা, আমি ত চেয়েছিলাম আজ রাতটা কাটিয়ে কাল ভোরে রওয়ানা হব। জেলখানায় শুয়ে-বসে হাত পা'র জোড়াগুলো বড় অক্ষম হয়ে পড়েছে যে! রাতের বেলা, তা-ও আবার 'কারফিউ" হিন্দুস্তান-পাকিস্তান বর্ডারে, কেমন করে বর্ডার ক্রস করব?

—ওসব বুঝি না মাস্টার বাবু। আপনাকে আজই, এক্ষুণি রওয়ানা হতে হবে। নইলে যেকোন সময়ে আপনি "সিকিউরিটি এক্ট" এ বন্দী হতে পারেন। আপনার দেশের অনেক "বিভীষণ" আপনার মুক্তির খবর পেয়ে উত্তেজিত হয়ে গেছে। কপালে মওত থাকলে মরবেন, তবু আমার গৃহ থেকে আবার আপনাকে এরেস্ট করবে,—এটা আমার সহ্য হবে না। আশু বাবু গোঁড়া, হিন্দু তাঁর "বিভীষণ" উচ্চারণে তা আরোও প্রতিভাত হল।

তাঁর অস্থিরতা ও শংকা প্রকাশে পরিস্থিতির গুরুত্বটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করলাম। মনে মনে স্থির করলাম, যা থাকে বরাতে আজ রাতেই যাব দেশের দিকে। আগরতলার জেলখানায় বন্দীসিপাহী খালেকের মত করুণ মৃত্যুবরণ করার চেয়ে আল্লাহর বিশাল জমিনে গুলি খেয়ে মরলে আত্মার যথেষ্ট শান্তি হবে। মুক্ত পৃথিবীতে আজাদী মৃত্যু এর চেয়ে ঢের ঢের উত্তম। এছাড়া পাকিস্তান বর্ডারের ভিতরে গিয়ে মরলে ত আর কোন কথাই নেই। মুসলমান হিসাবে আমার লাশ সনাক্ত করতে পারলে হয়ত জানাজাটাও পাওয়া যেতে পারে। সাহস ও দৃঢ়তা অনুভব করলাম দেহ-মনে।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে শামসু নামে একটি ছেলে আসল। তার হাতে সোপর্দ করে আশু বাবু অশ্রুভরা নয়নে আমাকে বিদায় দিলেন। আশু বাবুর মা, স্ত্রী, বোন ও ছেলে মেয়েরা আমায় বিদায় দিলেন "নাইয়্যরের" মত।

চাঁদনী ভরা রাত। ছেঁড়া-ছেঁড়া হাল্কা কালো মেঘের ভেলা কখনও পূর্ণিমার চাঁদটিকে ঢেকে দিচ্ছে, কখনও বা উন্মুক্ত করে দিচ্ছে এর সোনালি চেহারাটাকে। দূর্গা পূজার ঢাকঢোল ছড়িয়ে রয়েছে শূন্য জগতেঃ তাকধুমাদুম, ঢংঢং-ইত্যাদির সুর ব্যঞ্জনা।

প্রশস্ত কাঁচা পথ। দুচারজন করে মানুষ চলাচল করছে। লোকালয়ের পথ পার হয়ে আমি আর শামসু পৌঁছলাম একটি সরু পা-পথে। দুজনই চুপচাপ। চলার পথে নীরবতা পীড়াদায়ক মনে হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম ঃ

—শামসু, একটা ম্যাচ আর এক পেকেট বিড়ি কিনে নাও পাশের দোকান থেকে। শুধু নীরবে চলতে থাকলে মানুষ সন্দেহ করতে পারে।

—ঠিকই বলছেন স্যার। আমার মনে হয় আমরা খালি গায়ে হাটলে আরো ভাল হয়। নইলে আমাদেরকে দূর থেকে দেখা যাবে। খালি গায়ে আমাদের দেখলেও গ্রামের কৃষক-চাষা মনে হবে। শামসুর এই প্রস্তাবটি বেশ মনে ধরল। রাজী হয়ে যাই। গায়ের গেঞ্জিটা খুলে ফেলি। লুংগীটা পাল্টিয়ে জেলখানার হাফপ্যান্ট পরিধান করে চলার গতি বাড়ানোর জন্য লুংগিটা কাছা দেই। এবার দুজনকে খেত-খামারের বনেদী মজুর বলেই মনে হয়।

শামসুর আব্বার হৃদয়-চিত্র

—শামসু, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

—স্যার, এখন আমার আব্বার সাথে দেখা করব। তিনি ঐ সামনের দুটো ক্ষেতের পরে একটা ত্রাণ শিবিরে থাকেন। আব্বা আমাকে বার বার বলেছেন আপনাকে যেন তার সাথে দেখা করিয়ে নেই।

ধানজমির আলপথে বেশ খানিকটা চলার পর পৌঁছলাম শিবিরে। মিট্‌মিট্ হারিকেনের আলোর অস্পষ্ট রাজ্যে ভাসছে কতকগুলো আদম সন্তান। অস্থি চর্মসার সবারই। ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদছে একটি শিশু।

—আব্বা, এই ত স্যারকে এনেছি।

শামসুর আব্বা হারিকেনটা নিয়ে কাছে এলেন, আমার চেহারা সানন্দভরে দেখতে লাগলেন। বয়স ৭০ এর উপর হবে। চোখের জ্যোতি দুর্বল। স্বাস্থ্য ভেংগে পড়েছে খুউব।

—স্যার, আপনার চিন্তায় অধীর ছিলাম। কত দোয়া যে করেছি আল্লাহর কাছে আপনার জন্যে। আমার ছেলেকে আমি বলেছি, "বাবা তোমার জানের বদলে হলেও স্যারকে মুক্ত করে আনবে। স্যারকে আনার জন্যে তোমার মউত হলেও আমি খুশী হব। আমি মনে করব আমার ছেলে একজন মোমেন ব্যক্তির উদ্ধারের রাহে শহীদ হয়েছে। আল্লাহ আমার দোয়া নিশ্চয়ই কবুল করেছেন।

গদগদ কণ্ঠ। আবেগের স্রোতে তাঁর আনন্দ পরিস্ফুট। আশু বাবুর মা হিন্দু। শামসুর আব্বা মুসলমান। এরা দুজনেরই দরদ ছিল আমার জন্যে অকৃত্রিম সন্তানের মত হৃদয় সম্পর্ক বিযুক্ত।

www.pathagar.com

—স্যার, আমি আপনার অনেক বক্তৃতা শুনেছি। এসব বক্তৃতার বিষয়বস্তু আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সত্যি, আজ যদি আপনার মত শত শত 'স্যার' ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত হত, তবে নিশ্চয়ই দেশের এ 'অবস্থা' হতো না। কি হল মুসলমানের! আমরা ত মুর্খ-মানুষ, তবু আমরা ইসলামের জন্যে কত আফসোস করি। ভয় হয়, আমরা কতদুরে সরে গেছি আল্লাহর আদেশ নির্দেশ থেকে। অথচ শিক্ষিত মুসলমানেরা কি ইসলাম সম্পর্কে আমাদের চেয়েও বেশী মূর্খ ও গাফেল হয়ে গেল? যে শিক্ষা মুসলমানকে ইসলামের শত্রু বানায় সে শিক্ষার পরিণামেই আজ আমাদের এই দশা।

—দেখুন, আপনি আমার আব্বার চেয়েও বেশী বয়স্ক। আপনি আমাকে "তুমি" করে সম্বোধন করলে খুব খুশী হব। এছাড়া আপনি আমাকে যেভাবে প্রশংসা করছেন তা বাস্তবতা অপেক্ষা শ্রদ্ধারই আধিক্যে প্রভাবান্বিত।

আমার কথায় শামসুর আব্বা জিহ্বা কাটেন দাঁতে।

—না, না, এ কেমন কথা বললেন স্যার! আপনি আমার বয়সের ছোট হতে পারেন বটে, কিন্তু জ্ঞান ও ঈমানের পরীক্ষায় আপনি আমার চেয়েও অনেক বড়, অনেক মহান। আপনার জন্যেই আমি আজ ইসলামের অনেক শিক্ষা ও তাৎপর্য উপলব্ধি করেছি। আপনি আমার ওস্তাদ। বসেন স্যার। একথা বলেই শামসুর আব্বা জল চৌকিটা পেতে দেন। তাঁর পরম আন্তরিকতায় আমি বেসামাল বোধ করি। হাতেও সময় নেই বিশ্রামের।

—জ্বী বসবনা। যেতে হবে এখনই, তাই বসে লাভ কি? যদি আল্লাহর রহমত হয় তবে ভবিষ্যতে দেখা হবে। আপনি আমাকে যে সম্মান ও মূল্য দিয়েছেন, আসলে আমি মোটেই তেমন ব্যক্তিত্ব নই।

স্যাঁত স্যাঁতে অপরিসর ঘর। অস্পষ্ট আলো আর শিশুর কান্না মিলে শামসুর আব্বার শিবিরটা যামালয় মনে হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, এ ধরনের ১০/১২ টি শিবিরে অনেক পাকিস্তানী মুসলমান আশ্রয় নিয়ে অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কলেরা, বসন্ত, আমাশয় আর জ্বরের প্রকোপ শিবিরগুলোতে ঘর বেঁধেছে। ডাক্তার ও পথ্যের কোন ব্যবস্থা নেই। শিবিরেগুলো আগরতলা সীমান্তে অবস্থিত বলে পাকিস্তানী মুসলমানদিগকে থাকার অনুমতি দেয়া থাক দূরের কথা, চলাফেরার অনুমতিটুকু পর্যন্ত আমাদের সহজে মিলে না। কারণ, ওরা ত স্পাই ও হতে পারে?

শামসুর আব্বা, আম্মা, ভাই-বোন-সবাই একই শিবিরে আশ্রয় নিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছে।

—আববা আমরা চলি, আরও দেরী করলে পথে আবার বিপদ-আপদ ঘটতে পারে। তাছাড়া কারফিউ'র বিপদ মাথার উপরেত আছেই।

—যাও বাবা, আল্লার উপর ভরসা করে তোমাদেরকে যাত্রা করালাম। শামসু, যদি তুমি কালকে ফিরে আস তবে বুঝব আমার স্যারকে তুমি নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছ। তা নইলে মনে করব আল্লাহ তোমাদের দুজনকেই পছন্দ করে নিয়ে গেছেন শাহাদাতের রাস্তায়। স্যারের সহবতে তোমার মৃত্যু হলে আমার এতে মোটেই দুঃখ-শোক হবে না। অশ্রুস্নাত নয়নে শামসুর আব্বা আমাদেরকে বিদায় দিলেন।

www.pathagar.com

রাতের প্রস্থ বাড়তে লাগল। এর সাথে সাথে স্তব্ধতাও বেড়ে চলল। কারফিউ-এলাকা ছড়িয়ে রয়েছে সম্মুখ প্রান্তে। চাঁদনী রাত গভীর হয়ে উঠেছে। ধান ক্ষেত, জলাক্ষেত, ছোট খাল-বিলে পা ফেলে অতি সন্তর্পণে আমরা পাড়ি দিচ্ছি। স্তব্ধ পৃথিবীর বুকে পা ফেলে চলছি কম্পিত হৃদয়ে। মাঝে মাঝে ব্যাঙ এর ঘ্যাং ঘোং শব্দ রাত্রির নীরবতাকে ব্যাপকভাবে অশান্ত ও অস্থির করার প্রয়াস পাচ্ছে বীভৎষ ভাবে। দূর থেকে ভেসে আসছে দূর্গাপূজার ঢাক-ঢোল আর কাঁসার ঘন্টির বিচিত্র ধ্বনির তরংগ-মালা। বসন সদৃশ কারফিউ পরিধেয় রাত্রির গায়ে রাংগা "জড়োয়া" যেন এই ধ্বনি লহরী। এহেন কাব্যিক চিন্তার প্রভাবে কারফিউর শংকা লঘু রোধ হল মনের জগতে।

আনন্দপুর গ্রামে

ধীর সন্তর্পণ গতিতে চার ঘন্টার মত চলার পর ছ'মাইল অতিক্রম করলাম।

আনন্দপুর গ্রাম। পাকিস্তান বর্ডারের এক মাইল অভ্যন্তরে পৌঁছেছি। খুশীতে আমাদের তনু-মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। নিজের 'ওয়াতনে' পৌঁছেছি। এখন কারফিউ-জনিত গুলির আঘাত ও আওয়াজ অথবা এ দুটোই অমৃত!

আনন্দপুর ভুতুড়ে গ্রাম। ঘর-বাড়ী আছে। কিন্তু মানুষ-প্রাণীর কোন সাড়া নেই।

একটি উঠানে পৌঁছলাম। শামসু মুখ খুলল। ফিস ফিসিয়ে বলল ঃ

—স্যার। এটাই আমাদের বাড়ী। কেহ নেই।

উঠানের চার ভিটিতে চারটি ঘর। দরজা-জানালা সবই খোলা। চাঁদের আলো স্তিমিত হয়ে গেছে। অন্ধকার দলা হয়ে আসন পেতেছে ঘরগুলোতে।

কোন ঘরে যাব স্যার? ভয় করছে যদি কোন সৈন্য বা মুক্তি ঘরে থাকে তবে? শামসুর ভীত কণ্ঠ সংক্রমিত হয় আমার হৃদয়-রাজ্যে। তবে কি শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তার জন্যে ঘরে আশ্রয় নিতে গিয়ে মৃত্যুর আলিংগন...! মেকী দৃঢ়তায় বললাম ঃ

—চল, পশ্চিমের ঘরটিতে গিয়ে ঢুকে পড়ি, তবু ত একটা সান্ত্বনা থাকে যে পশ্চিমের ঘরে; কাবা-মুখী ঘরেই মৃত্যু ঘটেছে। নিয়্যাতে বরকত ও রহমত।

মনে মনে দোয়া দরূদ পরে দুজনেই পশ্চিমের ঘরে প্রবেশ করলাম। কালো অন্ধকার। অতি সন্তর্পণে হাতড়িয়ে দেখি বিছানা পাতা আছে। ত্বরিতে দরজা বন্ধ করে দুজনেই শুয়ে পড়লাম। কোন "রা" নেই, ঘুম নেই,তবু চোখ বন্ধ দুজনেরই।

ঘন্টা আধেক পর কে একজন এলো। মট্‌মট্ করে দরজার খিলি ভেংগে ঢুকল। কোন কথা কয় না। ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকি দুজনেই। একে অপরকে চিমটি কেটে ইশারা দেই সতর্ক থাকার জন্যে। মনে মনে কলেমা পড়ে নেই, প্রস্তুত হইঃ মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শ বরণ করব সচেতনভাবে।

লোকটা হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ স্পর্শ করে প্রথম আমাকে ও পরে শামসুকে।

—কেও, কে এটা! চিৎকার দিয়ে উঠি শামসু ও আমি। লোকটাও চীৎকার দিতে গিয়ে থেমে যায়। বলে উঠেঃ কে, শামসু না-কিরে!

—মামুনিও! শামসু কণ্ঠস্বরে চিনে নেয় তার মামাকে। মামা দিয়াশালাই জ্বেলে দেখে নেয় শামসুকে। নিমেষের মধ্যে মৃত্যুভয় কর্পুরের মত মিলিয়ে যায় হাসির

www.pathagar.com

ফোয়ারায়। দিব্যিজ্ঞান হল আমারঃ মৃত্যুর আগে মানুষ এভাবে শতবার মরে বাঁচে কল্পনার প্রতাপে! Cowards die many times before their death!

শামসুর মামা সন্ধ্যায় এ বাড়ীতে এসেছিল। সন্ধ্যার দিকে দরজা খোলা রেখে মাছ ধরতে গিয়েছিল পাশের বিলে। মাছ ধরে বাড়ীতে ফিরে এসে দেখে পশ্চিমের ঘরের দুয়ার বন্ধ। সে ভয় পেয়ে যায়, কোন দুশমন বা কোন ভুত-প্রেত ঘরে এল কি? ভয়ে সন্তর্পণে দরজা ভেংগে ঢুকে পড়ে ঘরে। সংশয় ও আশংকায় দিয়াশলাইও জ্বালায় না; যদি দুষমন অতর্কিতে আক্রমণ চালায় আলোর সুযোগে? মরণ এলোনা, মালেকাল মউত ছাড়পত্র পায়নি এখনও আল্লার কাছ থেকে। মামাটি ধরা মাছ পাক করলো। দুপুরের ঠাণ্ডা ভাত, কাঁচা পেয়াজ সহযোগে তিনজনই তৃপ্তিতে খেলাম। মাটি, মনুষ আর অদৃষ্টের সমন্বয় প্রত্যক্ষ করলাম।

ভীত ও কৌতুক ভরাট রাত লীন হল নতুন সূর্যের সোনালি রশ্মীতে। পল্লীর প্রকৃতি জেগে উঠল নূতন কর্মোদ্যমে। মৃদুমলয়ে লতা-পাতা বৃক্ষরাজি নেঁচে উঠল, পাখীর কূজন ঘোষণা দিল নতুন পৃথিবী। টাটকা হাওয়ার পরশে জন্ম হল নব জীবন সঞ্চরণের নবোদ্যম।

স্বীয় গ্রাম ঃ দেবগ্রামে

নবোদ্যম ও নবানন্দে আবার যাত্রা শুরু। আনন্দপুর ছেড়ে পৌঁছলাম তারাগন। তখন বেলা ৭টা। জমিতে কৃষকেরা কাজ শুরু করেছে, অন্যরা বাজার-গঞ্জের পথে। কত মানুষ কত কাজ! পরিচিত মানুষদেখে খুশিতে আটখানা। ওরা ভেবেছিল আমি আর বেঁচে নেই। তাই আমায় দর্শন তাদের নিকট একটি অনুপম বিস্ময় বটে। তাদের বিশ্বাস, এদেশে আমার নূতন জন্ম হয়েছে বিধাতার বিশেষ কৃপায়!

তারাগনের শান্তি আমাকে দেখে দৌড়িয়ে খবর দেয় তার বাবাকে। শান্তি সম্পর্কে আমার চাচাত ভাই। শান্তির বাবা ছুটে আসেন, আমাকে প্রাণ ভরে দেখার জন্যে। সোহাগভরে নিয়ে যান নিজ বাড়ীতে। আটা-রুটি আর সরবত পরিবেশনে হৃদয় নিংড়ানো আদর জানান। কত কথা হয় তাঁর সাথে। তাঁর থেকে জানতে পাইঃ চাচী এবং কযেকজন মুরুব্বীকে পাঞ্জাবীরা হত্যা করেছে আখাউড়া "ফল' করার সাথে সাথে। কে মরার কথা ছিল, আর কে মরল—নিজেকে দিয়ে বিচার করি। বিস্ময়াভিভূত হই আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছার প্রকাশ দেখে। "মওত কি ফয়সালা জমিন পর হোতা নেহী, বলকে আছমান ছে হোতা হ্যায়", মাওলানা মওদুদীর কথাটি মনে পড়ে যায়। এতদিন জেলে ছিলাম বাঁচার জন্যে তথা বাঁচানোর জন্যেই বোধ হয় আল্লাহর প্ল্যান এমনটি। অবাক ও বিবশ বোধ করি পাক-আর্মীর কতিপয় সৈনিকের অত্যাচার ও লাম্পট্যের বিভিন্ন কাহিনী শুনে। পাক-আর্মী তাহলে না পাক হতে চলেছে? নৈতিকচরিত্র স্খলিত সামরিক বাহিনী শুধু দেশের শত্রু নয়, ওদের নিজেদের জন্য-ও অভিসম্পাত, তা প্রত্যক্ষ করলাম পাক বাহিনীর পদস্খলনে। মনে "গাওয়া" দিল পাকিস্তান নাপাক হয়ে গেছে। এদেশ আর টিকছেনা।

তারাগন পার হয়ে নিজ গ্রাম 'দেবগাম'-এ পৌঁছি সকাল প্রায় ৯ টায়। পাড়ার সব লোক ভেংগে পড়ল আমার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ শুনে। রাজনৈতিক দিক থেকে শত্রু-

www.pathagar.com

মিত্র নির্বিশেষে সবাই এসেছে। সবাই আজ খুশী। ঈদ নেমে এল আমার বাড়ীতে। মজু ভাই সাহেব আচমকা খবর পেয়ে বড় বাজার থেকে দৌড়ে এলেন বাড়ীতে। আমাকে জড়িয়ে ধরেই কেঁদে ফেললেন ঃ

—তুমি কেমন আছ? শরীরটা ভালত। আর কোন কথা বেরুতে পারল না তার মুখ থেকে। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে আইউব ভাই, বাচ্চু ভাই, মোবারক চাচা, কাজী সিরাজুল করিম, ফখরু ভাই, বড় চাচা-চাচী, ফুফু-সবারই সেদিন অশ্রুসিক্ত আনন হারিয়ে যাওয়া আমাকে ফিরে পাওয়ার তীক্ষ্ণ মধুর বেদনায়।

স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ওদেরকে সংবাদ দেয়ার জন্যে বাচ্চু ভাই নিজেই চলে গেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এদিকে ফুফু কাঁচা গরুর দুধ আমার মাথা ও গায়ে ছিটিয়ে গোসল করালেন। জেল জীবনের অশুভ প্রভাব থেকে আমাকে মুক্ত ও পবিত্র করলেন তিনি এভাবে।

বিকালের দিকে বিরাট মিছিল। অগ্রভাগে আমি মালা সুশোভিত। হাজার জনতার জিন্দাবাদ ধ্বনিতে পরিবেষ্টিত। ধীর গতিতে আখাউড়ার বড় বাজারে পৌঁছলাম। আছরের নামাজ আদায় শেষে সবার অনুরোধে জেল জীবনের কাহিনী বর্ণনা করলাম মসজিদের প্রাংগনে অধীর আগ্রহে প্রতিক্ষীত জনতার উদ্দেশ্যে। প্রায় এক ঘন্টা বক্তৃতা দিলাম। সবাই তন্ময় হয়ে পড়েছিল। রবিউল্যা গংদের উপর অত্যাচারের কাহিনী শুনে এরা কেঁদে ফেলেছিলেন। বুঝলাম, জেল জীবনে আমি মর্মস্পর্শী বক্তৃতার গুণ ও যোগ্যতা যথেষ্ট অর্জন করেছি।

বিকেল ৫টায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে তিন কম্পার্টমেন্টের একটি ট্রেন আখাউড়ায় এল। লিপি, বির্থী, আসাদ, সুহেলী, ফাহিমা, শামী ও ওদের আম্মা প্লাটফর্মে নেমেছে।

—আম্মা, আম্মা, ঐ যে আব্বা! গলায় কত মালা আব্বার! ছেলে-মেয়েরা দৌড়িয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। পাঁচ মাস একুশ দিন পর অনুভব করলাম নিজের ছেলে মেয়েদের স্পর্শসুখ! এত মায়ার এ সংসার, এই দুনিয়া! কেমন করে মৃত্যু ছিন্ন করে এ মায়ার বন্ধনকে? মৃত্যু নির্মম, নিষ্ঠুর! নিখুঁত কঠিন হৃদয় এর। সে বধির, অন্ধ, মূক। মৃত্যুদূত স্বয়ং আজরাইলের (আঃ) ও এথেকে নিষ্কৃতি নেই। টের পেলাম ছেলে মেয়েদের ঘেরাও এর ভাষা ঃ "তাদের ভয়, এবার হারালে আব্বুকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না"। অশ্রুর উৎসবে মধু-মিলনের মাহফিল ঘটল আমারদের সবার। বিমোহিত হয়ে গেল আশ-পাশের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা। আমার স্ত্রী তখনও একাকী দূরে দাঁড়িয়ে। অধোবদনে বোধহয় কাঁদছিল সংগোপনে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সভা

এমনিভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ও আনন্দঘন অশ্রু সাগরে বরন করলেন শ্বশুর-শ্বাশুরী, শালা-শালী সবাই। অবসর প্রাপ্ত ষ্টেশন মাষ্টার শ্বশুর শিশু-কান্নায় জড়িয়ে বললেন ঃ আমরা ভেবেছি আপনি আর নেই। আমার মেয়েটা বুঝি বিধবা হল!

দু'দিন পর। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় কুমিল্লার ব্রীগেডিয়ার আসছেন আহূত জনসভায় বক্তৃতা দিতে। আমাকে এই সভায় বক্তৃতা দেওয়ায় অনুরোধ জানান হল। প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত লোকের সমাগম হল স্কয়ারে। প্রায় এক ঘন্টা ধরে জেলের কাহিনী

www.pathagar.com

আবেগময় ভাষাতে বর্ণনা করলাম। আমার বক্তৃতার পর ব্রীগেডিয়ার সাহেবও চৌকস বক্তৃতা দেন। ভাঙ্গা বাংলা ও সহজ-সরল উর্দুতে। ব্যাঘ্র-স্বরে তিনি বলছিলেন ঃ

"মুসলমানদের ছিনায় যতক্ষণ কলেমা তৈয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিন্দা থাকবে ততদিন হিন্দুস্তান বা কোন দুষমনই মুসলমানকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে না। ইতিহাস এর জ্বলন্ত স্বাক্ষী..."। এই ছিল তার বক্তব্যের সার কথা। যখন তিনি এই কথাগুলো বলছিলেন তখন মনে হয়েছিল ঈমানী ভাষার প্রাণ ও বেগ কতই না সামরিক শানও শৌর্যে বিধৃত!

হিন্দুস্তানের জেল থেকে এত কষ্ট-সাধনা শেষে ফিরেছি বটে তবু শান্তি পেলাম না। শান্তি পাব আশায় দেশে ফিরেছি। হায়! যুদ্ধের কোন কুল-কিনারা হয়নি এখনও!

আমার হাতকড়ার দাগগুলো ত এখনও মুছেনী

স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে প্রায় ছয় মাস কেটে গেল। উত্তেজনা, গেরিলা আক্রমণ ও কামানের গোলাগুলির তীব্রতা বেড়েই যেতে লাগল। হিন্দুস্তান থেকে মুক্তি-পাগল মুক্তি ফৌজ নিষ্ঠার সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে জীবন বাজী রেখে। মুক্তিরা মুসলমান, পাঞ্জাবী-বেলুচরাও মুসলমান। মুক্তিরাও পাকিস্তানী, পাঞ্জাবীরাও পাকিস্তানী। 'পাঞ্জাবী' 'মুক্তি' মারছে। মুক্তিরা শহীদ হচ্ছে। মুক্তিরা "পাঞ্জাবী" মারছে, পাঞ্জাবীরাও শহীদ হচ্ছে! সমীকরণের ফলঃ উভয় দিকেই মুসলিম নিধন যজ্ঞ চলছে। এ আত্মঘাতী যুদ্ধ, নির্বংশ হওয়ার যুদ্ধ। বাংগালী মুসলমান মরছে আর মারছে একে অন্যকে। লাশ হচ্ছে যারা ওরা সবাই মুসলমান। জল-স্থল-অন্তরীক্ষে চলছে এই হত্যাকাণ্ড। "সেম সাইড যুদ্ধ"। এটা যুদ্ধবিজ্ঞানের নিরিখে 'সিভিল ওয়র নয়' মোটেই। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক নিষ্পেষণ এবং সামরিক বেইনসাফির জন্যে নিষ্পেষিত পূর্বাঞ্চল। পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষমতা মত্ততা ও প্রভূত্বমোহ রচনা করল মুসলিম হত্যার বধ্য ভূমি এদেশটাকে।

৩রা জানুয়ারী যুদ্ধ বেঁধে গেল পুরোদমে। হিন্দুস্তান যোগদিল মুক্তিদের সাহায্যে। মাত্র ৯ দিনের সর্বাত্মক যুদ্ধে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল রক্তাক্ত কারবালার ফিনকি স্রোতে। 'ইসলাম' মুসলিম ভ্রাতৃত্বের একমাত্র বন্ধন, ইসলামই মুসলিম রাষ্ট্রের একমাত্র সংহতি শক্তি, ইসলামই শান্তি-দ্বীন ও দুনিয়ার-এ ঐতিহাসিক সত্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করল পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী। এর কাফ্ফারা কে আদায় করবে, রাষ্ট্র পরিচালকবৃন্দ না নিরীহ জন-সাধারণ, না যুগপত উভয়েই?

এদৃশ্য দেখার জন্যেই কি আগরতলা সেন্ট্রাল জেলের কারাবাসের সমাপ্তি হয়েছিল আমার? এর চেয়ে কি ঢের ভাল ছিল না ২০নং ওয়ার্ডের সেল, অজিত, উকিল বাবুদের সেল! ইচ্ছে হল জীবন ধর্মী-নমস্য নাট্যকার জহর গাংগুলীর মত চীৎকার দিয়ে বলতে "হে আমার সোনার বাংলার মানুষ, হে পাকিস্তানের মুসলমান, আমার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের ২নং সেলের পূত পবিত্র জীবনটি ফিরিয়ে দাও, আমার হাত কড়ার দাগগুলোত এখনও মুছেনি।"

রচনা লেখার শেষ তারিখ ঃ ৯/১১/১৯৭৫ ইং।

www.pathagar.com

কিংবদন্তীর রাজ্য আগরতলা

এটা এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। যে আগরতলার জেলে রাজবন্দী হিসেবে দীর্ঘ পাঁচ মাস একুশদিন কাটিয়েছি সেই আগরতলা কিংবন্তীর রাজ্য ছিল একদা। আজও এ কাহিনী স্মৃতির রাজ্যে ফুটে উঠলে সম্যক উপলব্ধ হয়, আগরতলা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের একটি রাজ্যই নয় বরং এটি একটি হিন্দু-মুসলিম ও পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর এক রূপকথার রাজ্যও বটে।

পাঁচটা 'শ্রী' বিযুক্তে রাজ্যটির মহারাজদের নাম। এ রাজ্যের শেষ মহারাজার নাম ছিল "শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীযুক্ত শ্রীল' [সম্ভবত শ্রী লাল] কিশোর কুমার মানিক্য বাহাদুর"। তিনি দুটো বিয়ে করেছিলেন। প্রথমা স্ত্রী ছিলেন নেপালের রাজকন্যা। অপরূপ সুন্দরী সব দিক দিয়েই। কী রূপ, কী গড়ন কী আননে। লোকে বলে, তিনি ছিলেন শরতের মেঘমুক্ত আকাশের পূর্ণ শশী সদৃশ সুন্দরী তন্বী। নিঃসন্তনা শ্রীলক্ষ্মী!" মহারাজ কিশোর কুমার লন্ডনে যান রাজকীয় ভ্রমণে। সে সময় সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিতে হতো জাহাজে চড়ে। তাই মহারাজের দেশে ফিরে আসতে ৪/৫ মাস কেটে গেল। ঘটা করে রাজা ফিরে এলেন বটে কিন্তু ইতোমধ্যে তার দাম্পত্য জীবনে 'শনি'র আগুন জ্বলে উঠেছে। নানা জনের মুখে নানা ভংগীতে তিনি স্বীয় রানীর অপবাদ শুনতে পেলেন। স্ত্রীর সতীত্বের প্রতি তার সন্দেহ দানা বেঁধে উঠে। এ কলংক অসহনীয়, এ অপবাদ সহ্যের সীমাতিরিক্ত। রাজবংশের জাত-কুল রক্ষার্থে রাজপ্রাসাদে রাণীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হল সংগোপনে। নিষ্কন্টক করা হলো জনগণের বিষাক্ত রসনা প্রয়োগের প্রবণতা, এভাবে।

মহারাজ কিশোর কুমার দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন। তিনিও ছিলেন অপরূপা সুন্দরী। ভুপালের মধ্য ভারতের কোন এক রাজকন্যা। নাম কাঞ্চন প্রভা দেবী। দেখতেও ছিলেন কাঁচা হলুদ বরণ, কাঞ্চন রং। তার ঘরে মহারাজ কিশোর কুমারের এক পুত্র সন্তান জন্মে। ফুট ফুটে সুন্দর মায়ের মতোই। মহারাজের মন আলোকিত হয় ষোল আনা বংশ প্রদীপের আশায়। রাজ পরিবারে নেমে আসে খুশীর তরঙ্গ।

সত্যি তাঁর আমলে দেশ ছিল ধনধান্যে ভরা। সুখ-শান্তি ও শালীনতায় জনজীবন ছিল সমৃদ্ধ। ব্যক্তি জীবন ও প্রশাসনে নৈতিকতার মান ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ় ও উন্নত। সেসময় চরিত্র স্খলনের শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর ও লোমহর্ষক। যেমন শ্লীলতাহানির অপরাধে সামাজিকভাবে পুরুষের যৌনাঙ্গ কর্তন করা হত মূলী বাঁশের চিকন 'ছাল' দিয়ে। এ শাস্তি এত যন্ত্রনাদায়ক ও লোমহর্ষক ছিল যে, এতদ্দর্শনে গোটা রাজ্যের 'চরিত্র' সংরক্ষণে সতর্ক প্রহরার তেমন কোন প্রয়োজনই হতো না। যে দেশে পুরুষ-নারীর এমনিভাবে চরিত্র পূতভাবে সংরক্ষিত হয় সেদেশের প্রশাসনে আইন-শৃঙ্খলার তেমন কোন সমস্যাই দেখা দেয় না। ফলে এ রাজ্যে দেহপসারিণীর ব্যবস্থা আইনত কঠোরভাবে ছিল নিষিদ্ধ।

প্রাক পাক-ভারতের লৌকিক ইতিহাস এটি। সে সময়কার আগরতলার আদি অধিবাসীরা 'তীপরা' জাতি হিসাবে অভিহিত। তারা সরল জীবন যাপন করত।

www.pathagar.com

পাহাড়িয়া অঞ্চল 'আগরতলা। বেত, বাঁশ, শণে তখন ছিল খুবই সমৃদ্ধ। এ সবের পরিচর্যা ও এগুলোর ব্যবসা করে জনসাধারণ জীবিকা নির্বাহ করত। হাতে তৈরী ডোর, ঝুড়ি, ধারা ছিল এদের বিপণন পণ্য সামগ্রী। লেখাপড়ায় অনুন্নত হলেও সমাজ জীবন ও আর্থিক অবস্থায় ছিল এরা সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ। শিক্ষিতের হার নাই বললেই চলে। গরু-মহিষ ও হাঁস-মুরগী ছিল এদের গৃহপালিত প্রাণী সম্পদ। আতিথেয়তায় এদের সুখ্যাতি এখনও লোক মুখে ছড়িয়ে রয়েছে। কোন আগন্তুক এদের মেহমান হলে এরা প্রাণ উজাড় করে খাদ্য পানীয় এর ব্যবস্থা করত। গৃহপালিত পশু-পাখি ও ফলমূল দিয়ে মেহমানদেরকে স্বহস্তে রান্নাবান্না করে খাওয়ানোর যাবতীয় আয়োজন করে দিত তারা। মেহমানকে আলাদা ঘরে থাকার জন্যে নিজেরা প্রয়োজনে পড়শীর ঘরে গেঁজাগেজী করে রাত যাপন করত। পড়শী অঞ্চলের কোন দরিদ্র ও গরীব লোক ওদের আশ্রয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে স্বাবলম্বী হয়ে দেশে ফিরত অনায়াসে। এতে ওরা গর্ব ও আনন্দবোধ করত এই ভেবে যে, তাদের সহযোগিতায় কত নিঃস্ব স্বাবলম্বী হচ্ছে।

পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে পুরুষেরা হাঁটু পর্যন্ত ধূতি, গামছা পরিধান করত, মেয়েরা পরত 'থামী' নামক 'বার্মী' জাতীয় পোশাক। তীপরা মেয়েরা ফুল প্রিয়। পুরুষের আদরণীয় ও আকর্ষণীয় হওয়ার জন্যে এরা খোঁপা সাজাত নানা বর্ণের বনফুল দিয়ে। কখনও বা মালা গেঁথে তা আবার ঝুলিয়ে চলা ফেরা করত। ওদের বিয়ে-শাদী হতো গৃহকর্তার হুকুম ও পছন্দ অনুযায়ী। এরা সত্যবাদীও। তীপরারা রান্নাবান্না করে মাছ-মাংশ খাওয়ায় অভ্যস্ত। সিঁদল (চাপা) ষূটকী ওদের সবচে' রসনা প্রিয়। কারণ "ষুটকী বেশী বেশী খেলে মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয় না।" পানীয় এর মধ্যে চোলাই মদ ছিল অভিজাত বিভারীজ'। পূজা-পার্বন ও সামাজিক উৎসবাদিতে 'মদ' হচ্ছে এদের সমাবেশ ও স্ফূর্তির মধ্যমনি। এছাড়া ডিম, দুধ, হরিণের মাংসও রয়েছে ওদের খাদ্য ম্যানুতে। ধূমপানে ওরা সবাই বেশ আসক্ত। মূলী বাঁশের হুক্কায় তামাক ও পাতার বিড়ি সেবনে খুবই অভ্যস্ত।

তীপরাদের ধর্ম হিন্দু ধর্মের অনুরূপ। এরা 'ক্যার' নামক এক ধরনের পূজা দেয় যা বাংলা বা ভারতীয় হিন্দুরা করে না। সে দৃষ্টিতে অনেকে মনে করেন এরা হিন্দু নয়। বাস্তবতায়ও দেখা যায় ধর্মানুরাগে হিন্দু ও তীপরাদের মধ্যে সুহৃদ ও সামাজিক সম্পর্ক নেই: বরং তাদের সম্পর্ক দা-কুমড়ার মত। এরা হিন্দুদের বিশ্বাস করত না মোটেই। মুসলমানরা ছিল ওদের প্রিয় পড়শী।

জনৈক প্রবীণ কয়েদী ব্যক্তিকে একদিন জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে যা বলেন তা অনেকটা নিম্নরূপ :

তীপরাদের মহারাজ মুসলিম বংশোদ্ভূদ। কারণ তাদের মহারাজারা 'কিস্তীটুপী' পরতেন। মহারাজদের বংশ-ইতিহাস এ সাক্ষ্য বহন করে। প্রবীণ লোকটি বলেন : জনৈক সম্রাটের হেরেমে এক সুন্দরী মহিলা সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ে। তাঁকে তখন আগরতলার পাহাড়িয়া অঞ্চলে বনবাস দেয়া হয়। কিছুদিন পর এই মহিলা এক অনিন্দ সুন্দর ফুটফুটে ছেলে সন্তান প্রসব করে। তীপরারা এই ফুটফুটে সন্তানটিকে স্বর্গীয় দান হিসাবে বরণ করে নেয় ও ভগবানের আশীর্বাদ হিসাবে এই সন্তানটিকে তাদের

www.pathagar.com

'মহারাজা' হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। সেই থেকে ত্রিপুরায় মহারাজার রাজত্ব সৃষ্টি এবং 'মুসলমান' হওয়ায় মহারাজরা 'তাজের' পরিবর্তে 'কিস্তীটুপী' পরিধান করে আসছেন। 'সুতরাং', বৃদ্ধ লোকটির কথায়, "আগরতলায় রাজপরিবারে মুসলিম শোনিত প্রবাহমান।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তাঁর থেকে উদ্ধারকৃত আগরতলায় মহারাজার "মানিক্য বাহাদুর উপাধি' লাভের ইতিহাসটিও মজার কাহিনী। তখন সম্রাট আকবরের রাজত্ব গোটা 'পাক ভারত' উপমাহদেশব্যাপী। সে সময়ের আগরতলার মহারাজা মোগল শাসনের কৃপা ও সহমর্মিতা লাভের জন্য সম্রাট আকবরকে নিজে গিয়ে 'মানিক' উপঢৌকন হিসাবে দেন। এতে সম্রাট আকবর অত্যন্ত খুশী হয়ে মহারাজাকে "মানিক্য বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই থেকে এই পরিবারের প্রত্যেক মহারাজার নামের শেষে এ উপাধি বিশিষ্ট বিশেষণ হিসেবে বিযুক্ত হয়ে আসছে।

মোগল আমলের কৃপা ও আনুকূল্যে আগরতলা রাজ্যটি শান্তি ও নিরাপত্তা এমনভাবে উপভোগ করছিল যেমনটি মায়ের কোলে সন্তান ভোগ করে থাকে। সে সময়েই আগরতলার প্রতিরক্ষার প্রায় ৭৫% ভাগ সৈন্যই মুসলমান ছিল বলে কথিত আছে। এই বিপুল সংখ্যক সৈন্য গোটা আগরতলার পরিবেশে মুসলমানী প্রভাব ফেলেছিল বহুল পরিমাণে। এর ফলে দেখা যায় আজও তীপরারা মুসলমানদেরকে 'রাজা-বাদশা'র জাত বলে মান্য করে থাকে। পাশাপাশি হিন্দুদেরকে হীন, অত্যাচারী ও কুটিল শাসক হিসাবে ঘৃণ্য মনমানসিকতায় মূল্যায়ন করে।

দিন ক্ষণের অমোঘ ও অবিরাম আবর্তনে ভারত বিভক্ত হল ১৯৪৭ সনের ১৪-১৫ই আগস্টে। 'আগরতলা' রাজনৈতিক, ভৌগলিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক তথা সীমান্ত বিবেচনায় পাকিস্তানের সাথেই যোগ দেয়ার কথা। কিন্তু তা আর হলো না। এর কারণ বিবিধ ও বৈচিত্রময়ী। যেমন :

জানা যায়, মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বিধবা স্ত্রী রানী কাঞ্চন প্রভা তার পুত্র কিশোর কুমার মানিক্য বাহাদুর নাবালক থাকায় রাজ্য-চিন্তায় মুষড়ে পড়েন। তিনি ভারত বিভাগের পর কতিপয় শর্তে খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে দেখা করে পাকিস্তানের সাথে যোগদানের চেষ্টা চালান। কথিত আছে, জনাব নাজিমুদ্দিন 'মহিলা' হওয়াতে রানীর সাথে সাক্ষাত করতে অসম্মতি জানান। দ্বিতীয়ত, "শর্ত" সাপেক্ষে পাকিস্তানের সাথে আগরতলার সংযোজনেও তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন। এছাড়া ১৯৪৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের আয়োজিত এক রাজনৈতিক জনসভায় যোগদানের জন্য আগরতলায় আসলে এতে দারুণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সে সময়কার কুমিল্লার [সাবেক ত্রিপুরা] ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ঔৎসুক্য বশত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেখার জন্য আখাউড়ায় পৌঁছলে কংগ্রেসের কতিপয় পাণ্ডা তাকে 'হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী' ভ্রমে মদের বোতল ছুড়ে আক্রমণ করে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চেহারায় শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দীর মতো ছিলেন। ভাগ্য ভালো বেচারা ম্যাজিস্ট্রেটের 'নাক' টুকু শুধু জখম হয়েছিল এতে।

www.pathagar.com

আব্দুল বারী ওরফে গেঁদু মিয়া ছিলেন এই সভার আয়োজক। তিনি ছিলেন আগরতলা মহারাজার ব্যক্তিগত প্রথম ড্রাইভার। আগরতলারই বাসিন্দা তিনি। সে সময়কার দিনে নিজ পকেট থেকে ১০০১ (এক হাজার এক টাকা) চাঁদা দিয়েছিলেন এই মিটিং এর জন্য। আগরতলার বটতলার যেখানে আমি ও আমার সাথিরা প্রহৃত হয়েছিলাম এর পূর্ব পাশে খেলার মাঠে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ৩০ হাজার লোকের সমাগম হয়। এই সভায় সমাগত আগরতলার বনেদী অধিবাসীরা তৎকালীন পাকিস্তানে যোগদানের প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এই সভারই ফলশ্রুতিতে রানী কাঞ্চন প্রভাতী জনাব খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে দেখা করার মনস্থ করেছিলেন পরের বছর, ১৯৪৭-এ।

বিধিবাম। হিন্দুস্থানের নেহেরু সভার অবস্থা 'গুরুচরণ' উপলব্ধি করে আগরতলাকে কুক্ষিগত করার কূট চাল চালতে লাগলেন। কিংবদন্তী এরূপ : তিনি তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে রানী কাঞ্চন প্রভাদেবীর সান্নিধ্যে বসবাস করার জন্য পাঠান। সে সময়কার ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন সুশ্রী প্রভাময়ী ষোড়শী। তারই মাধ্যমে রানী নেহরু সরকারের টোপ গিলে অবশেষে হিন্দুস্থানের সাথে যোগদান করেন। এদিকে জনাব আব্দুল বারী ওরফে দেঁদু মিয়া পাকিস্তানপন্থী হওয়ায় তাকে হত্যা করার অদৃশ্য ষড়যন্ত্র জোরদার হয়ে উঠে। সেই মিটিং এর ২/৩ মাস পর কর্তাদের (রাজ বংশের কর্মচারীদেরকে তখন কর্তা বলা হতো) সাথে তাস খেলার সময় গেদু মিয়া হঠাৎ অপমৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আখাউড়ার জনাব দুদু মিয়া, হাজী সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ সাথী তার মৃতদেহ দেখার জন্য আগরতলায় যান। তারা মৃতদেহে বিষের ছোবল দেখতে পান, সন্দেহ করেন শরবতের সাথে মারাত্মক বিষ প্রয়োগে গেদু মিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। গেদু মিয়া মহারাজার ব্যক্তিগত ড্রাইভার। এছাড়া তিনি ছিলেন NMTS (New Motor Transport Services) -এর মালিক। আখাউড়া-আগরতলায় তার বাস ও ট্রাকসমূহ যাতায়াত করতো। সুতরাং তার এহেন মৃত্যু শুম করা সহজ ছিল না। ফলে আগরতলার কর্তৃপক্ষ কোলকাতা থেকে ডা. বিধান রায়কে মৃত্যুর কারণ উদঘাটন করার জন্য চার্টার্ড প্লেনে আগরতলায় আনেন। তিনি যথারীতি মৃতদেহ পরীক্ষা করেন, তবে কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন করা সময় তিনি এর কোনো রির্পোর্ট প্রদান না করেই প্রস্থান করেন। এহেন অস্বাভাবিক ও অচিন্তনীয়-গেদু মিয়ার মৃত্যুর রহস্য আজও কুয়াশাবৃত রয়েছে। তার শুভানুধ্যায়ীরা এখন পর্যন্ত এই শোক হতে পরিত্রাণ পাননি।

জনশ্রুতি রয়েছে আগরতলার ত্রিপুরার বছরের গণনার সনকে অনুসরণ করে সম্রাট আকবর ব্যাংলা সন প্রচলিত করেন ত্রিপুরা সন প্রবর্তনের ৪ বছর পর থেকে। এ দৃষ্টিতে আগরতলার নিকট সংশ্লিষ্ট সবাই ঋণী যদি এ জনশ্রুতি সত্য হয়ে থাকে।

আর একটা কথা। আগরতলার মহারাজা কোন ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী তার ইতিহাস সঠিক জানা নেই বটে তবে তার রাজ্যে গো-পালন ও গো-মাংস ভক্ষণের কাহিনীটুকুও এখানে উল্লেখ্য। মহারাজের ফরমান ছিল ১. কোনো গাভী-গরু দিয়ে জমি চাষ করা যাবে না। ২. গরু জবাইও নিষিদ্ধ করা হলো।

www.pathagar.com

একদিন এক প্রজার বিরুদ্ধে গাভী-গরু দিয়ে জমি চাষের অভিযোগ মহারাজের নিকট পেশ করা হলো। ঘোষণা করা হলো স্বয়ং মহারাজ এর বিচার করবেন। যথা নিয়মে নির্দিষ্ট দিনে সেই প্রজাকে মহারাজার কাছে হাজির করা হলো। মহারাজ অগ্নিশর্মা মূর্তিতে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা কি সত্য?

করজোড়ে প্রজা হ্যাঁ সূচক সম্মতি দিয়ে এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলল :

ধর্মাবতার, আমার দুটো হালের বলদ পর পর মারা যায়। ফলে জমি চাষের জন্য আর কোনো বলদ না থাকায় আমি বাধ্য হয়ে গাভী দিয়ে জমি চাষ করিয়েছি। এটুকু না করলে জমিতে ফসল ফলাতে পারতাম না। তখন আমার বাল-বাচ্চা নিয়ে উপোসে মরতে হতো।

কৃষকের কাকতি কণ্ঠ ও করুণ স্বরে মহারাজার হৃদয় দয়ায় চুপসে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎই কৃষককে ক্ষমা করে দিলেন ও তাকে বলদ ক্রয়ের জন্য অর্থ সাহায্যও প্রদান করেন। সত্যি যথার্থ অর্থে তিনি প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন।

এমনিভাবে মুসলমানেরা তার রাজ্যে গোপনে গরু জবাই করে খেলে তিনি অভিযোগকারীকে ১০ টাকা জরিমানা করতেন এই বলে, "গোপনে যখন গোমাংস ভক্ষণ করেছে তখন এটা কেন তুমি প্রকাশ করলে। তুমি নিন্দুক। তাই তোমাকে দশ টাকা এহেন চরিত্রের জন্য জরিমানা করা গেল।"

পাকিস্তান হওয়ার পরও আখাউড়ার তিতাস নদীর পূর্ব পার্শ্বে তিতাস নদীর তীরে ত্রিবেনী মেলা হতো। এই মেলার মূল ও অধিকাংশ তীর্থ যাত্রী ছিল তীপরা জাতি। প্রায় ৭/৮ বছর পর্যন্ত এই মেলা চালু ছিল। প্রতি বাংলা বছরের শেষ দিকে ফাল্গুন-চৈত্রে এ অনুষ্ঠান সাড়ম্বে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। পরে হিন্দুস্থানের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকায় এ মেলা বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ 'আগরতলা' মনমানসিকতায় সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সাথেই যে সম্পৃক্ত হওয়ার পক্ষে ছিল, এসব জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী এর সাক্ষ্য বহন করে। লেজগুটিয়ে যাওয়ার সময় বৃটিশ শাসকদের Divide and Rule পলিসি এবং হিন্দুস্থান সরকারের কূট ও ষড়যন্ত্রমূলক চালের ফলে আগরতলা হিন্দুস্থানে যোগ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক সমস্যা ও উৎপাতের ক্ষয়রোগ সৃষ্টি করে গেছে। আখাউড়ার পাশে আগরতলা এমনভাবে না থাকলে কি আমি আজ এখানকার জেলে আটকা পড়তাম? ক্ষোভ ও দুঃখে মনটা ভারাক্রান্ত হলো ভীষণভাবে যেন গোটা হিমালয় পাহাড়টা কে যেন আমার কলিজার উপর বসিয়ে দিয়েছে।

কয়েদী বন্ধুর এই কাহিনী শ্রবণে কোলরিজের মতো স্বপ্ন ঘোরে একটি রাত সেদিন কেটেছিল জেলখানায় এহেন ভাবনায়। সিরাজ ভাইয়ের বাঁশির ফুকে চোখ মেলে দেখি 'ফজর' ক্বাজা হয়ে গেছে সেদিনটিতে।

(ভারতের জেলে আমার বন্দী জীবন এর প্রথম সংস্করণে অছাপানো একটি অগ্রন্থিত পরিচ্ছেদ)

www.pathagar.com

সুধী পাঠকদের মন্তব্য

১. **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের**
শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট-এর অধ্যাপক ড. মোঃ আজহার আলী বলেন ঃ
এই বইটির প্রতি পৃষ্ঠাই horrible মনে হয় ও মাঝে মাঝে কিছু ঘটনার বর্ণনা এতো মর্মন্তুদ যে পাঠক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

২. **অধ্যাপক আব্দুল গফুর, সাহিত্য সম্পাদক দৈনিক ইনকিলাব লেখককে বলেন ঃ**
এমন বই মানুষ লিখে নাকি! এই বই পড়তে পড়তে আমার তারাবীর জামা'ত ছুটে গেছে।

৩. **বিজ্ঞান শিক্ষক জনাব জয়নুল আবেদীন ঃ**
আমি কয়েক পৃষ্ঠার পর আর পড়ি নাই। কারণ আমার ভয় হচ্ছিল যে সামনে আরো করুন ও বীভৎষ কাহিনী রয়েছে, যা আমি সহ্য করতে পারবনা।

৪. **জনাব মাওলানা ফয়জুল্লাহ্, প্রিন্সিপ্যাল, নুরানী মুয়াল্লিম ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা, লেখককে বলেন ঃ**
আপনার বইটি পড়েছি ও পরে এটি জনৈক আর্মি আফসারকে দিয়ে প্রথমে বিপদে পড়ি ও পরে আবার আনন্দিত হয়েছি। কারণ ঐ অফিসার আপনার বই-এর কিছু অংশ পড়েই আমাকে Telephone এ জানান, "এর লেখক কে? আমি তাকে গুলি করে হত্যা করতে চাই। সে আমাদের শত্রু।" তখন আমি তাকে বললাম, গোটা বইটা পড়ে শেষ করুন। এরপর না হয় লেখককে আমি নিজেই আপনার সামনে হাজির করবো।' এরপর সেই আর্মি অফিসার আমার অনুরোধে বইটি পাঠ শেষে আবার ফোন করে বল্লেন ঃ
"এবার আমি লেখককে ধন্যবাদ জানতে চাই, তাকে বলতে চাই তিনি যেন বেশী বেশী নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করেন। কারণ যে বিপদ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন তা আল্লাহর খাস্ রহমত ছাড়া সম্ভব নয়।"

৫. **প্রত্যাশা প্রাঙ্গনের পরিচালক জনাব মতিউর রহমান মল্লিকের মন্তব্য ঃ**
আলমগীর ভাই, আপনি জানেন না আপনার এই বইটি কী জিনিস! এটা আপনার এক অপূর্ব সৃষ্টি, বাংলাদেশী প্রত্যেক সুধীর এটি পড়া উচিত।

৬. **কবিবর আব্দুল মান্নান সৈয়দ বলেন,** "আপনার এই বই পড়ে আমি খুবই প্রীত, ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় আপনার সাহিত্য রচনা একটি দারুন সৌভাগ্য।"

৭. **সুসাহিত্যিক ও কবি ডাঃ খন্দকার বুলবুল সরওয়ার বইটি পড়ে মন্তব্য করেন,** "আপনার বইটি এজন্য আমার কাছে অতি প্রশংসনীয় যে এইটিতে কোন পলিটিকস নেই।"

৮. **আমার আব্বা বলেন,** "মিঞা তোমায় গুলী করার জন্য প্রস্তুতি ও এ থেকে পরিত্রার কাহিনীটি যখনই পড়েছি তখনই আমি কেঁদে দিয়েছি। এই অংশটুকু আমি যে কতবার পড়েছি তা বলতে পারবোনা।"

www.pathagar.com

৯. গ্রন্থগার বিশারদ ও প্রাবন্ধিক জনাব মোঃ সা'দাত আলীর বিচার্যে " আপনার এই বই 'স্পাই মেয়ে' এর মতো, পড়া শুরু করলে শেষ না করে উঠা যায় না।"

১০. দশম শ্রেণীর জনৈক ছাত্রী রেখা আমি লেখককে হঠাৎ আমার দেশের বাড়ীতে দেখে উল্লসিত হয়ে বলে ওঠে, "বইটি পড়ার পর লেখককে দেখার তীব্র বাসনা ছিল। আজ সে বাসনা পূর্ণ হলো। এই লেখক ত একজন মাটির মানুষ।"

১১. আওয়ামী লীগের একজন নামকরা ব্যক্তিত্ব বলেন, "আলমগীর সাহেব, আপনি এই বইয়ের কপি প্রয়োজনে বিনা পয়সায় আমাদের নেতাদের মধ্যে বিলি করুন। এতে এরা জ্ঞান পাবেন 'ভারত' আমাদের জন্য কতটুকু সুহৃদ।"

১২. বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সর্বজনাব বদরে আলম ও মাওলানা মাকবুল আহমেদ বলেন, বইটির কপি নিঃশেষ হয়ে গেলে আবার ছাপান। এর প্রয়োজন এখনো ফুরিয়ে যায়নি।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN 984 8373 35 7
9 789848 373354